তিন প্রহর

সীমন্তনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

নিও-লিট পাবলিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১নং কলেজ রো, কলিকাতা-৯

হিতেন্দ্র মিত্র কর্তৃক ২১৩, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২ হইতে প্রকাশিত এবং
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ পাল কর্তৃক "শ্রীশশী প্রেস" ৪৫, মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত।

প্রথম প্রকাশ—১লা মাঘ, ১৩৬৬

দাম : চার টাকা

প্রচ্ছদ-পট—টাস্

ব্লক—ব্লকম্যান

প্রচ্ছদ-পট মুদ্রণ— ফটোটাইপ সিণ্ডিকেট

এক

বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল সে।

আফিস বেলার উজানি আলোড়ন থিতিয়ে এসেছিল, রাস্তা হয়ে ছিল ঝিমন্ত। লোক চলাচল নেই বললেও চলে। দু-একটা কুকুর ইতস্তত ফুটপাথ ছেড়ে ছায়ার সন্ধান খোঁজে। যানবাহন কখন এক আধটা ছুটে আসে নিস্তব্ধতাকে চৌচির করে—তারপর দূরে মিলিয়ে যায়। রাস্তার শূন্য পিঠ খাঁ-খাঁ করে দুপুরবেলা।

সে একলা দাঁড়িয়ে ছিল। অন্তত তাই তার মনে হয়। একলা, একটা ল্যাম্পপোষ্টের গায়ে গাড়ী-থামার চৌকো টিনের নিশানা ঝোলান। আর দুপুরের রোদ গলন্ত তামার মত তার মুখের চামড়া বয়ে ঝরছিল। সে মুখে কোন ভাবনার গতিবিধি পরিস্ফুট ছিল না। একটা বিশীর্ণ ভাবশূন্য মুখ, পারিপার্শ্বিক জড়ের সমন্বয় থেকে ভিন্ন করা শক্ত। তার প্রাণহীন রুক্ষতা কতকটা সেই দুপুরের মত যা তার শুকনো মুখের চামড়া চুঁইয়ে প্রবেশ করছিল ভিতরে, ছড়িয়ে পড়ছিল একাকার হয়ে। উপরে জেগে থাকা গালের দুপাশে হাড় দুটো মুখের তুলনায় একটু বেশী পরিসর, নাসার নিম্নভাগ চ্যাপ্টা আর ঈষৎ পুরু ঠোঁট। কপালের নীচে সমান্তরাল ভ্রূর নীচে তার চোখ তাকিয়ে থাকে কোন কিছু লক্ষ্য না করে। সে দৃষ্টি কাচের শার্সি দেওয়া জানালার মত, বাইরের আলো গায়ে লাগলে ফিরে আসে, ভিতরে দেখা যায় না।

তার ভিতরে ছিল নির্জনতা। বাইরের আভাস সেখানে পথ করে নিতে পারত না। আপন নিভৃতির মধ্যে তার সচেতন অংশটুকু মগ্ন হয়ে থাকত। তাই একটা ছাড়াছাড়ি, একটা দীর্ঘকালের বিচ্ছেদ বাসা বেঁধেছিল কোথাও। তার ইস্তিরি করা ছেঁড়া সার্টের নীচে, আরও নীচে পাঁজরাগুলোর তলায়, যেখানে একটা সরব হৃৎপিণ্ড ক্ষীণ তবু অপ্রতিহত ভাবে আওয়াজ করে চলত। সেই ধ্বনি নেশাখোরের মত আমেজ এনে দিত তার মনে,

সে তন্ময় হয়ে থাকত। তার কোনো ভাষা নেই, অর্থ খুঁজবার প্রয়াসও তাই ছিল না—অদৃশ্য নালা দিয়ে গড়িয়ে পড়া জলের শব্দের মত নিরন্তর বাজত। তার বিশ্বাসও অগত্যা জীবনের সেই সর্বলঘু প্রমাণটার চারপাশে আঁকড়ে ধরে বাসা বেঁধেছিল। একান্ত বৈচিত্র্যমুক্ত ছিল সে।

রোদে চারিদিক জ্বলতে থাকে যেন। সূর্য বছরের শেষ আগুন ঢেলে দিচ্ছিল আকাশ থেকে। রাস্তার পিচ গলতে শুরু করে। একটা ভ্যাপসা পোড়া গন্ধ নাকে এসে ঢোকে। দূরে রাস্তার দুধারে বাড়ীগুলোর গা ধোঁয়া ধোঁয়া দেখায়। কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল তা প্রায় ভুলে গিয়েছিল সে। হঠাৎ চোখের কোণ জ্বালা করে ওঠে। সে তাড়াতাড়ি রুমাল বার করে চোখ রগড়াল। একফোঁটা জল করকরিয়ে ওঠা চোখের কোণ থেকে তার ঝলসে যাওয়া গালের চামড়ায় নেমে আসে। সে অবাক হয়ে রুমাল তুলে ধরে দেখবার চেষ্টা করে। তারপর আবার চোখ মছে সেটা পকেটে ভরে রেখে মুখ নীচু করে রইল।

কানে এসে লাগে—বলতে পারেন এ রুটে বাস বন্ধ হয়ে গেছে না কি ?

কয়েকটা শব্দ তার কানে আঘাত করে। সে চমকে ওঠে। তারপর ফিরে তাকায় শব্দগুলো যেদিক থেকে এসেছিল সে দিকে। রোদে জ্বলে জ্বলে তার দৃষ্টি দেখতে পায় না কিছু হঠাৎ। ভুরু তুলে ধরে সে খোঁজে। তারপর যেন দেখতে পেয়ে স্থির হয়ে থাকে তার চোখের মণি দুটো।

মেয়েটি একটু অবাক হয়ে চেয়েছিল। অন্যপক্ষের জবাব না দেওয়া দৃষ্টির দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে সে আবার প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করল।

সে ঘাড় নেড়ে কিছু জানায় যা স্পষ্ট বোঝা যায় না। তার ঠোঁট নড়ে ওঠে, কয়েকটা শব্দ উচ্চারিত হতে হতে থেমে যায় ঠোঁটের গোড়ায়—আমি—আমিও বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে—তাই—! তার চোখে একটা বিস্ফারিত দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়ে। সে চোখ নামায় না।

মেয়েটির মুখ রৌদ্রদাহে রাঙা সিঁদুরের মত জ্বলছিল। চোখের নীচে কাজলের দাগ বেয়ে ঘামের বিন্দু নেমে এসেছিল গালে। সে এক হাতে বুকের কাছে কাগজে মোড়া কিছু ধরেছিল। একটা আঙ্গুলের উপরে রক্তের ফোঁটার মত জ্বলজ্বল করছিল একটা চুনী সূর্যের তপ্ত-ধারায়। সে চোখ নামাতে পারে না। চেয়ে থাকে চুনীটার দিকে। প্রখর অগ্নিতেজ তার চোখের স্নায়ুগুলোকে অসাড় করে রেখেছিল। সে যেন অনেক ছায়ালোকের নিভৃতি থেকে

তাকিয়ে দেখে বিস্ময়ে, সংগোপনে, নির্জন চোখে সেই অসার রোদ্দুর তাপ থেকে বিচ্যুত হয়ে। তার দৃষ্টিতে কৌতুহল ছিল না—কেবল নিমেষ হৃত হয়ে ছিল।

হঠাৎ মন্ত্রে ছেদ পড়ে। হুড়মুড় করে একটা বাস দূর থেকে এগিয়ে এসে দাঁড়াল। সে জেগে উঠে এগিয়ে যায় দরজার দিকে। মেয়েটি ওঠে আগে। সেও উঠে পড়ে। বাস চলতে থাকে।

সে একটা হাতল ধরে চায় এদিকে ওদিকে। বাস ছুটে চলেছিল। দুপুরের সময় বলে যাত্রী বেশী নেই। অনেকগুলো ফাঁকা আসন ডিঙিয়ে মেয়েদের সীটে শূন্যস্থান থেকে চোখ সরিয়ে নিতেই তার দৃষ্টি এসে পড়ল মেয়েটির মুখে। চোখোচোখি হতেই একটা আঙ্গুল দিয়ে তার পাশের শূন্য স্থানটা দেখিয়ে একটু সরে বসল।

—বসুন—একটু সরে বসে মেয়েটি মুখ ফিরিয়ে চেয়ে রইল বাইরে।

কি যেন ঘটে তার মধ্যে। সে সেই অঙ্গুলিসংকেত অনুসরণ করে এসে বসে পড়ল—হয়ত মেয়েটির একটু কাছ ঘেঁসে। তা অনুভব করে মেয়েটি সরে যায় না। বাসের মৃদু আন্দোলনে সে মাঝে মাঝে অনুভব করে তার স্পর্শ। জানালা দিয়ে হাওয়ায় ভেসে আসছিল একটা অদ্ভুত মোলায়েম গন্ধ। তার ঘ্রাণকে তা স্পর্শ করে। তার কয়েকটা স্নায়ু রাতের মত সে সৌরভ কুড়িয়ে নেয়। কয়েকটা শাসনহীন চুলের অগ্রভাগ উড়ে এসে তার শীর্ণ কোঁকড়ানো মুখের চামড়ায় লাগে। কয়েক ঝলক তপ্ত-হাওয়ার হল্‌কা তার সঙ্গে বয়ে যায় তার চুলের ফাঁক দিয়ে। কোন কিছুর অস্পষ্ট স্মৃতি তার মনে আসে। কিন্তু সে ধরতে পারে না। বাস চলে। অগ্নিতেজে বাইরের দুপুর খাঁ-খাঁ করে। তার শরীরে একটা মৃদু আবেশ আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ে। চোখের পাতা ভার হয়ে নেমে আসে মণি দুটোর অর্ধেককে ঢেকে। প্রতি রোমকূপ স্পন্দরহিত হয়ে সজাগ হয়ে থাকে। তার পাশের জীব তার দেহ ছুঁয়ে আছে। সেই স্পর্শসীমা থেকে একটা ধারা বয়ে আসছে তার দেহে—যা ঠাণ্ডা, আর্দ্রতায় ভরা —তার অবাঙমনস হৃদয়ের দুকূল লুপ্ত করে। বাইরে হুতাশে পুড়ে যাচ্ছে সব কিছু, মাটির পিঠ, গাছের পাতা। তার দেহও জ্বলছিল। একটু চোখ খুলে সে তাকায় পার্শ্ববর্তিনীর দিকে। তার মুখ অন্যদিকে ফেরানো—তার থেকে নির্লিপ্ত। সে আবার তাকায় আঙ্গুলগুলোর দিকে। তার দুর্দমনীয় লোভ হয় আঙ্গুলগুলো একটু ছুঁয়ে দেখতে। একটু, সামান্য, যেমন

করে ফুলের পাঁপড়ি ছোঁওয়া যেতে পারে। সে যেন জানে সে স্পর্শ। কিন্তু তার হাত সামান্য সরাতেও ভয় হয়। সে অনুভব করে আজন্মকাল সব কিছুর ছোঁওয়া থেকে তাকে সরিয়ে রেখেছে কিছু। সে ভীরু—এই মুহূর্তে বুকের মধ্যে একটা ক্ষীণ কাঁপুনির মত তা তাকে গ্রাস করছে। তার মুখ ফ্যাকাসে দেখায়। সে এমনি সুন্দর আরামপ্রদ অনেক কিছুর চারপাশে ঘুরে বেড়ায়—পোকার মত আগুনের শিখায় পা সেঁকে আবার নিমেষে উড়ে যায়। চুনীটা জ্বলজ্বল করছে. রক্তের ফোঁটার মত দেখায়। তার মনে হয় সুন্দর। দেখলে নেশা লাগে—আর ভয় করে। বাইরে পৃথিবীটা পুড়তে পুড়তে যেন ছাই হয়ে গেছে। তার অস্তিত্ব মনে পড়ে না।

আবার মনে হয় একটা বিষাক্ত ফুলের দিকে সে চেয়ে রয়েছে। রঙীন পাপড়ি খুলে আলোয় জ্বলজ্বল করছে তা। সে খুব ছোট একটা কীট, আস্তে আস্তে ফুলটার কেন্দ্রে গিয়ে পড়ছে। একটা অপ্রতিরোধ্য বল তাকে ঠেলে নামিয়ে দিচ্ছে। এইবার পাপড়িগুলো একটি একটি করে বন্ধ হয়ে যাবে। কয়েকটা নরম শুঁয়ো তার দেহের সংযোগ-বিন্দুগুলোকে জড়িয়ে ধরবে। তার হাত পা নাক মুখ চর্মসার বুক, সব কিছু এক একটা শুঁয়ো এসে প্রচ্ছন্ন ক্ষিপ্রতায় বেষ্টন করবে। শেষে একটি মাত্র রঙীন পাপড়ি নেমে আসবে তার চোখের উপর। অন্ধকার। ভয়, যাকে সে জানে সেই অন্তরালবর্তী অবিরাম ধ্বনির মতই—তাকে ছেয়ে থাকে। একটা সাদা ছোপ দেওয়া দেওয়া দেয়ালের বাইরে দিয়ে তার চোখ কেবলই এগোয়—কেবলই তার আগে—যতদূর সে তাকায় তারও আগে। আচ্ছা, মেয়েটি যদি আবার কথা বলে? হঠাৎ তার মন সজাগ প্রত্যাশায় চায়—তাহলে হয়ত দেয়ালটার প্রান্ত সে দেখতে পাবে। সে মনে মনে ভাববার চেষ্টা করে। কথার ধ্বনিটা এখনও তার কানে। কি সুন্দর তার কানে বেজেছিল। হ্যাঁ, তার দিকে চেয়েই বলেছিল। আর কেউ ছিল না—রোদ একাকার হয়ে ঝরে পড়ছিল পিচগলা চকচকে রাস্তায়—একটুও ছায়া ছিল না। তারপর কত দীর্ঘ কাল পার হয়ে গেছে। সে বসে আছে কাছাকাছি, হাঁটুর উপর দু'হাত রেখে— তার পিঠ ধনুকের মত বেঁকে ঝুঁকে রয়েছে সামনে। মাঝে মাঝে গাড়ীটা প্রবল ঝাঁকি দিয়ে দুলে উঠছিল—সে অনুভব করছিল মেয়েটির দেহ তখন আরও নিবিড় হয়ে, আরও নিকটে আসছিল তার। তার দেহের অন্ধকার-ময়তায় ক্ষণিক আলোর স্পর্শের মত কাছে এসে আবার সরে যাচ্ছিল।

সাময়িক ভাবে সে ভুলে গিয়েছিল—কোথায় যেন পৌঁছতে সে যাত্রা করেছিল বাড়ী থেকে। কত রাস্তা পেরিয়ে গেছে তার মনে পড়ে না। এক জায়গায় বাসটা ঝাঁকি দিয়ে দাঁড়াতেই মেয়েটি উঠে দাঁড়ায়। সে চমকে মুখ তুলে তাকাতে থাকে। মেয়েটি নেমে যাচ্ছে। সে বুঝতে পারে না। তার বিমূঢ় দৃষ্টি অনুসরণ করে মেয়েটিকে। তার দেহ অনুভূতিহীন জড়বস্তুর মত জেগে থাকে উঁচু হয়ে। একটা কিসের আবেগ সহসা ঠেলে উঠতে চায় তার অনেক গভীর থেকে—ঠোঁটের রেখা ভেঙে বেঁকেচুরে কুঁচকে ওঠে। মুখটা দেখায় অস্বাভাবিক। ঠোঁট দুটো কাঁপতে থাকে। যেন বহুবিধ শব্দ ফুটে উঠে থেমে থাকে তার সীমানায়। সিঁড়ির কাছে মেয়েটি একবার মুখ ফিরিয়ে তাকায়। ছোট একটু ক্ষণিকের হাসি ঠোঁটের কোণে ভেঙে পড়ে সরে যায় তার নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। বাসের জানলা দিয়ে সে দেখে তাকে হেঁটে যেতে ফুটপাথ ধরে। সে যেন আশা করে মেয়েটি আবার তেমনি ফিরে চাইবে, আবার সেই পলাতক হাসির কোণ মুছে যাবে ঠোঁটের প্রান্তে। বাস চলতে থাকে। পাশের শূন্য আসনের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে তার চোখ ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে আসে। লাল-বাজারে গাড়ী পৌঁছলে সে নেমে পড়ে হাঁটতে থাকে ভীড়ের মধ্যে দিয়ে। একটা ঘড়ির গায়ে কাঁটার দিকে চোখ তুলে সে আবার নামিয়ে নেয়। আজ অনেক দেরী হয়ে গেছে। এই মাসে তিন দিন দেরী করে সে অফিসে ঢুকছে। কিন্তু তার মনে কোন উদ্বেগ বোধ হয় না। যেমন আস্তে আস্তে সে চলছিল তেমনিই হেঁটে চলে। একটা পুরানো পাঁচতলা বাড়ীর দিকে ভুরু তুলে তাকিয়ে সে এগিয়ে আসে। দরজা দিয়ে ঢুকে সে একটু থমকে দাঁড়ায়। সিঁড়িটা অন্ধকার—ঘুরে ঘুরে ধাপগুলো উঠেছে। দেয়ালের গায়ে একটা গাঢ় রংয়ের প্রলেপ দেওয়া। সিঁড়ির কাঠের ধাপগুলো বহু বছর পায়ের ঘসা লেগে লেগে ক্ষয়ে গোল হয়ে গেছে কানার কাছে। সে ধাপগুলো দিয়ে আস্তে আস্তে ওঠে।

এই সে, শান্তনু দত্ত, সেদিন আফিসের দরজা পেরিয়ে যে দেরী করে এসে ঢুকেছিল। বাইরে থেকে চেয়ে দেখলে ঘরখানা দেখায় একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গের মত। একেবারে অন্য প্রান্তে পাশাপাশি কয়েকটা জানালা—তার ওধারে আরেকটা বাড়ীর দেয়াল উঠেছে। যেটুকু আলো ঘরটায় ঢোকে তা মাঝামাঝি এসে মুছে যায়, তিন-চতুর্থাংশ আবছা হয়ে থাকে। দুপাশের

উঁচু দেয়ালে পিঠ দিয়ে ছাদ অবধি সার সার খুব চওড়া কাঠের র‍্যাক—গাদা দেওয়া তাতে তাড়া বাঁধা ফাইল ধূলো পড়ে চটের রং নিয়েছে। সার সার কয়েকটা টেবিল। একপাশে দুজন টাইপিস্ট কাজ করছে—একঘেঁয়ে আওয়াজ ক্রমাগত কানে এসে লাগে। জানলার দিকে তিনখানা টেবিল; তার একখানা খালি থাকে সব সময় আর দুখানা ব্যবহার হয়ে থাকে। টেবিল-গুলো পুরানো, এককালে হয়ত চকচক করত কিন্তু বছরের পর বছর ধুলো বালি আর স্যাঁৎসেতে ঘরটার আবহাওয়ায় ময়লা ধূসর হয়ে গেছে। ঘরের মাঝামাঝি দেয়ালের ধারে আর একটা টেবিল রাখা। একধারে একটা নিক্তি দাঁড় করানো—আঠার শিশি, একটা পোড়া মোমবাতির গা ক্ষয়ে এবড়ো-খেবড়ো হয়ে আছে—নানা জায়গায় গালার ফোঁটা লাল লাল বিন্দুর মত ছড়িয়ে—একটা ময়লা ছোপধরা কাচের গেলাসে গতদিনের জল রাখা ছিল—ধুলোর একটা সর ভেসে থাকে উপরে আর কাঠের ট্রেতে অনেকগুলো খাম লেবেল ইত্যাদি এলোমেলো ছড়ানো। পিছনে বসবার একটা টুল। এটা শান্তনুর বসবার টেবিল। ঘরের শেষের দিকে টেবিল তিনটের মাঝেরটা অপেক্ষাকৃত বড়। জানলার দিকে পিঠ ফিরিয়ে আফিসের ম্যানেজার রায়বাবু বসেছিলেন টেবিলটায়। তাঁর হাতে ধরা কলম অবিরাম লিখে চলেছিল কাগজে। শান্তনু দরজা দিয়ে ঢুকতে মুখ তুলে তাকালেন তিনি। তাঁর মাথা ছাড়িয়ে দরজার চৌকাঠ উঠেছিল অনেক উপরে—তাঁর আকৃতিটা উঁচু দরজার পাশে মনে হয় অত্যন্ত ছোট। বাইরে থেকে ঢুকে সে হঠাৎ কিছু দেখতে পায় না স্পষ্ট। দূরে টেবিলের উপরে রায়বাবুর মুখ একটা ছায়া বই আর কিছু মনে হয় না। ভিতরে পা দিতেই একটা দ্বিধা সজাগ হয়ে ওঠে—তার পা জড়িয়ে আসে। টাইপের আওয়াজ একটানা কানে এসে লাগে। কপাটের পাশে টুলে বসা বেয়ারা মুখ তুলে চেয়ে আবার মুখ নামিয়ে নেয়। অন্য ধারের টেবিলগুলো থেকেও কেউ কেউ মুখ তুলে তাকায়। আপন পা ফেলায় একটা অসঙ্গতি সে যেন নিজে টের পায়। ঘরটার মধ্যে থেকে আবার পিছনে হেঁটে যেতে তার ইচ্ছা করে। কিন্তু সে এগিয়ে আসে। দরজা থেকে অল্প দূরে চারিপাশের আবছায়ায় সে ডুবে যায়—তবু সে সামনে কিছু দূরে ছায়া থেকে চোখ নামাতে পারে না। সেই ছায়ার অদৃশ্য দৃষ্টি তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে—সে যেন বিঁধে থাকে তার একাগ্রতায়। মাঝামাঝি এসে সে তাকায় অন্ধকারে রাখা একপাশে তার টেবিল-টার দিকে—উপরে এককোণে মোমবাতিটা নিভানো। সেটা জ্বালালে টেবিলে

একটা রাতের মত ভাব ফুটে ওঠে। সে ভাবে গিয়ে বসে পড়বে। কিন্তু তার পা দুটো তার ইচ্ছাকে এড়িয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলে। ঘরটার যেন শেষ নেই। চারিদিকে উঁচু উঁচু র‍্যাকগুলোয় ঢিবিঢিবি জড়ের স্তূপ। ছায়া ঝুল ধূলো মাকড়সার জালে ঢাকা। কয়েকটা হাঁড়ির মত পুরানো সেকেলে পাখা মাথার উপর কেবল ঘড় ঘড় আওয়াজ করে ঘুরতে থাকে। একটানা ঘড় ঘড় আওয়াজ থেমে থেমে—তার শ্রবণকে আরও তীক্ষ্ণ করে তোলে। সে আস্তে আস্তে মাঝের টেবিলটার কিছু দূরে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। রায়বাবু কি একটা কাগজে খসখস করে লিখছিলেন একমনে। তিনি তার এসে দাঁড়ানো টের পেয়েছেন বলে মনে হয় না। কেউ টের পায়নি হয়ত। তার হৃৎপিণ্ড এমনি আঘাত করছে পাঁজরার দেওয়ালে। আবার ফিরে গিয়ে টেবিলটায় বসে পড়লেই মিটে যায়। সে আস্তে আস্তে পিছন ফিরে এগোতে থাকে। হঠাৎ তার মনে হয়—সে তবু বসতে পারবে না গিয়ে—একটা কিসের মানা উঁচিয়ে ওঠে সামনে। সাবধানে ফিরে চাইবার চেষ্টা করে সে জানালার ধারে টেবিলের দিকে।

রায়বাবু স্থির দৃষ্টিতে তার এগিয়ে যাওয়া লক্ষ্য করছিলেন এতক্ষণ। সে জানতে পারেনি। তার মনে হয় তিনি আগাগোড়াই চেয়ে ছিলেন। তার দ্বিধাগ্রস্ত পায়ের ওঠা পড়া তাঁর চোখ এড়ায়নি। গলায় একটা শুষ্কতা ছড়িয়ে পড়তে সে অনুভব করে। আবার ফিরে আসে সম্মোহিতের মত সেই দৃষ্টির রেখা ধরে। টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ায় থমকে।

—কি মনে করে!—একটা কর্কশ রুক্ষ স্বর তার কানে এসে ঘা মারে। সে কোন জবাব দেবার চেষ্টা করে না।

কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে তিনি আবার বলেন,—এই মাসে তিনবার লেট হয়েছ। তোমাকে দিয়ে কোম্পানীর চলবে না। অকর্মণ্য লোক দিয়ে—বলতে বলতে থেমে যান তিনি। তার মুখের দিকে চেয়ে অমানুষিক বিতৃষ্ণায় মন ভরে ওঠে যেন—তার ঝুঁকে পড়া শরীরটা মনে হয় যেন মানুষের মূর্তিকে ব্যঙ্গ করে।

—দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? চলে যাও—তিনি চীৎকার করে ধমকে ওঠেন। শান্তনু বুঝতে পারে না কোথায় যেতে বলা হয়েছে তাকে। সে না বোঝার চোখে তাকিয়ে থাকে। একজন প্রৌঢ় লোক পাশের টেবিল থেকে উঠে এসে তাকে বলেন—তোমার জায়গায় গিয়ে কাজ কর। রায়বাবু বলছেন—

সে তাঁর হাত দিয়ে দেখান দিকে এগিয়ে এসে বসে পড়ে টুলে, তার চোখের কাচের মত দৃষ্টিতে খোঁজে টেবিলের উপর কিছু।

শান্তনু দত্ত—নামটা কি ভেবে তার রাখা হয়েছিল তা সে বুঝে উঠতে পারেনি। নামটা তার সুন্দর—মহাকাব্যে পাওয়া যায়। হয়ত অনেক কিছু যা সুন্দর তা এই নামের মধ্যে ফুটে ওঠে। আবার তার ক্ষীণ অস্থিসংকুল হাত দুটোর শিকড়ে শিকড়ে আঙুলের রক্তহীন পাণ্ডুরতা তাকে মনে করিয়ে দিত নামটা তার যথার্থ নয়। সে মহাকাব্যের নয়—এই অন্ধকার দীর্ঘ ঘরের টেবিলে ঝুঁকে গালা দিয়ে সে শীল মোহর করে চলে যন্ত্রের মত হাতে—চিঠি পার্শেলের ডাঁইয়ের মধ্যে তার মাথা ঝুঁকে থাকে। সামনে জেগে থাকে উঁচু উঁচু ধূলোপড়া র‍্যাকের পর র‍্যাক, দেয়ালের গায়ে চিরকালের স্তব্ধ ছায়া। তবু যখন বেলাশেষে অন্ধকার হয়ে আসত—সহরের গলিতে গলিতে ছায়া এঁকে বেঁকে ছড়িয়ে পড়ত—বাড়ীগুলোর সারি সারি জানালার আলো অন্য কোন দেশে কোন সময়ে দেখা স্মৃতির মত হঠাৎ তাকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যেত, তখন তার এই আকৃতিকে দেখা যেত না। গলির মোড়ে মোড়ে গ্যাসবাতির আলোতে অন্য সব কিছুর মত তার নিজেকেও মনে হত অবাস্তব কোন রূপে মণ্ডিত। সে নিজেকে দেখতে পেত না, বা পেত যেমন রাতের বেলা সব কিছু দেখায়, অন্ধকার ছায়ার গায়ে আলোর সুতো বোনা, অস্পষ্ট। হঠাৎ নিজেকে তার মনে হত বড়। তার দেহের জীর্ণ বাঁশের দেয়ালে হাওয়া বয়ে আসত। সে শান্তনু দত্ত—রাতের কৃষ্ণতায় ঢেকে গেছে সে—তার চেয়ে বেশী সে অনুভব করতে পারত না।

ঘোরান সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে যেতে হঠাৎ সেই মেয়েটির মুখ তার মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। সে সচকিত হয়ে তাকায়—ছবিটাকে বিশ্বাস হয় না সহসা। তবু মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ভিতরে জড়িয়ে যায় একটা কোমলতার স্বাদ—রুক্ষ দিনের শেষে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়ার মত তার মন থেকে অবসাদ ঝরে পড়ে। সে ভাববার চেষ্টা করে কৃপণের মত, প্রত্যেকটি লুপ্ত খণ্ডকে মনের অন্তরাল থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে—একটা দ্বিপ্রহরের ক্ষণকে গড়ে তুলতে চায় মনের ভিতরে। রাস্তায় নেমে চলতে চলতে চোখে পড়ে তার হাতের আঙুলগুলোয়। সে সামনে ছড়িয়ে ধরে চেয়ে

দেখে—চামড়া কালো খসখসে—আঙ্গুলগুলোর গিঁট মোটা—নখের নীচে হলুদ রং ফুটে রয়েছে। ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে মেয়েটির পাশে সে বসে ছিল। তার মনে হয় যেখানে তার দেহ ছুঁয়েছিল তার সীমারেখা এখনও একটা উষ্ণতা লেগে আছে সেখানে—ধূলোর গুঁড়োর উপরে বৃষ্টির ফোঁটা জমে থাকার মত—সে আশ্চর্য হয় তুলনাটা মনে আসায়। আবার স্বাদটাকে ফিরে পাবার লোভ হয়।

তার মনে পড়ে কখন কেল্লার ধারে মাঠে গিয়ে সে বসে থাকত। একদিন এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। মাটি তখনো উষ্ণতায় ভরা। তার ইচ্ছা হয়েছিল অদ্ভুত ভাবে হঠাৎ সেই ঘাসে নাক চোখ ঠোঁট ডুবিয়ে শুয়ে থাকতে। একটা আশ্চর্য মোহ যেন তাকে পেয়ে বসেছিল—সে শুয়ে শুয়ে ক্রমাগতই সেই ঘাসের নরমের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল—সব আওয়াজ থেমে আসছিল--কানে অন্য অনেক মৃদু লঘু শব্দ এসে আঘাত করছিল—শব্দের অশ্রুততায় তারা ঝরে পড়ছিল। তার মনে হয়েছিল ধীরে ধীরে ঘাসগুলো বড় হতে থাকে, জন্মাতে থাকে, মরে যায়। তাদের ছোট ছোট অসংখ্য ফুল ফুটে ওঠে। তার শুকনো দেহটা জড়িয়ে ফেলে ঘাসের ঠাসবুনুনীতে। সে ঘুমের মত মিশে যাচ্ছিল ঘাসগুলোর দেহে। যেন সেই সবুজ স্রোত তার রোমকূপের ভিতরে পথ করে নিচ্ছিল আর সে জেগে উঠে অন্য কোন জন্মান্তরের পথ বেয়ে ভেসে যাচ্ছিল।

আলো ম্লান হয়ে আসে উঁচু বাড়ীগুলোর শীর্ষে। সে হেঁটে যায় গীর্জার পাশ দিয়ে। গীর্জার ছুঁচলো টোপরের মাথায় তখনো সন্ধ্যার একটু উজ্জ্বলতা ছুঁয়ে ছিল—তা মনে আনে অনেক পাখী উড়ে ফেরার কথা। রাস্তা দিয়ে মানুষের সার বয়ে যায়। তাদের পায়ের আওয়াজ সে শুনতে পায় না। একটা শব্দহীন সজাগ রাস্তা দিয়ে সে হেঁটে চলে। সারি সারি দোকান—আলো জ্বলে উঠছে একের পর এক। কেনাবেচা চলেছে। দোকানীরা পালক বাঁধা ঝাড়ন রকমারী সাজানো জিনিষগুলোর গায়ে বোলায়। নকল সোনার গহনা, চৌকো চৌকো কাচ বসানো আয়না, রেশমি ফিতে, কালো গোছায় ঝোলানো চুল বাঁধার ট্যাসেল, পলকাটা কাচের গেলাস, ছবি আঁকা তেলের শিশি, লাল নীল বেগুনী রং ঝলমল করে। দাড়িতে মেহেদীর রং ছোবান প্রৌঢ় মুসলমান আলবোলায় তামাক টানতে টানতে সুর্মাদান বেচে, চুড়ির দোকানে শলমার কাজ করা ওড়না মাথায় উত্তর ভারতীয় নারীরা ঝুঁকে চুড়ি বাছে। সে দুচোখে গোগ্রাসে গিলতে থাকে সব

কিছু। পা দুটো ভীড়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলে। তাকে কেউ দেখে না—স্রোতের উপর বুদ্বুদের মত সে ভেসে যায়। একটা মুখে তার চোখ পড়তে সে চমকে ওঠে। মুখের নীচের ভাগ আঁচলে ঢাকা—জোড়া ভুরুর নীচে থেকে দুটো চোখ চকিতে তার দিকে চেয়ে আবার হারিয়ে যায় ভীড়ের মধ্যে। একটা অদ্ভুত ধারণা তার মনে আসে, বোধহয় এই ভীড়ের মধ্যে তার চোখ আবার পড়েছিল সেই দুপুরে দেখা মেয়েটির চোখে। অগুনতি মানুষের মুখে দোকানের সারি সারি উজ্জ্বল আলো এসে পড়ছিল। সে হাতড়ে হাতড়ে চাইতে চাইতে ভীড়ের মন্থর স্রোতের সঙ্গে এগোয়।

আলো জ্বলে উঠেছিল সর্বত্র। একটা গলি পেরিয়ে চিৎপুরের রাস্তায় এসে পড়ল সে। নাকে মশলার ফুলের ভ্যাপসানো ডাঁই করা ময়লার, পচা ফল পাকুড়ের উগ্র গন্ধ এসে লাগে। চূড়ো করা লাল হলুদ ধুসর চূর্ণের স্তূপ—অন্ধকার দোকানের ভিতরে সাজানো বাসনের গায়ে আলো চমকে ওঠে, এক আঁজলা ভিজে বাতাস বয়ে আসে, অন্ধকার জনহীন রাস্তায় সার সার কয়েকটা কামারশাল থেকে হাতুড়ির আওয়াজ আসে। আগুনের আভা কয়েকটা অনাবৃত ঘাম চোঁয়ান দেহে এসে পড়ে—কয়েকটা নিঃশব্দ হাত উঠছে পড়ছে—হাতুড়ির আওয়াজ হয় একটানা—বড় বড় ছায়া লাল আভায় কেঁপে কেঁপে—সাদা হয়ে তেতে ওঠা লোহার গা থেকে ফুলকি ঠিকরে পড়ে। নিস্তব্ধ বাড়ীর দেয়ালের নীচে ঘায়ে দগদগে একটা শরীর পড়ে পড়ে কাতরায়। ফুটপাথে কয়েকটা আলেয়ার মত স্ত্রীমূর্তি নড়ে চড়ে বেড়ায়। সে পাশ দিয়ে যেতে কয়েকটা চোখের সাদা চকচক করে ওঠে অন্ধকারে। তার জানা এসব। ধোঁয়া জড়িয়ে থাকে পথটায়। কেউ ডাকে চাপা গলায়, অন্ধকার জলে ভাসা স্থির ছায়া একটা বজরা থেকে, পাড় থেকে অন্য কে সাড়া দেয়। স্যাঁৎসেতে মাটি নালি দিয়ে উগরে আসা রাস্তার উপর ছড়িয়ে রয়েছে, একটা মরা ইঁদুর থেঁৎলে রয়েছে এক পাশে। সে চেনে এসব কিছু। সরু একফালি জলের বুকে চকচক করে একটা উজ্জ্বল তারা। সে ছড়িয়ে পড়েছে শ্বাসরুদ্ধ ব্যাপকতর অস্তিত্বে। তবুও তা ব্যাপক—কোণ ভাঙা ভাঙা ইঁটের স্তূপের পাশে ভাঙা দেয়ালের মত। সে ফিরে যাচ্ছে এক জরায়ুর অন্ধকারের ভিতরে দিয়ে। পচধরা জীবিত আর মৃত স্তূপের মধ্য দিয়ে ফিরে চলেছে, মৃত জীবন্তকে মাড়িয়ে জীবন্ত মৃতকে মাড়িয়ে। তার চোখ আর কিছু দেখে না। পাড়ে বসে শান্ত অন্ধকারে সে তাকিয়ে থাকে।

দুই

একটা জীর্ণ-শীর্ণ বাড়ী। চূণ পলস্তরা খসে ইঁটের গাঁথনী ফুটে উঠেছে জায়গায় জায়গায়, একটা অপরিসর দরজার ঝনকাঠে বছরের পর বছর সিঁদূরের দাঁড়ি টেনে মঙ্গলচিহ্ন আঁকা। জালি দেয়া জানালা, সরু গলির ফাঁকে রোদ উঁকি দেয় না। শান্তনু দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কান পাতে; তারপর কড়া নাড়ে। কোন শব্দ আসে না। কিছুক্ষণ থেমে আবার নাড়ে। ভিতর থেকে শোনা যায় পায়ের ঘ্যাসটানো শব্দ, তারপর দরজা খুলে যায়। একজন বর্ষীয়সী প্রৌঢ়া বিধবা দরজা খুলে দেন। তার দিকে বারেক তাকিয়ে পিছন ফিরে চলে যান। শান্তনু দরজায় খিল এঁটে নিঃশব্দে ঢোকে ভিতরে। বর্ষীয়সী বিধবা তার মা। তিনি যেতে যেতে একটু থমকে দাঁড়িয়ে বারান্দা থেকে কি একটা কুড়িয়ে নেন, তারপর উঠে যান সিঁড়ি দিয়ে। সে দেখতে পায় না তাঁর মুখ যা সামনে ফিরে থাকে।

ছোট বাড়ী। মধ্যে চৌকোনা উঠান; একপাশে রান্নাঘর। রাস্তার দিকে ঘরটা সব সময় বন্ধ থাকে। সে ঘরটায় শান্তনুর পিতামহ থাকতেন। তাঁর মৃত্যুর পর পুরানো আসবাব অদরকারী সামগ্রীতে ঠাসা ঘরটায় তালা দেওয়া থাকে। কোণাকুণি সিঁড়ি, দোতলায় করুণাদেবীর শোবার ঘর আর একফালি ছাদ বিভক্ত করে রাখে চিলেকুঠুরীটাকে। সিঁড়ির ঠিক পাশের দক্ষিণমুখো ঘরটা শান্তনুর বড়ভাই নিতাইয়ের। বাড়ীতে মানুষ তিনজন—শান্তনু, তার দাদা নিতাই আর মা। সন্ধ্যাবেলা তার মা জপ করেন, সংসারের কাজ ওবেলাই সারা হয়ে থাকে—এবেলা বাড়ীটা নিঝুম হয়ে ঝিমোয়। অন্ধকারেও বাড়ীটার দৈন্যদশা যেন ফুটে ওঠে। দেয়ালে চূণকাম পড়েনি বহুদিন, কোণগুলো থেকে কালো কালো দাগ নেমে এসেছে বৃষ্টির। স্যাৎসেতে ভিজে গন্ধের সঙ্গে পুরানো লেপতোষক, মশলা, ঝুল, আঁস্তাকুড়ের মিশ্রিতগন্ধ ঝনকাঠ পেরোলেই নাকে এসে লাগে। শান্তনু উপরে মায়ের ঘরে শোয়। জুতো খুলে কলতলায় হাত-মুখ ধুয়ে সে উঠতে থাকে সিঁড়ি দিয়ে। ঘরটায় ঢুকলে চোখে পড়ে উঁচু সেকেলে ভারী ভারী

পায়া দেওয়া একটা পালঙ্ক অন্য প্রান্তে রাখা। পুরু গদির উপরে সাদা চাদর মোড়া, আড়া আড়ি কয়েকটা বালিশ, পাশ বালিশ সাজানো। দেওয়ালে শিব-কালী-দুর্গা নানা দেবদেবীর জমকালো বিবর্ণ রঙীন ছবি টাঙানো। দেয়ালে গাঁথা কাচের আলমারীর ভিতরে সাজানো সিঁদুর কৌটা কড়ি শাঁখ ফুল আঁকা শ্বেত পাথরের ট্যাবলেট, কিছু পশমের কাপড়, শাল, চিনেমাটির শতাব্দীর পুরানো বাসনের গায়ে ছবি তোলা মাটির পুতুল, একটা রুদ্রাক্ষের মালা। দেয়ালের মাথায় একটা বড়ো ফটোয় গলাবন্ধ কোট, কোঁচান ধুতি, গলায় চাদর জড়ানো একজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। শান্তনুর বাবার ছবি—কিন্তু তার জ্ঞান হওয়ার পূর্বেই তিনি মারা যান বলে ছবিটা বরাবর তার দিকে অপরিচিতের চোখ মেলে চেয়ে থাকে। করুণাদেবী চৌকির পায়ের দিকে মেঝেয় বিছানো আসনে আবার এসে জপ করতে বসেছিলেন। পায়ের শব্দে টের পান শান্তনু ঘরে এসে ঢোকে। চোখ না খুলেই হাতের পিঠ বাড়িয়ে ঢাকা দেওয়া খাবারের থালাটার দিকে ইঙ্গিত করেন তিনি। অনেক দিনের অভ্যস্ত অনুষ্ঠানের মতই সব কিছু ঘটে। শান্তনু আস্তে আস্তে জামাটা মাথার উপর দিয়ে গলিয়ে খুব সাবধানে খোলে যাতে ভাঁজ নষ্ট না হয় বা কাঁধের কাছে ছেঁড়াটা বর্ধিত না হয়। জামাটা আলনায় রেখে সে ঘাড় ফেরায় ঢাকা দেওয়া থালাটার দিকে। মায়ের নিশ্চল মূর্তিটার দিকে একবার তাকিয়ে সে এসে বসে ঢাকনা খুলে খেতে আরম্ভ করে। তার খাওয়ার মধ্যে একটা ক্লান্ত জানোয়ারের ক্ষুধা মেটাবার ভঙ্গী—অস্বাভাবিক দ্রুততা নয়, একরকম যান্ত্রিক নিরবচ্ছিন্ন গতি। নিঃশব্দ ঘরটায় একটানা শোনা যায় চক চক খাওয়ার শব্দ। মা জপ করতে করতে একবার চোখ খুলে সেদিকে ফিরেই আবার মুখে আওড়ে যান বীজমন্ত্র। অস্পষ্ট একটা বিতৃষ্ণার ছায়া তাঁর মুখে এসে পড়ে। শান্তনু একমনে খায়। উদরপূর্তি না হওয়া পর্যন্ত সে থামে না। একনাগাড়ে ভালমন্দ নির্বিচারে সে তুলে তুলে মুখে ফেলে, তার গলা বেয়ে চর্বিত আহারের নেমে যাওয়া মোটা হয়ে ফুটে ওঠে থেকে থেকে।

করুণাদেবী জপ করেন। ইষ্টদেবতার নাম শব্দহীন ঠোঁটের মৃদু কাঁপায় বারে বারে ওঠে পড়ে। অর্ধ শতাব্দী কাল তিনি এই বাড়ীতে দেয়ালগুলোর ছায়া আঁকড়ে জপ করেছেন। একদা এক কিশোরী বধূ গৃহাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। নিতাইয়ের ঠাকুর্দা কর্তামশাইকে মনে পড়ে। প্রপিতামহের রেখে যাওয়া পৈতৃক বাড়ীর অনেকটা হাত ফের হয়ে চলে গেছে তিনপুরুষ

বসে খাওয়ার তাগিদে। তাছাড়া কর্তমশাই ফূর্তিবাজ লোক ছিলেন। করুণাদেবীর অস্পষ্ট মনে পড়ে—কালো বেঁটে মত, মাথায় কাঁচা পাকা চুল, ভাঁটা ভাঁটা চোখের দিকে চাইতে ভয় করত। বাইরের ঘরে প্রতি সন্ধ্যায় আড্ডা বসত। বন্ধু-বান্ধব ইয়ার বক্সীরা আসত। কর্তামশাই দরাজ মনের লোক ছিলেন। দাবা তাশ পাশার হল্লা শোনা যেত মাঝরাত্তির অবধি। মাঝে মাঝে হল্লা ভয়াবহ হয়ে উঠত। করুণাদেবীর শাশুড়ী বলতেন, আজকে মাত্রাটা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। মাত্রা মানে মদ—তিনি জানতেন। ভিতরে গলদা চিংড়ি ঝাল লঙ্কা বাটা দিয়ে থালা বোঝাই চালান যেত বৈঠকখানা ঘরে, মেয়েরা সেদিক মাড়াত না। নেশার ঘোরে বেটাছেলেদের মেয়ে বউ জ্ঞান থাকে না। চোখ ঠেরে হাসা-হাসি করত ননদেরা। সৈরীর মা ঝিয়ের তখন নবীন বয়স, গড়ন ছিল নিটোল পাথরের বাটী যেন। একদিন মেয়েদের ব্রতসারার জোগাড় দিতে দিতে সন্ধ্যা পার হয়ে গিয়েছিল। সেদিন বৈঠকখানা ঘর থেকে মুহুর্মুহু চীৎকার গড়িয়ে আসছিল। একবার আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে শাশুড়ী নাকি দেখে আসেন কর্তামশাই কাবলেদের মত পাগড়ী মেরজাই এঁটে ঘুরে ঘুরে নাচছেন। ইয়ার বন্ধু একজন তবলায় চাঁটি দিচ্ছে। আসর গুলজার। সৈরীর মা কিছুক্ষণ পরে আঁচলে ঢেকে থালায় করে প্রসাদ নিয়ে বাড়ী ফিরছিল ঘোমটা টেনে—হঠাৎ বেলেল্লা হল্লার মধ্যে নারীকণ্ঠের আর্তনাদ ভেসে আসে অন্দর মহলে। কর্তামশাইয়ের এক মোসায়েব নেশার ঘোরে সৈরীর মাকে অপ্সরী বলে ভ্রান্ত হয়ে দরজা থেকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল ভিতরে। হাতের থালায় পাঁঠার ঝোল না পেয়ে দু'চারটে ইয়ারকির কথা বলেছিল। ঘটনা অনেক দূর গড়াত যদি শাশুড়ী সাক্ষাৎ চণ্ডীর মত ঝাঁটা হাতে না গিয়ে পড়তেন। তাঁর ঝাঁটার আস্ফালনে সব মাতালের নেশা ছুটে গিয়েছিল সেদিন তৎক্ষণাৎ। সৈরীর মা কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরে গিয়েছিল। মাতালকে বড় ভয় করুণা-দেবীর। আর চিমসে মত সেই সুদখোর মিন্সে প্রতিমাসে কাঁটার মত সঠিক আসত। এক এক করে শাশুড়ীর গায়ের গহনাগুলো কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। সোনার ঝকমকি মিলিয়ে এক একটা অঙ্গকে নিরাভরণ করে রেখে।...

...ঠাকুরজামাই থাকতেন বারোমাস এ বাড়ীতে। একদিন কর্তামশাই অহেতুক রাগঝাল করে তাকে বাড়ী থেকে চলে যেতে বললেন। ঠাকুরজামাইকে মনে পড়ে। সৌখীন মানুষ ছিলেন—বাবরি চুলে তেড়ী কাটতে আধঘণ্টা লাগত

রোজ তাঁর। কোঁচান শান্তিপুরী ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবী, গলায় সিল্কের চাদর জড়িয়ে ঠাকুরজামাই পেটেণ্ট লেদারের জুতো পায়ে মস্ মস্ করে যখন হাওয়া খেতে বেরোতেন—শাশুড়ী রোজ মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলতেন—আমার এই একটি জামাই রাজপুরুষের মত। আতরের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ত ভুর ভুর করে মেয়ে মহলে। সত্যিই রাজপুরুষের মত। মৃদুভাষী, মুখে সদাই হাসি লেগে থাকত। করুণাদেবী অন্ধকারে যেন প্রত্যক্ষ দেখতে পান। স্মৃতিরা ফিরে আসে—যেন কালিপড়া দেওয়ালগুলো পাণ্ডুর আলোয় তাঁর দিকে চেয়ে কথা বলে।—ঠাকুরজামাই কর্তামশাইয়ের বৈঠকখানা ঘরের ছায়া মাড়াতেন না। একলা নির্বিবাদী লোক ছিলেন। তাঁর একটি রক্ষিতা থাকত শহরের কোন এক অঞ্চলে। প্রায়ই যেতেন। ফিরতেন একটু বেশী রাত করে। কখনো মুখে মদের গন্ধ পাওয়া যেত। কিন্তু ঠাকুরজামাইর রূপ ছিল শশীকলার মতো। দরজায় এসে দাড়ালেই আলো হয়ে উঠত চারিদিক। ঠাকুরজামাই বেশী কথার মানুষ ছিলেন না। তাই কর্তামশাইয়ের তর্জন গর্জনের একটি উত্তরও দেন নি। পরের দিন মোটঘাট বেঁধে স্ত্রী-পুত্র পরিবারের হাত ধরে তিনি চলে গেলেন ঘোড়-গাড়ী চেপে। মহম্মদবাজারে তাঁর পৈতৃক ভিটে ছিল, কিছু জমি-জমাও ছিল। রাগ করেছিল করুণাদেবীর ননদ লীলা। প্রথমে সে চেঁচামেচি করে, পরে কান্নাকাটি। কিন্তু যে আলো বাড়ীটা থেকে সরে গিয়ে পড়ে থাকছিল দিনশেষের মত তাকে আর তুলে ধরে রাখা যায়নি। এরপরে ভাঙ্গন এল যেন নিঃশব্দ পায়ে, করুণাদেবীদের সংসার সরে এসে বাড়ীর এই অংশে বাস করতে আরম্ভ করল, সাবেক মহল বিক্রী হয়ে গেল। তবু পাওনাদারদের আনাগোনা কমল না বরং তাদের চেঁচামেচি ইদানীং গা সওয়া হয়ে এসেছিল। স্বামীর বোনেদের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল—সবের ছোটটিরও সম্বন্ধ আসছিল। যাই হোক তাঁরা ছিলেন বড়ঘর—এককালে নামডাকে ম্লান হয়ে থাকত পাড়ার অন্য ঘরগুলো। তাই বিয়ের উদ্‌যুগ আয়োজন চলছিল। রকমারি ক্যাটালগ নিয়ে স্যাকরা ঘোরাফেরা করছিল। কিন্তু একদিন মাঘের গোড়ায় সামান্য একটু জ্বর ক্রমে দারুণ হয়ে মেয়েটির সংজ্ঞা হরে নিয়ে গেল।···শববাহীদের হরিবোল যেন কানে এসে পৌছয় সেদিন রাতের···করুণাদেবীর মুদিত চোখের কোণে চিকমিক করে এক ফোটা জল। সোনার প্রতিমা তুলে নিয়ে তারা চলে গেল। কর্তামশাই শয্যা নিলেন। শাশুড়ীর চৈতন্যহীন দেহটা লুটিয়ে রইল সান বাঁধানো উঠোনে। এক এক করে সবাই চলে গেছে। স্বামীর ছোট ভাই

দেশ ছেড়ে চলে যায় রেঙ্গুনে ষোল বছর বয়সে। শাশুড়ীর একটু কোলটান ছিল ছোট ছেলের দিকে। ছোট ছেলের চুল বেঁকা কারও বলার সাধ্যি ছিল না। বাপের সঙ্গে মোটেই বনিবনা হতনা তার—ষোল বছর বয়সেই সে জুয়োখেলা শিখেছিল—সারাদিন পাড়ার গুণ্ডাদের সঙ্গে টো টো করে ঘুরে বেড়াত শহরময়। শাসাত মায়ের কাছে এসে—টাকা দাও নয়ত চুরি করে জেল খাটব। হু'হুবার শাশুড়ীর তোরঙ্গ ভেঙ্গে গয়না নিয়ে পালিয়েছিল সে। কর্তামশাই একবার অগ্নিমূর্তি হয়ে বললেন—ও ছেলে কুলাঙ্গার ওকে জেলে দিয়ে তবে আমি জলস্পর্শ করব। কিন্তু শাশুড়ী পাথরের মত অটল হয়ে থামিয়ে রেখেছিলেন তাঁকে। অগত্যা কর্তামশাই হাল ছেড়ে দেন। শেষে একদিন চরম সংবাদ এল ছোটদেওর কোথাকার একটা নীচজাতের ছুঁড়িকে ফুসলে বের করে নিয়ে গেছে। সেদিনকার শাশুড়ীর মুখখানা আজও জল জল করে তাঁর চোখে ভাসছে। তিনি কাঁদেন নি; কোন অভিযোগ অভিশাপ দেন নি—যেন অমোঘ বিষের ছায়ায় নীল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।…তাঁরা চলে গেছেন একে একে সবাই, ননদেরা, ঠাকুরজামাই, শাশুড়ী, কর্তামশাই। একদা শব্দমুখর বাড়ীটা নির্বাক হয়ে ঝিমোয় তদবধি—যেন এক একবার এসে দাঁড়ান সবাই অন্ধকার ছায়া থেকে বেরিয়ে তাঁর সামনে…।

স্বামীর কথা মনে পড়ে করুণাদেবীর। তিনি থাকতেন সকলের আড়ালে অগোচরে। তাঁর মধ্যে এসে যেন পরিবারটার জীবনপ্রবাহ নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। বিয়ের রাতে বাসর ঘরে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে করুণাদেবীর চোখ দিয়ে। সখিরা জিজ্ঞাসা করেছিল—কিরে কাঁদছিস্ তুই? বর পছন্দ হয়নি বুঝি?— পছন্দ? সেদিন নবপরিণীতার চোখ পড়েছিল পাশে বর বেশে মোড়া তার কালহীন মুখে। তার ললাটের কুঞ্চিত দাগে তিনি পড়েছিলেন যেন সবকিছু, যা পরে ঘটবে তার ইতিবৃত্ত। কোনদিন ভালবাসা কি হয়েছিল? কোনদিন তা ত ভাবেন নি। রাঙা টুকটুকে বর, দিদিমা বলতেন, তা কিশোরী মনকে রাঙিয়েছিল তের বছর বয়স অবধি—তারপর থেকে রুগ্ন মানুষটার সেবা, তার অকালবৃদ্ধ মুখের দিকে চেয়ে থেকে কবে নিঃশব্দ চরণে যৌবন ব্যর্থ করাঘাত করে চলে গেল তাঁর হৃদয়ের বাইরে থেকে—তিনি তা টের পাননি। হুটি সন্তান জন্মেছিল—হুটি ছেলে—নিতাই আর শান্তনু। আর অসমর্থ স্বামীর কাঁধে ঋণের বোঝা রেখে কর্তামশাই একদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

করুণাদেবী জপ করেন। অলক্ষ্যে একটা দীর্ঘনিশ্বাস কেঁপে কেঁপে

তাঁর বুকদিয়ে বেরিয়ে আসে। চক্‌চক্‌ শব্দ থেমে গেছে। সেদিকে চাইতে তাঁর ভয় করে। সেই রুগ্ন লোকটার ছায়া তাঁর চারিপাশ জড়িয়ে রয়েছে। তেমনি ধারা কপাল—অসংখ্য কোচকান দাগে ভরা—শুকনো মুখের চামড়ায় শামুকের চোখের মত বিবর্ণতা। চোখ জুড়ে অন্ধ চাউনি—ঠোঁট শব্দহীন। যেন চিরকালের স্তব্ধ বাড়ীর একাকীত্ব তার দেহটা। তার জন্মলাভের অব্যবহিত পরে যখন ছেলেকে ধাত্রী তাঁর মুখের পাশে নিয়ে আসে—তখনই যেন তিনি চিনতে পেরেছিলেন।—জন্ম থেকে জন্মান্তরে এই অভিশাপ বহন করবার জন্য তার সৃষ্টি—এই কালিমাখা বাড়ীর বুকপোড়া প্রদীপের মত সে তার জয়গান নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছে—তার রুগ্ন ইঁদুরের মত দেহটার মধ্যে একটা বিদ্রোহী হৃৎপিণ্ড যা অনন্তকাল ধরে বাঁচতে চায়—যেন এক শাশ্বত নিষ্ঠুরতায় পাতলা চামড়া ভেদ করে তার গর্জন তিনি শুনতে পান। তেমনি বাপের মত মুখ—দিনে দিনে অপরিবর্তিত হয়ে রয়েছে সেই থেকে—তেমনি শান্ত নীরব—যাতে কখনও কথা ফুটতে চায় না—যা ছায়ার মত কেবলই সরে সরে যায় সব কিছুর আলোড়ন থেকে। কেন সে জন্মাল যখন জীবনের গুরুভার বয়ে নিয়ে যাবার কাঁধ সে পায়নি? হয়ত একটি জীবনের ক্ষণবিন্দু মহাকালের মোহ—করুণাদেবী শুধু দুঃখটাই জানবেন তার মধ্য দিয়ে—তারপর এক অসীম যোজন পার হয়ে সে জীবন উত্তীর্ণ হবে স্বর্ণসম্ভূত অন্য এক জীবনের দরজায়—তা অশ্রুবাষ্পের অন্ধকার ফুঁড়ে দেখা যায় না।—

ঋণের দায়ে পৈতৃক কারবার গোটাতে হয়েছিল তাঁর স্বামীর। রুগ্ন শরীর নিয়ে সেই অন্ধকার দুর্দিনের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন পরিবারটাকে কোনমতে নিতাইয়ের বাবা। রাধাবাজারের অতবড় দোকান বিক্রী করে দিয়ে উত্তরাঞ্চলে ছোট একটা দোকান খুললেন তিনি। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি যুঝতে লাগলেন কোনও রকমে ব্যবসাটাকে দাঁড় করাবার জন্য—স্বাস্থ্য ভেঙে পড়তে লাগল উত্তরোত্তর। তৈলহীন দীপ বারেবারে উস্কে আলো জ্বালিয়ে—একদিন নিতাইকে বার বছরের ছেলে আর ওই আপন প্রতিচ্ছবিকে রেখে তিনি বিদায় নিলেন। শিয়রে দাঁড়িয়েছিলেন করুণাদেবী—ইসারায় ডেকে বললেন—চললাম গো—ভগবান তোমায় শান্তি দেবেন। আর ছেলেদের দিকে শেষ দৃষ্টি রেখে বলেছিলেন—ওরা যেন বেঁচে থাকে।—

অর্ধ শতাব্দী ধরে অতীতের দুর্বহ তাপগুলিকে করুণাদেবী ধরে আছেন

ভিতরে। বেঁচে থেকেছে তারা আর বেঁচে আছেন তিনি। আশা ছিল বড় ছেলে নিতাইয়ের জীবনে সৌভাগ্যের উদয় হবে। এটা প্রায় তিনি বিশ্বাস করতে শিখেছিলেন, তার মধ্য দিয়ে ফিরে পাবেন অনেক কিছু যা তাঁর জীবনে হারিয়েছে বা কোন দিন যার সমাগম তিনি দেখেন নি। কিন্তু এমন যোগ্য ছেলের কপালে সুখ বুঝি দাঁড়ায় না। আপনি পছন্দ করে বউ এনেছিল নিতাই, সুন্দরী, একটা পাশকরা বউ। বউয়ের সঙ্গে বনিবনাও ছিল প্রচুর—কিন্তু কি যেন বুঝে উঠতেন না তিনি। বউয়ের জন্যে পাগলের মত ছুটোছুটি করে বেড়াত নিতাই। সন্ধ্যে হলে ঠোঙ্গায় করে ফুলুরী তেলে ভাজা একছড়া দোপাটির হার আরও কত কি প্রত্যহ নিয়ে বাড়ী ঢুকত নিতাই। বছর ঘুরতে না ঘুরতে পৈতৃক ব্যবসার মূলধন ভেঙে সাড়ী গয়নায় ভরে উঠল বউয়ের তোরঙ্গ। কিন্তু এ সবেও তার মন উঠত না। সারাদিন কেবলই ফোঁস ফোঁস করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলত—নিতাইকে দেখলেই যেন ভূত দেখার মত চমকে উঠত। রাত্রে কাণ পেতে শুনতেন তিনি—একপক্ষের চাপা ক্রুদ্ধস্বর অনেক রাত অবধি তর্কে বিতর্কে বয়ে চলেছে—অন্য পক্ষে নিতাই প্রহৃত কুকুরের মত অনুনয় বিনয় করে সে রাগ থামাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু সব কিছুই বিফল হল—বউ একদিন বাপের বাড়ি ফিরে গিয়ে আর ফিরতে নারাজ হয়েছিল—বলেছিল—বাবা আমায় জেনেশুনে একটা হনুমানের হাতে তুলে দিয়েছেন। আর সে ফেরেনি। অনেক দিন পরে করুণাদেবী জানতে পারেন বউএর নামডাকে দেশ ছেয়ে গেছে—এমন অভিনেত্রী নাকি বাংলাদেশে কখনো ছবির পর্দায় দেখা যায় নি—ছিঃ ছিঃ। এ বাড়ীর বউ শেষে সিনেমাউলী—ধিক্কারে সারা দিন রাত্রি যেন বিষ ভরে উঠেছিল তাঁর।

তবুও মানুষ ওই নিতাই। বউ চলে যাবার পরে নিতাই কিছুকাল মুহ্যমান হয়ে কাটাল। পুনরায় বিয়ের জন্য ধরলেন করুণাদেবী। কিন্তু নিতাই অটল—ও মেয়েমানুষের জাত ওঁছা, সে বলত। প্রাণ থাকতে আর সে বিয়ে করবে না। বিয়ে করবে না? তাই আবার হবে নাকি?—ভাবতেন তিনি। মেয়েমানুষ ছাড়া থাকবে কি করে? এ বাড়ীর কর্তাদের দেখেছিলেন, নিজের বাপের বাড়ীর তাদেরও দেখেছেন। একটা গোটা মেয়েমানুষ পেয়েও বাবুদের কুলোয়নি কোনদিন। একটু আধটু বারদোষ না থাকলে পুরুষ মানুষদের মানায় না—বলতেন শাশুড়ী। তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী চোখ মেলে

মাঝে মাঝে খুঁজতেন তিনি নিতাইয়ের মুখ—তার গোলমত ভারী মুখের আশে পাশে। ছেলের মনের ভাব দেখে মনে হয় যেন—বউ পালানোর ধাক্কাটা মোটেই তাকে ধরাশায়ী করেনি। বরং আজকাল একটু বেশী ফূর্তিবাজ মনে হয় তাকে। কোন প্রসঙ্গেই বউয়ের কথা পাড়ে না নিতাই—একবার কেবল দোকানের টাকাকড়ির বিলি ব্যবস্থার আলোচনা হতে হতে হঠাৎ বলে উঠেছিল—মাগো, আস্ত গাধা না হলে আমি কখনো কারবারের টাকা থেকে মাগীর শাড়ী গয়না কিনেছিলাম! প্যাঁজ পয়জার দুই হ'ল—মাঝখান থেকে শাড়ী গয়নাগুলো নিয়ে মাগী সটকালো। করুণাদেবী আশ্বস্ত হন। ছেলেটার হৃদয় কড়া পাকের ভাঁটা—সহজে টোল খায় না।—দোকানটাকে আবার দেহমনের সমস্ত শক্তি দিয়ে দাঁড় করাতে লেগে গেছল নিতাই। দোকান ওর প্রাণ—প্রত্যেকটি পাই পয়সা হিসেব করে খরচ করে নিতাই দোকানের তহবিল বাড়াবার জন্যে। কখনো বাড়ী ফিরে মাতা পুত্রে আলোচনা হয়—আজকের লেনদেন কেমন হল। আশা নিরাশা সুখ সম্ভাবনায় নিতাইয়ের সঙ্গে দোলা খায় তাঁর মন।—বুঝলে মা। আজ বসে আছি—খদ্দের নেই, খদ্দের নেই—ভাবলাম ঈশ্বর দগ্ধে মারবার জন্যে খোলা চাপিয়ে কেবলই কাঠি নাড়ছেন আমাকে লক্ষ্য করে। কেবল যত যত কুস্তীর প্যাঁচ এই আমার রোগা শরীটার ওপরেই। কেবল হা-পিত্যেশে রাস্তার পানে চেয়ে থাকা—এমন সময় ঘ্যাঁচ করে একটা মটর এসে থামল দোকানের সামনে। বাপরে কি গাড়ী! দেখলে তোমার পিলে চমকে যেত। আর নামল সাক্ষাৎ রাজপুরুষ। ভাবলাম, যাহোক করে বিধাতা বুঝি মুখ তুললেন—তিনদিনের রোজগার এক দাঁওয়ে কপালে জুটেছে।—কিন্তু ওমা, অত দরদস্তর করে শেষটায় একটা ছাতাপড়া চিনেমাটির সেট কিনে নিয়ে গিয়ে গাড়ীতে চেপে বসল! যত বাইরে ভড়ং বুঝলে কিনা—ভেতরে তত শাঁস থাকে না। বাইরেটা দেখে কক্ষনো ভুলতে নেই। করুণাদেবী মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন ছেলের মুখের দিকে। এমনি প্রায়ই—কিন্তু পয়সার বেলায় বড় চামার নিতাই। বাড়ীর ধারা যেন একটুও ওর মধ্যে নেই। সংসার খরচ যথাসাধ্য স্বল্পে হয়। ছোট ছেলে শান্তর মাইনে চুরাশীটা টাকা—সত্তর টাকা তার থেকে কেড়ে নেয় নিতাই। কোন দিন প্রতিবাদ করতে সাহস করে না সে—আর ওই ভীরু দুর্বল লোক কি বা বলতে পারে! কোনদিন টুঁশব্দটি করলে ফেটে পড়ে নিতাই—শালা উল্লুক—কার দৌলতে করে খাচ্ছ জান

না। ঘাড় ধরে বের করে দেব রাস্তায়—না খেতে পেয়ে কুকুরের মত ঘুরে ঘুরে মরবে। আরও গালাগালি দেয়—মুখখাস্তা করে—নিতাইয়ের মুখ বড় খারাপ। করুণাদেবী প্রতিবাদ করতে সাহস করেন না। তাঁরও ভয় করে কখন কখন নিতাইকে। টাকাকড়ির প্রসঙ্গে সে যেন তার মানুষের খোলসটা ছেড়ে এক মুহূর্তে ভয়াবহ চেহারায় বেরিয়ে আসে। অনেক দিন তাঁর মনে হয়েছে—নিতাই কেমন অদ্ভুত ভাবে একদৃষ্টে চাইছে তাঁর দিকে। সে দৃষ্টি দেখলে বুকের মধ্যে কেমন হিম হয়ে আসে। কথায় কথায় একদিন নিতাই জানতে চেয়েছিল—ছোট পিসীর জন্যে যে গয়না গড়ান হয়েছিল তার রসিদ একদিন মায়ের ঘরের দোরগোড়ায় পড়ে থাকতে সে দেখেছিল—গয়নাগুলো কোথায়?—আরেকদিন সন্ধ্যার আবছায়ায় স্নান করে করুণাদেবী উপরে উঠে আসছিলেন সিঁড়ি দিয়ে—তাঁর মনে হয়েছিল কে যেন ঘর থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসে পাশ দিয়ে নেমে গেল। এত আচমকা সে ছুটে পালাল যে তিনি ঠাহর করবার সময়ও পাননি সেদিন। ঘরে ঢুকে যা দেখেছিলেন—তাতে তাঁর সন্দেহ গভীরতর হয়। তাঁর তোরঙ্গ কেউ চাবি দিয়ে খুলবার চেষ্টা করছিল যেন।—একটু পরেই নিতাই উঠে আসে উপরের ঘরে যখন তিনি জপ করবার জন্যে আসনখানা টেনে বিছোচ্ছিলেন—তার মুখের দিকে তাকাতে সাহস হয়নি সেদিন। কিন্তু এর পর থেকে সাবধান হয়ে থাকতেন তিনি। ছোট ননদের গয়না শাশুড়ী তাঁর হাতে সঁপে দিয়ে অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। বলেছিলেন—এইটুকু তোমার একান্ত বিপদে সম্বল জেন।—কখনো হাত ছাড়া ক'রনা। অনেক দিন তারপর গড়িয়ে গেছে। জীবনটাকে বইতে বইতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তিনি। কোথাও কি শান্তি মেলে না?

জানালার নীচে বিছানা করে শান্তনু শুয়ে পড়েছে। ঘুমোলে তাকে দেখায় অদ্ভুত—যেন কতকালের পুরোনো এক জনহীন পথের ছবি অকারণে মনে পড়ে। সে পথের শেষ নেই। পঞ্চমীর চাঁদ ঢলে রয়েছে পূর্বদিকে—খোলা জানালার কবাট দিয়ে একফালি জ্যোৎস্না এসে পড়েছে তার নিদ্রিত মুখের উপরে। করুণাদেবী সেদিকটায় চেয়ে আস্তে আস্তে উঠে পড়েন জপ শেষ করে। অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন কিছুক্ষণ তিনি। সব কাজ সারা হয়ে গেছে। ছোট পরিবারের খুঁটিনাটি নিয়ে কেটে যায় দিনের বেলা কোন গতিকে। রাতের এই অসীম প্রহর যেন কাটতে চায় না।

ভাবেন, ভগবানের নামের মধ্যে তাঁর ইহকালের দিনগুলো যদি ক্ষয় হয়ে যায়। কিন্তু তা হয় না—একের পিঠে অন্যদিন চিরপ্রবাহের মত ফিরে এসে দাঁড়ায় তাঁকে জাগিয়ে রেখে। অতীত যেন প্রেতের মত সব সময় দাঁড়িয়ে আছে পাশে। চোখ বুজলেই ত ঠোঁট দুটো অহোরাত্র বীজমন্ত্র জপে চলে—মনের মধ্যে কারা এসে ভীড় করে দাঁড়ায়—তারা কথা বলে তিনি শোনেন। নিজেও মনে মনে জবাব দেন। কখনো এই কথোপকথনে নিজেই তন্ময় হয়ে যান, যেন সত্যিই আবার বালিকা বেশে নিজেকে দেখতে পান কত লোকের মধ্যে—হাসির অভিমানের কত কথার টুকরো মনের মধ্যে ঝরে পড়তে থাকে আলোর কণার মত। হঠাৎ চমকে ওঠেন। কি ভ্রম! তারা কেউ নেই। দু'পাশে দাঁড়িয়ে দেয়ালগুলো। কত বছরের কালি পড়েছে চূণকাম খসা গায়ে, স্থির জীবনহীন কঙ্কালের মত দেওয়ালগুলো।

রাত বেড়েছে, হয়ত এখনি আসবে নিতাই। করুণাদেবী উৎসুক হয়ে কান পেতে থাকেন। কোন কোন দিন তার ফিরতে অনেক রাত হয়। সেদিন অস্থির হয়ে ওঠেন তিনি। বারে বারে দরজার কাছে গিয়ে কান পাতেন, নিতাইয়ের পায়ের আওয়াজ আসে কিনা। ভারী জুতোর মস্-মস্ আওয়াজ—অন্ধকার গলিতে দূর থেকে এগিয়ে এলে টের পাওয়া যায়। আবার ফিরে যান দোতলার ঘরে। একপাশে ঘুমোয় শান্তনু। শ্রান্ত জীবের মত তার নিঃশ্বাস জোরে উঠে একটু থেমে আবার পড়ে। তার একটু ফাঁক হয়ে থাকা ঠোঁটের দিকে কখনো একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন তিনি। তাঁর সন্দেহ হয়। আরও অপরিচিত আরও দূরের একাকীত্ব তার ঘুমন্ত দেহকে ঘিরে রাখে। তাঁর আপনার নিঃসঙ্গতা আরও ফুটে ওঠে তার দিকে চেয়ে। কে এ? যার অতীত ভবিষ্যৎ দুটোই মুছে গিয়ে শুধু পীড়াদায়ক বর্ত্তমান যে জেগে আছে—বানের বুকে ভেসে থাকা কুঁড়ে ঘরের চালের মত!

বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হয়। করুণাদেবী তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নেমে যান দরজা খুলে দিতে। নিতাই ভিতরে ঢুকলে দরজার ভিতর থেকে তালা লাগিয়ে ফিরে আসেন তিনি। অকারণে মনটা ব্যস্ত হয়ে ওঠে। সারাদিন চুপ করে থাকার জড়তা ঠেলে মনের মধ্যে হঠাৎ সরব হয়ে ওঠে অনেক কিছু, অনেক কিছু জোরে জোরে কথা বলে ওঠে, কাণের পর্দায় শব্দজগৎ এসে হঠাৎ ঘা মারে।

নিতাই কলতলায় গেলে রান্নাঘরে ঢুকে খাবার বাড়েন করুণাদেবী।

আসন পেতে অপেক্ষা করেন থালার উপরে হাতটা আলগাভাবে মেলে ধরে। নিতাই এসে খেতে বসে। করুণাদেবী উৎসুক হয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকেন তার মুখের দিকে। কিন্তু নিতাই অন্যমনস্ক হয়ে থাকে যেন। তাঁর বুক দমে যায়। হয়ত আজকে কোন কথাবার্তাই হবে না। প্রায়ই এমনি হয়। নিতাইয়ের মন পড়ে থাকে দোকানে। সারাদিন কেনাবেচা করে বাড়ী-ফিরে সে যেন আবার মনে মনে প্রত্যেকটা খদ্দেরের মুখ জড়ো করে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

—কিরে, ডালটা ছুঁলি নে যে? তাঁর উৎকণ্ঠা স্পষ্ট ফুটে ওঠে নিতাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে।

—কি আবার হবে! হলে ত বাঁচি। একটা লড়াই টড়াই শালার বেধে গেলে তবু দু চার পয়সা বিক্রি হয়। দিনভোর বসে থেকে একটা খদ্দেরের দেখা নেই। ভাবি যত সব ল্যাটা চুকিয়ে দিয়ে একদিন ফেরার হব।

—অত ভাবিস নি। যা করবার তিনি করবেন। আর অত ভাবনা কিসের! পৈত্রিক ভিটে রয়েছে যাহোক করে— বলে একটা পুরোনো কথা পাড়বার জন্যে মুখ খুলতেই নিতাই খেঁকিয়ে ওঠে—তিনি কাঁচকলা করবেন। এই তাকাও—বলে ঝোলমাখা একটা বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলে—অষ্টরম্ভা ভাগ্যে আছে। বাপ পিতেম মাল খেয়ে নবাবী উড়িয়ে পথে বসিয়ে গেলেন—এখন বাকী শুধু ভিটেটা উজোড় হয়ে ফেরারী কুকুর বনা।

এসব শুনতে তিনি অভ্যস্ত। নিত্য নৈমিত্তিক বাপ পিতামহের মুণ্ডপাত করে তবে নিতাই জলগ্রহণ করে। যেন ওর সব দুর্ভাগ্যের মূলে কর্তামশাইয়ের বা তার পিতার ইচ্ছাকৃত কারসাজি রয়েছে।

তবুও ছেলে ওই নিতাই—তাকাতে বুক ভরে ওঠে করুণাদেবীর—সারাদিনের অন্ধকার টুটে যেন একটু আলো উঁকি দেয় অঙ্গনে।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিয়ের কথাটা পাড়বার চেষ্টা করেন তিনি।

তিনি উৎসুক চোখ মেলে থাকেন তার মুখের কোন কথা আসছে কুড়িয়ে নিতে।

অবশেষে তাঁর প্রতীক্ষা সার্থক হয়। নিতাই বলে—

—বুঝলে মা, একটা কিছু ঘটবেই—কি বল? মুখ তুলে চায় সে।

করুণাদেবী ঠিক ধরতে না পেরে একটু সরলভাবে জিজ্ঞাসা করেন—কি ঘটাতে চাস্ আবার?

—এই যা' হোক কিছু একটা। লড়াই হাঙ্গামা, রাষ্ট্রবিপ্লব, জাপানীদের বোমাবর্ষণ—যা হোক কিছু একটা, বাজারটাকে এলোমেলো করে দেবে এমন কিছু—কি বল!

—বালাই ষাট! ওসব শত্তুরের ঘটুক তো! আমাদের নিরপরাধ লোকদের ওসব কেন হবে!

ছেলের শুভ কামনায় অশান্তিতে ভরে ওঠে তাঁর মন।

—বলে মেয়েছেলের বুদ্ধিতে চলতে নেই কখন—বলি বুঝলে কি ছাই! বাজারটা কেমন হয়ে আছে তা জানো?

করুণাদেবী আরো বিমূঢ় হয়ে তাকান জবাব না দিতে পেরে।

—বাজার একটা মস্ত ক্ষীরের নদী 'দ' মেরে টকে গেছে একদম, বুঝলে? এখন চাই প্রবল বন্যা।

বলে একটা হাত ঘুরিয়ে কাল্পনিক বৃত্ত টেনে নিতাই শহরের সীমাটাকে উদ্দেশ্য করে যেন বলে—পয়সা হয়ে পড়েছেন ঠুঁটো জগন্নাথ—হয় খদ্দের নয় মহাজনের ট্যাঁকে বসে আছেন গ্যাঁট হয়ে, সেখান থেকে আর বেরিয়ে দুপা হেঁটে আমার তোমার উদ্ধার করবেন ভেবেছো—কখ্‌খনো তা হবেনা বলে দিচ্ছি। ও যাকেই ভোট দাও আর মানত করো কিছুতেই কিসৃসু হবে না। যুগটাই অধর্মের। তাই বলছিলাম একটা বড় সড় কিছু যদি ঘটে—

—হ্যাঁ তাই যত অনাছিষ্টি তাই ঘটুক আর কি—তোর যেমন কথা, কেন মন দিয়ে ব্যবসা করছিস—একদিন না একদিন ফল ফলবেই। দেখিস ঠাকুর আছেন শিয়রে জেগে। বলেই সন্ত্রস্ত হয়ে তাকান তিনি ছেলের মুখের দিকে। নিতাই কটমট করে তাকায়। এক মুহূর্ত একটা কঠিন শব্দ যেন ঝুলে থাকে তার ঠোঁট থেকে। কিন্তু সে কিছু বলেনা? হঠাৎ মনে হয় চোখটা তার মোলায়েম হয়ে অনেক দূরে কিছু দেখার চেষ্টা করে।

—ফল একদিন ফলবে। তা আমি জানি, সেই জন্যেই ত দম ধরে বসে থাকি দোকানে সারাদিন। কিন্তু দেখ মা কি হবে তা ত আজও জানতে পারলাম না। তবে একদিন কপাল খুলবেই—ধর যদি মালগুলোর কেনাদর একদিন হু-হু করে পড়ে যায়—

—বা কপালগুণে তুই এমন কিছুর হদিস পাস্ যা আর কেউ জানেনা।

—বা ধর মহাজন এই ধারে আমায় হাজার বিশেকের মাল বিশ্বেস করে ছেড়ে—

—তখন তোর দোকান অষ্টপহর খদ্দেরের আনাগোনা রোখে কে।

—তখন টাকায় দু-পয়সা লাভ পেলেও ছেড়ে দিই সব ঝেঁটিয়ে।

—তোর অভাব দুদিনে ঘুচে যাবে।

—আমি কি আর ওই এক টুকরো দোকান আঁকড়ে বসে থাকব। দেখো আবার ফিরে যাবে রাধাবাজারে নিতাই—

—আহা তাই যেন করেন ঠাকুর, তাইত দিনরাত কামনা করি। করুণাদেবী সম্ভাব্য সৌভাগ্যের আশায় ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করেন কপালে দুহাত ঠেকিয়ে। হঠাৎ নিতাই গুম হয়ে যায়। একটু চুপ করে থেকে বলে—হ্যাঁগো সে ফিরেছে ?

একটা অপ্রসন্নতার ছায়া নেমে আসে যেন উভয়ের চিন্তাকে ঢেকে।

—হ্যাঁ, ফিরেছে কোন কালে।

আর কোন কথা মনে আসেনা কারও। নিতাই উঠে হাত মুখ ধুয়ে ঘরে গিয়ে দরজা এঁটে দেয়। করুণাদেবী আলো নিভিয়ে শিকল তুলে উঠতে থাকেন সিঁড়ি বেয়ে। তাঁর ঘেঁসটানো পায়ের শব্দ একটু একটু করে উঠে যায় উপরের দিকে। পূর্ণচ্ছেদের মত এতদিনের শেষ প্রহরে পর্দা টেনে দেয়।

তিন

একটা দুঃস্বপ্ন আঁচড়াচ্ছিল তার বুকের হাড়গুলোর তলায়। অন্ধকার ফুসফুসের দেয়ালের ভিতর ঘুণের মত কুরে কুরে অল্প অল্প করে পথ করছিল; সরু সরু শিরাগুলোর জটিল পাকের মধ্যে রক্তের প্রবাহ হঠাৎ থেমে থাকছিল, শ্বাসরোধ হয়ে আসছিল তখন। আবার হৃৎপিণ্ড ঠেলে দিচ্ছিল আতঙ্কিত রক্তকণাগুলো ধমনীতে ধমনীতে। প্রয়াসের তীব্রতায় মেরুদণ্ডের গ্রন্থিগুলো খুলে আসতে চাইছিল। বন্ধ চোখের পাতার নীচে কারা তার শরীরের প্রত্যঙ্গগুলো নিয়ে উন্মত্তের মত টানাটানি করছিল। হঠাৎ বিস্ফারিত চোখ মেলে সে জেগে উঠল।—দিন। শরীরের ঝিল্লীগুলো তখনও কাঁপছিল, গায়ে রোম সারি সারি বাঁকা হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। সকালের কড়া রোদ জানালা দিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়েছে মাথার কাছে। তার স্থির প্রখর উজ্জ্বলতার দিকে চেয়ে চোখ ঝলসে গেল তার, দুঃস্বপ্নটা ছুটে পিছিয়ে গেল মনের অন্ধকার বয়ে অন্ধকারে। এক এক করে অসাড় হয়ে থাকা মনে প্রত্যহের অভ্যাস-গুলো এসে দাঁড়ায়, জেলখানার দরজা খোলে। সে বিহ্বল ভাবে চেয়ে দেখে আরেকটা দিনের দিকে।

দরজার অন্য দিক থেকে পায়ের শব্দ আর তার মায়ের অপ্রসন্ন গলা ছাদের উপর দিয়ে একসঙ্গে এগিয়ে এল—কি উঠবিনে? রোজ রোজ দেরী করে আপিসে গেলে ক'দিন কাজ থাকবে তোর? রায়বাবুর সঙ্গে নিতাইয়ের দেখা হয়েছিল—তিনি খুব বিরক্ত হয়েছেন তোর কাজে-কর্মে। নেহাৎ নিতায়ের খাতিরে রেখেছেন—কাজ গেলে দাঁড়াবি কোথায়? ছিঃ!

শান্তনু ধড়মড় করে উঠে বসল। করুণাদেবীর অপ্রসন্ন মুখের থেকে তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিয়ে ভাববার চেষ্টা করল। কিছু মনে পড়ে না, কেবল দুঃস্বপ্নটা মুছে একটা অনিশ্চিত ভাব মনে ঘিরে থাকে। সত্যি অনেক বেলা হয়ে গেছে। হয়ত আপিসে পৌছতে আজও লেট হবে। পর পর ক'দিন থেকে কেবলই লেট হচ্ছে, কেন সে জানে না। ঘুমের

ভিতরে কেন একটা স্বপ্ন এসে দাঁড়ায়—তার দেহটাকে মুঠোয় ধরে টেনে নিয়ে যায় আতঙ্কের একটা খাদে, যখন জেগে ওঠে, আরেক দিন তাকে তাড়া করে নিয়ে চলে। কেবলই পিছিয়ে পড়ে থাকে সে। কেন তার শক্তিতে কুলোয় না এদের মুখোমুখি দাঁড়াবার, সে প্রকাশ করতে পারে না। আমতা আমতা করে—বলে আজকে দেরী হবে না, আমি এক্ষুনি স্নান সেরে নিচ্ছি।—

—ক'টা বেজেছে খেয়াল আছে? বেলা নটায় ঘুম থেকে ওঠা লাট বেলাটের মানায়, রোজগার ক'রে যারা খায় তাদের নয়। বুঝবার ক্ষমতা নেই একটুও —বলতে বলতে করুণাদেবী বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। শান্তনু তাড়াতাড়ি উঠে নীচে নেমে এল।

কলতলায় বাসনের কাঁড়ি নিয়ে মাজতে বসেছিল সৈরীর মা। শান্তনু এসে দাঁড়াতেই হঠাৎ অনর্গল কথার মোড় ঘুরিয়ে সে মুখ তুলে চাইল তার দিকে। তারপর আবার হাঁড়ি মাজতে মাজতে একনাগড়ে বলে চলল—আর বলি হ্যাঁ গো ছোটছেলে, রোজ রোজ এমনি দেরি করে ওঠ কেন বল দিকি? ছিঃ! বেটাছেলে, কোথায় উয্যুগী হয়ে নিজের উন্নতি করবে, না কেবল পড়ে পড়ে ঘুমোও—। বৌদিদির মনে আর কষ্ট দিও না। যা-হোক বয়স হয়েছে—কোথায় তোমাদের সেবা পাবে, তীর্থধম্ম করবে, না তোমাদের হাঁড়ি ঠেলে মরচে। কেন একটা বিয়ে কর না?

রান্নাঘর থেকে রুক্ষ গলায় করুণাদেবী বলে উঠলেন—তুই থাম ত দেখি সৈরীর মা! বিয়ে করতে কাকে বলচিস্ সোর নেই!

সৈরীর মা হাঁড়িতে হাত থামিয়ে রেখে রান্নাঘরের দরজার দিকে মুখ তুলে বলল—কেন বলত দিদি—ছোটছেলের বিয়ে দেবে না? কেন, বেটাছেলে, রোজগার করে চার কুড়ি টাকা, বিয়ে দেবে না এ কেমন কথা!

অন্যদিক থেকে প্রত্যুত্তর এল না, কেবল একটা ভারী বাসন জোরে নামাবার শব্দ শোনা গেল। সৈরীর মা আপন মনে বকে যেতে লাগল—বলে কিনা পুরুষছেলে কত ভাগ্যিতে পেটে ধরে—তা আমরা গরীব মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ অতশত বুঝিনে বাপু—খাটিখুটি দিন আনি দিন খাই, তোমাদের কথার মাথায় কে মাথাঘামায় বলত দেখি?—একটু থেমে যেন কিছু ফিরে মনে পড়ায় আবার বলল—তাও যদি দশবিশটা ছেলে হত!—

—তুই থাম!—ক্রুদ্ধ গলা শোনা গেল করুণাদেবীর।

শান্তনু চমকে তাকায় রান্নাঘরের দরজার দিকে। সে বুঝতে পারছিল না, তাকে কেন্দ্র করে এসব কথাগুলোর মর্ম।

অফিসে বেরোতে হবে। কুলঙ্গীতে বহুকালের পুরানো গীর্জার মত চূড়ো দেওয়া একটা ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেছে কতকাল তা জানা নেই। সামনের ডালাটা পিতলের, উপর কারুকার্য করা—কাচের গায় ধুলো পড়ে পড়ে সময়ের সংখ্যা-গুলো ঝাপসা দেখায়। ঘড়ির কাঁটা থেমে গেছে একটা ঘরে পৌঁছে—তার যতদিন স্মরণ হয় অন্য কোন ঘরে কাঁটা দুটোকে সরতে দেখেনি। আলনা থেকে জামা পেড়ে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে দেখে। কাঁধের কাছে ছেঁড়া অল্প একটু বেড়েছে মনে হল। মেরামত করতে হবে। সাবধানে সেটা মাথায় গলিয়ে সে এসে দাঁড়াল দেয়ালে ঝোলান আয়নার সামনে। চিরুণি দিয়ে চুলগুলো পাট করতে করতে আয়নার ছবির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দেখে সে। জায়গায় জায়গায় পারা মুছে গিয়ে গোল গোল হলদে ছোপ পড়েছিল। তার মুখের প্রতিবিম্বের নানা অংশে সেগুলো ফুটে ওঠে। তার সেই মুখচ্ছবিতে যেন সে একজন অন্তরের সঙ্গীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে—মনে হয় সেই প্রতিমূর্তি ঝাপসা আয়নার কাচের ভিতর দিয়ে তার হৃদয়ের দিকে চাইছে—তার মর্মকথা প্রতি বুকের আওয়াজে টের পাচ্ছে। তারা দুজন এই দুঃসহ পৃথিবীর পথ হাঁটতে হাঁটতে চেয়ে থেকেছে কতকাল—সে জানে না। একজন আরেকজনের দিকে নির্বাক চেয়ে দেখেছে—কখনও চোখের দিকে, কখনও চোখের অন্তরালে। শৈশবে সে ওকে চিনত। এক অজ্ঞাত বোধ তাকে জানিয়েছিল তার শিশুকালেও—কান্না পেলে কাঁদতে নেই, অভিমান করতে নেই। জ্বরে ভুগে ভুগে দেহটা যখন পাণ্ডুর হয়ে ক্ষীণ হয়ে পড়ত—তার মুখের তুলনায় চোখ দুটো মনে হত বড় বেশী বড়। দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আয়নার দিকে চেয়ে চেয়ে সে আপনাকে ভোলাতো—কি খাবে তুমি—সন্দেশ, বিস্কুট—আর কি—আর কি? আর খই—আর দুধসাবু—এখানে সে চোখ বুঁজে চুপ করে থাকত—মুখে অনির্বচনীয় উপভোগের একটা মৃদু হাসি ছড়িয়ে থাকত। তা তার ক্ষুদ্র মনের দুঃখ গ্লানির অন্যপারে কোন গভীর স্বপ্নরাজ্যে পাওয়া—যা কেবল শিশুরাই জানতে পারে। তারপর সে বড় হয়েছিল—সঙ্গে সঙ্গে সেই আয়না থেকে চাওয়া অস্পষ্ট মুখ বড় হয়েছে, অনেক বড়—আর যেন অন্তরের মধ্যে কুলিয়ে রাখা যায় না তাকে। তাদের পরিচয় হয়েছিল নিবিড়—চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হয় তার—সেই দ্বিপ্রহরে দেখা মেয়েটির চোখে যে আলো সে দেখেছিল যেন তারই প্রভাস ওর চোখে।

আপিসের দরজায় এসে তার বুক দমে যায়। দূর থেকে দেয়ালের শেষপ্রান্তে টাঙানো ঘড়ির দিকে সে তাকায়—কাঁটা দশটার ঘরে এখনও পৌঁছয়নি। না, আজ দেরী হয়নি তার। কিন্তু কি কারণে সে বুঝতে পারে না, আর বিশ্বাস হয় না। তার দেরী সত্যিই হয়ে গেছে হয়ত। নাকি অপিসের সময় আগাম হয়ে গেছে--সে জানতে পারেনি। টেবিলগুলোর সামনে কয়েকটা মাথা ঝুঁকে রয়েছে। আপিস শুরু হয়েছে তার আসার অনেক আগে। সবাই কাজে মগ্ন—টাইপরাইটার অবিশ্রান্ত বেজে চলেছে—পাখাগুলো ঘুরছে—পাক খেয়ে খেয়ে—ঘড়ঘড়—ঘড়ঘড়—একটানা শব্দ। সব অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলেছে--নিরবধি কাল থেকে হয়ত। সে এসে পড়েছে বাইরে থেকে --একটা ব্যতিক্রমের মত। ভয়ে ভয়ে অপ্রতিভ চোখ মেলে সে ঘরে ঢোকে। রায়বাবুর টেবিলের দিকে তাকাতে সাহস হয় না তার। চোখোচোখি হ'লে সে আর চোখ ফেরাতে পারবে না, এগিয়ে যেতে হবে, তার সমস্ত মন না না করবে যখন—তবু। সে শুনবে—সে যোগ্য নয়। এ আপিসে তার ঠাঁই স্রোতের মুখে পিছল পাথরে পা রাখার মত--তার পা দুটো অসাড়, কোনও ক্রমেও এক কণা শক্তি সে পায় না পা তুলবার—পেরিয়ে যেতে এই সামান্য দূরত্বটুকু। সে সন্তর্পণে এসে টেবিলে বসে পড়ল। মোমবাতিটা জ্বালাতেই যেন নিষ্কৃতি পায়, কাঁপা শিখায় চারিপাশ অন্ধকার দেখায়। একরাশ চিঠি পার্শেল নামিয়ে রেখে গেল বেয়ারা। সে একটা একটা করে চিঠি খুলে দেখে দেখে খামে ঠিকানা টুকতে লাগল। তারপর টিকিট সেঁটে সেগুলো সরিয়ে রাখে একপাশে। পার্শেল গালা দিয়ে সীল করে। আস্তে আস্তে সে ভুলে যায় সাময়িকতাকে, মিশে থাকে টেবিলের সঙ্গে। মোমবাতির আলো জ্বলজ্বল করছিল, অসাবধানে ফেলা একটা গালার বড় ফোটার গায় শিখা কাঁপে। সেটার দিকে চেয়ে ছিল সে। চাইতে চাইতে বিচ্ছিন্ন কয়েকটা ছবির আঁচড় ফুটে ওঠে মনের পর্দায়। একটা মুখ, নিভৃত, সংগোপন। তার মন উৎসুক হয়ে তাকায়। চুপি চুপি যেন সে বেরিয়ে যেতে পারে দৃষ্টিগুলোকে ফাঁকি দিয়ে। অন্ধকার দেয়ালের বাইরে রোদ ঝরছে। একটা বড় রাস্তা নির্জন হয়ে বিছিয়ে থাকে। সে একা একা এসে দাঁড়ায় ফুটপাথে। রোদের দাহস্রোত প্রবেশ করে দেহে। ব্যাপ্ত হয়ে যায় আগাগোড়া। সে অপেক্ষা করে—টের পায়না সময়ের প্রবহতা। তার চোখ চেয়ে থাকে উদ্বেগহীন প্রত্যাশায়। সে চমকে ওঠে। সে চেয়ে ছিল হাতে তুলে ধরা একটা খামের দিকে।

কতক্ষণ তার মনে পড়ে না। পুতুলের মত তার হাত তোলা—রেখাগুলো মুছে গেছে। সে চমকে বিহ্বল ভাবে তাকায়। সে কি ঘুমিয়ে পড়েছিল? আতঙ্কে মুখ তুলে তাকায় দূরে টেবিলটার দিকে—রায়বাবুর চোখ দেখতে পাওয়া যায় না—আলো পড়ে চকচক করছিল চশমার কাচ দুটো। তাঁর চোখ হয়ত চেয়ে দেখছিল সর্বক্ষণ, হাতে করে চিঠি তুলে ধরে থাকার নিষ্ফল নিরর্থকতা। পূর্বাপর সব ছবিগুলো তালগোল পাকিয়ে যায়। মনে পড়ে গত রাত্রের দুঃস্বপ্নটা। ঘুমের ঘোরেও এই মুহূর্তের মত সে চমকে জেগে উঠেছিল। একটা অসীম রাত তার চোখে ভেসে ওঠে। তার মনে হয় কেউ যেন তার হাত ধরেছিল। আর টেনে নিয়ে চলেছিল তাকে কোথায়। কিন্তু যে ধরেছিল তাকে সে দেখতে পারে নি। শুধু হাতটা—আর তার শীর্ণ কব্জির উপর একটা অসম্ভব কঠিন চাপ। সে প্রাণপণে চেয়েছিল হাতটা ছাড়িয়ে নিতে। কিন্তু শক্ত লোহার বেড়ির মত তা ধরেছিল কব্জিটা। ক্রমাগত দূর থেকে দূরে, জনহীন পথের মধ্য দিয়ে টেনে নিয়ে চলেছিল তাকে। সে কখনো ছাড়াবার চেষ্টা করলেই অমনি তার কব্জি পিষে দিচ্ছিল হাতখানা, যন্ত্রণায় সে বাধ্যভাবে অনুসরণ করছিল তাকে। কিন্তু সে কথা বলছিল। আশ্চর্য মনে হয় তার—দিবালোকে তার কথা কখনো ফুটে উঠতে পায় না। কিন্তু সেই হাতখানাকে উদ্দেশ্য করে সে অনর্গল কথা বলে চলেছিল। বলছিল তার নির্বোধ ভয় পাওয়া থমকানো গলায় নয়—একটা গভীর আত্মবিশ্বাস সে কোথা থেকে খুঁজে পেয়েছিলো, যেমন হঠাৎ সুখের বা দুঃখের চরমতম মুহূর্তে কেউ কথা বলে ওঠে। সেই হাতের পেষণে তার কাঁধ অবধি নীল হয়ে গিয়েছিল, তবু দাঁতে দাঁত চেপে সমস্ত যন্ত্রণাকে সম্বরণ করে অত্যন্ত ধীর লঘু গলায় বলে যাচ্ছিল কথাগুলো। আর আশ্চর্য, সবটাই তার মুক্তির কথা। সে কখনও প্রশ্ন করছিল হাতটার দিকে চেয়ে, আবার নিজেই তার উত্তর দিচ্ছিল। যা বলেছিল তা তার মনে পড়ে না। তবু তার মর্ম তার স্মরণে ফিরে আসে—সে যেন প্রশ্ন করেছিল—তুমি কেন আমাকে নিয়ে যাচ্ছ? আমি ক্ষীণ, তাই তোমার হাতের বজ্রবন্ধন খসাতে পারি না—আমাকে তাই এই রাতের মধ্যে তুমি টেনে নিয়ে চলেছ। তুমি কে? তোমাকে আমি চিনি না। কিন্তু তোমার হাতের তলে নৃশংসতা ঢাকা। লুকোবার চেষ্টা কোরো না। কেন আমাকে এমন প্রমাদে টেনে নিয়ে চলেছ? কি ফল? তোমাকে

আমি কোনদিন খুঁজিনি। তুমি জড়—একটা হাত মাত্র। কেন এসেছ আমার কাছে? আমায় ছেড়ে দাও। আমি ফিরে যাই, যেমন করে পাখী দিনের শেষে ফিরে যায়—বলে সে আবার হাত ছাড়াবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তার জবাবে সেই ধরে থাকা হাত তার হাতটাকে দুমড়ে বেঁকিয়ে ভেঙ্গে ফেলতে চেয়েছিল। একটা যন্ত্রণা অগ্নিশিখার মত তার স্নায়ুগুলোকে পোড়াতে পোড়াতে ছড়িয়ে পড়ে তার সারা দেহে। সে সহ্য করতে পারে না তা। নির্বাকভাবে আত্মসমর্পিত হয়ে মুখ নীচু করে চলে। আর কিছু দেখে না। আকাশ তারায় ভরে চেয়ে ছিল তার দিকে। এক-সময় যেন দেখতে পায় তাকে নিয়ে আসা হয়েছে একটা ছোট অপরিসর গর্তের কাণায়। তার গভীরতাও বেশী নয়। সদ্য তোলা মাটি স্যাঁৎসেতে ভিজে। দিনের উষ্ণতাপ তখনও লেগেছিল তাতে। পাশে ডাঁইকরা মাটির গা বেয়ে কয়েকটা কীট কুঁকড়ে কুঁকড়ে উঠছিল। তারার আলোয় চকচক করে সেগুলো। সে দিকে চেয়ে তার সমস্ত শরীর পাক দিয়ে ওঠে। হাতটা তাকে বার দুই ঝাঁকি দিয়ে যেন বোঝাবার চেষ্টা করছিল যে গর্তটা তারই জন্যে। সে অবাক হয়ে শুধু তাকিয়ে থাকে—তার মৃত্যুর আয়োজনের ভিতরেও যে গভীর দৈন্য ফুটে ওঠে তাতে নিরাশার ভরে ওঠে তার বুক। অন্য কিছু মনে করতে পারে না সে।……

লেফাফা ওজন করতে করতে বারবার সে ফিরে আসছিল সেই রাতের ছবিতে। সেখান থেকে প্রাণপণে আবার তার জাগরণে। তার ভুল হয়, হয়ত সব কিছুই এক অচেতনতায় জড়িয়ে রয়েছে। সেই হাত, সেই ঠাণ্ডা কঠিন স্পর্শ ধীরে ধীরে উঠে আসার চেষ্টা করে তার হৃৎপিণ্ডের দিকে। সে শিউরে ওঠে। লম্বা ঘর পেরিয়ে রায়বাবুর টেবিলের দিকে তাকায়। মনে হয় সে দেখতে পায় তাঁর ঠোঁট দুটো নড়ছে। কানে সে কিছু শুনতে পায় না, কেবল টাইপ করার শব্দ একটানা বেজে চলে।

—রায়বাবু ডাকছেন আপনাকে।—সাধুচরণ টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে তাকে বলল। চমকে ফিরে তাকাল সে। ডাকছেন? কেন? লেফাফার দিকে তাড়াতাড়ি মুখ নামিয়ে সে চেয়ে দেখল—কোন বিশেষ কিছু ঘটেছে কিনা।

—যান তাড়াতাড়ি।—তাগিদ দিয়ে বলল সাধুচরণ।

শান্তনু আস্তে আস্তে টুল থেকে উঠে ঘর পেরিয়ে রায়বাবুর টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। একটা টাইপ করা কাগজ তুলে পড়ছিলেন তিনি।

কোন কথা বললেন না। কাগজটা পড়ে কুঞ্জবাবুর দিকে এগিয়ে দিলেন। তাঁদের দুজনার কথাবার্তা হতে লাগল। শান্তনু তার একটা কথাও বুঝতে পারছিল না। বুকের ভিতর জোরে জোরে শব্দের আঘাতে তার কান ভরে ছিল। হঠাৎ রায়বাবু তার দিকে চাইলেন। তাঁর চশমার পিছনে উজ্জ্বল পাথরের মত চাউনির দিকে চেয়ে শান্তনু চোখ নামাতে পারছিল না। একটা লেফাফা টেনে নিয়ে রায়বাবু ঠেলে দিলেন তার দিকে। পোষ্টাপিস থেকে ফেরৎ এসেছে। লাল কালিতে হিজিবিজি অক্ষর টানা এধার থেকে ওধার। সে বুঝতে পারল না কিছু।

—কি করেছেন?

সে না বুঝতে পেরে ঘাড় নাড়ল।

—ঠিকানা ভুল ছিল। টেণ্ডার পৌঁছতে পারে নি সময়মত। এর ফলে কোম্পানীর তিন হাজার দু'শো সাতান্ন টাকা লোকসান হয়ে গেছে—।

সে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল রায়বাবুর চোখের দিকে। কোন জবাব দিতে পারল না। পিছনে জানলা দিয়ে আলো ওধারের শূন্য দেয়ালের গায় পড়েছিল।

—আপনাকে নোটিস দিলাম। এখানে চাকরী করা চলবে না। আমরা অন্য লোক রাখব।—রায়বাবু একটা কাগজ তুলে নিয়ে ভুরু কুঁচকে কি পড়তে শুরু করলেন। শান্তনু থেকে তাঁর মন সরে গিয়ে অনেকগুলো জটিল শব্দের মধ্যে কি খোঁজাখুঁজি করতে লাগল।

শান্তনু বুঝতে পারে না তাঁর কথাগুলোর পুরোপুরি অর্থ। বাইরে একটা বিশাল পৃথিবী তার অজ্ঞেয়—রায়বাবুর কথাগুলো তার কাণেও পৌঁছয়নি সম্পূর্ণ—সে শুধু চেয়ে ছিল দুটো পাথরের মত চোখে সম্মোহিতের মত। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে তাই। অন্য টেবিলগুলো থেকে কেউ মুখ তোলে না। তারা ডুবে থাকে আপন কাজে। সাধুচরণ এসে তার কনুই মৃদু ছুঁয়ে আস্তে বলল—আপনি বসুন আপনার জায়গায় গিয়ে।

সে সন্দেহের সঙ্গে তাকায় তার দিকে ফিরে। সাধুচরণ হয়ত বুঝেছে—তাই বলছে তাকে কিছু। যেন আশ্বস্ত হয়ে সে ফিরে আসে নিজের টুলটায়। পুরোপুরি না বুঝলেও সে বোঝে তার ঠিকানা লেখায় কোথাও একটা ভুল হয়েছে। যেমন হয় প্রত্যহ। তার ঘুম ভাঙা থেকে প্রতিটি মুহূর্ত সে অবিচ্ছেদ্য ভুলের রাশির মধ্যে হেঁটে চলে। একটা লেফাফার

দিকে তাকিয়ে সে ঠিকানা মেলাতে লাগল। অক্ষরগুলো কেমন আলাদা ঠেকছিল তার। আবার পড়ে দেখল। ঠিকই লিখেছিল তবু কোথাও গরমিলের মত কিছু একটা রয়েছে। সে স্থির করে উঠতে পারে না। ভুলটা এড়িয়ে যায় তাকে, তার ঝাপসা কাচের মত চোখের পাশ দিয়ে। লেফাফার উপরে লেফাফা ডাঁই হয়ে উঠেছে। সব ভুল—ভুলে একাকার হয়ে গেছে সব কিছু। তবু যন্ত্রের মত অবিশ্বাসী হাতে সে লিখে চলে। মেলাতে ভয় করছিল—কি জানি, আরও প্রকট, আরও কঠিন হয়ে ভুলগুলো ফুটে উঠবে কালো কালো অক্ষরে। সেই প্রবল রাশিকৃত ভুলগুলোকে কিছুতেই ফেরাতে পারবেনা সে—দুর্বল হাতে তবু গোল গোল কিম্ভূত হরফে সে লিখে চলে।

—ওটা কি লিখলেন? চমকে উঠল সে। পাশে সাধুচরণ তার লেখা খাম হাতে দাঁড়িয়ে ছিল। চোখ তুলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল শান্তনু।

—ভুল করলেন আবার। ঠিক করে লিখুন এটা—

সে মিলিয়ে দেখে সংশোধন করে নিল।

—সায়েব রাগ করেছেন। মন দিয়ে কাজ করেন না—খালি ভুল করে বসেন। কোম্পানীর কাজ। আমি আপনি তুচ্ছ। ভুল হলে কোম্পানী তাড়িয়ে দেবে।—সে বিমূঢ়ের মত চেয়ে থাকে। দূরে টেবিলের উপর রায়বাবুর ছায়াটার দিকে তাকিয়ে থাকে। পিছনে জানলার উজ্জ্বল চৌকো গহ্বরটার গায়ে ছায়ার মত দেখাচ্ছিল। ছায়াটা অকম্প। সে কথাগুলোর মানে বোঝেনি। মনে হয় কোন কিছু পাল্টায়নি। টেবিলে মোমবাতির শিখা কেঁপে উঠে আবার উঁচু হয়ে স্থির হয়ে জ্বলে।

বিশ্বাসের মত কিছু ঘিরে থাকে চারপাশে—পুরোনো র‍্যাকগুলোয়—ধুলোপড়া ধূসর দেয়ালে—একটানা পাখাগুলোর আওয়াজে। সেও তেমনি—অপরিবর্তনীয়। তবু সেখান থেকে পেরিয়ে সে তাকায়—অনেক দূরে কোথাও একটা মুখের ছবি আর একটা দিগন্ত—ঘাসে ভরা, তৃণশ্যাম—ঘাসগুলো আঙুলে মুখটাকে তুলে ধরতে চায়—তার দুচোখে নরম সন্ধ্যার মত একটা অন্ধকার ভরে থাকে।

চার

সবে কর্মচঞ্চল হয়ে উঠছিল আফিস পাড়া। সারি সারি যানবাহন মোড় ঘুরে এসে দাঁড়াচ্ছিল ফুটপাতের ধারে—যাত্রীরা নেমে হন্ হন্ করে এগিয়ে যাচ্ছিল ক্রমবর্ধমান স্রোতে মিশে। আফিসের উঁচু-উঁচু ইমারতগুলোর জানলা দিয়ে আলো জ্বলে উঠতে দেখা যাচ্ছিল, পেতলের তকমা আঁটা উর্দিপরা দরওয়ানেরা বুটে বুট ঠুকে সেলাম করছিল দু-পাঁচ হাজারী সায়েব সুবোদের মস্ মস্ করে এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে। কুঞ্জবাবুও নামলেন ট্রাম থেকে। তাঁর তাড়া ছিল না। আফিস কাছেই। ধীর পায়ে রাস্তা পেরিয়ে এসে তিনি মোড়ের পানের দোকানটায় থেমে তাঁর ফরমাইস্ করলেন। তাঁর পান একটু আলাদা ধরণের। দোকানী তা জানে। আজ সাতাশ বচ্ছর কুঞ্জবাবু এই মোড় ঘুরে আফিসে পৌঁছবার আগে প্রত্যহ একটা পান গালে ভরে নেন। আরও দুটো কাগজের মোড়কে ভরে নিয়ে যান সঙ্গে। তাঁর জন্যে একটু এস্পেশাল, একটু বিশেষ ফরমূলা মত তৈরী করতে হয়। দোকানী তাও জানে। সে কোনোদিন মুখ তুলে তাকায় না। মোড়কটা তৈরী হয়ে গেলেই—এই যে বাবু, আপনার ওদিনের ছ পয়সা—। আরে রও বাপু—হিসেব পরে হবে, আগে পানটা গালে দি—গালে পুরতে পুরতে কুঞ্জবাবু তাকান আয়নার দিকে। মনে পড়ে না—বহু বহুদিন আগে আয়নায় যে প্রতিচ্ছবির দিকে তিনি এমনিভাবে চাইতেন। মনে পড়ে না সে ছবি। আজকের ছবিতে দুটো চোখ তাকিয়ে থাকে, তার আলো স্তিমিত। কপালের কুঞ্চিত রেখা আর কাঁচা-পাকা ভুরুর নিচে থেকে তারা চেয়ে থাকে। তবু আজকের কুঞ্জবাবু সেদিনও এমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পান খেতেন আয়নার দিকে চেয়ে। দেখতেন চুন-খয়েরে মেশা গাঢ় লাল রং ছড়িয়ে পড়ত অধরোষ্ঠের সীমায়। সে মুখ ছিল লাবণ্যের। কত বর্ষা-বাদলের ভরা-আকাশের ছায়ায় তাঁর মুখ কেমন দেখাত—হয়ত একটা কোমলতাও ছিল সে মুখের রেখায়। কিন্তু সাতাশ বছর বড় দীর্ঘ—বড় স্মৃতিহরা। এতটা তাল খেজুরে

কি ছিল তখন? হয়ত না। কুঞ্জবাবু আয়নায় দেখতে পান আজকের তাঁকে। সাতাশ বছর আগের 'সে' কোনদিন আর ছায়া ফেলবে না সেখানে। ছবির পর ছবি মুছে যায়। রাস্তার ফুটপাত দিয়ে হেঁটে চলতে চলতে স্মৃতিগুলো ঝরে পড়ে যায় অলক্ষ্যে। ঠিক তার চাঁদির মধ্যে আয়নায় চকচক করছিল টাক—চারিপাশে পাটের সরু সরু গোছার মত পাতলা চুলগুলো পরিপাটি করে আঁচড়ে নামানো কান অবধি, নেমে এসে শেষভাগ গোল গোল আংটির মত পেঁচিয়ে গেছে। চোয়ালের হাড় উঁচু কঠিন রেখায় ফুটে উঠেছে, মুখের তুধারে কয়েকটা করে দাঁত চিরকালের মত বিদায় নিতে টোল খেয়ে গাল ভিতরে ঢুকে গেছে। চোখের সাদা ঘোলাটে দেখায়, কালো মণি জোড়া ঢাকা পড়ে গেছে সাদা একটা আবরণে। কালের চিহ্ন। অনেক ধোওয়াট বয়ে গেছে তাঁর মুখের দাগগুলোকে ভেঙে চুরে দিয়ে। অনেক ক্ষয়ও কুড়িয়ে নিয়ে গেছে তা হৃদয় থেকে; কিন্তু তাঁকে জানতে দেয় নি সেই দীর্ঘ পরিবর্তনের কাহিনী একটুও। অন্য একদিন কুঞ্জবাবু এমনি চেয়েছিলেন আয়নায়। সেদিন বৃষ্টি নেমেছিল আকাশ ভেঙ্গে। তিনি পানের দোকানের বেরিয়ে থাকা টিনের নীচে কাপড় হাঁটুর উপর হাতে তুলে ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। রাস্তায় প্লাবনের মত জল ঝরে পড়ছিল। মাঝে মাঝে মুছে যাচ্ছিল অপর দিকের দেয়ালের ধারে সার সার মানুষের মুখগুলো। মাঝে মাঝে আবার জেগে উঠছিল। সকল আওয়াজ হারিয়ে যাচ্ছিল বৃষ্টির শব্দে আর থেমে থেমে মেঘের ডাকে। জলের গুঁড়ি উড়ে এসে লাগছিল চোখে মুখে। কুঞ্জবাবু অবশ্য উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন নি। তিনি একবার ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখেন—কাঁটা ১১টার ঘরে পৌঁছেছে। রায়বাবু সেদিন আফিসে আসবেন না—কোম্পানীর কাজে দিল্লী গেছেন, ফিরবেন সোমবারে। তাই আফিসে সময় মত ঢোকার এই সাময়িক বিচ্যুতিটুকু তিনি নিরুদ্বেগে পার হতে দিচ্ছিলেন। তাঁর ভাল লাগছিল কতকগুলো ঘটনা, যার উপরে তাঁর কোন হাত নেই—এই বৃষ্টি, রায়বাবুর না আসা।

এমন কি তাঁর আপন ইচ্ছা থাকলেও তা তাঁকে পৌঁছে দিতে পারবে না এই মুহূর্তে। তিনি শুধু নির্লিপ্তভাবে চেয়ে দেখছিলেন কালো পিচ ঢাকা রাস্তা জলে ভরে উঠতে, জলের রাশির গায়ে অসংখ্য এলোমেলো দাগ ফুটে আবার মিলিয়ে যেতে। চেয়ে থেকে মনের মধ্যে হঠাৎ হাসি পায়। কেমন অস্পষ্ট সেকালের কথা মনে করিয়ে দেয়—কাজ ফাঁকি দেওয়া, স্কুল

পালানো, আমতলায় চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকা, ছোট ছোট শিশুর মত তারা আনাগোনা করছিল মনে। কিন্তু কুঞ্জবাবু থাকেন বর্তমানে। তা থেকে পিছিয়ে যাওয়া সময়েতে যেগুলো একদা ফেলে এসেছিলেন, তিনি কোনদিন সেদিকে ফিরে দেখার চেষ্টা করেন নি। দশটা-পাঁচটার অভগ্ন প্রাত্যহিকতায় রোজ তিনি মুখগুঁজে চেয়ে থাকতেন মোটা লেজারে লেখা অক্ষরগুলোয়, আর ভুলে থাকতে পারতেন সব কিছু। প্রতিদিনটাই ছিল তাঁর কাছে উল্লেখযোগ্য, তার এধারে ওধারে চাইবার ইচ্ছা বা প্রেরণা তাঁর ছিল না। কোনকালে এই সংকীর্ণ গণ্ডীটুকু হয়ত তাঁর মনে হয়েছিল তাঁকে পুরোপুরি স্থান দিতে পারে নি। কিন্তু সে অনেকদিনের পুরোনো কথা। রঙিন মলাট যেমন জীর্ণ হয়ে ম্লান রং নেয়, তখন আর তাকে ধুলো ঝেড়ে তুলে রাখার বাসনা জাগে না, তেমনি সে সব মনে হওয়া মিলিয়ে গেছে। তা ছাড়া তখন ছিল যৌবন। মনে পড়ে না তাঁর পরিষ্কার ভাবে। তিনি আর দিবাকর রায়, এই অফিসে চাকরী নিয়েছিলেন প্রায় একই সঙ্গে। দিবাকর মানে রায়বাবু, বর্তমানে আফিসের ম্যানেজার আর কোম্পানীর অংশীদার। দিবাকর তাঁর চেয়ে বয়সে ছোট কিন্তু তাঁর অল্পদিন আগে আফিসে ঢুকেছিলো। ইংরাজি ভাল জানতো দিবাকর, আর চিঠি লেখায় তার হাত ভাল ছিল। কিন্তু তার একটা গুণ ছিল আর সেটাই ছিল আশ্চর্যের। কুঞ্জবাবুর মনে যেন কথাটার উদয় হতে আস্তে আস্তে ঘাড় নেড়ে সায় দেন।—বৃষ্টির ধারায় ঝাপসা ওপারের দেয়ালের দিকে চেয়ে কথাগুলো ভাবছিলেন কুঞ্জবাবু। দিবাকর তাঁদের সঙ্গে মিশেও যেন তাঁদের থেকে পৃথক হয়ে ছিল। তার সেই পার্থক্য তার আচরণে ছিল না, ছিল এমন কোন এক জায়গায় যেখানে তাঁরা উঁকি দিতে পারতেন না। প্রথম ক'টা বছর পাশাপাশিই কাজ করতেন। একই কাজ, একই ফাইল তাঁর হাত থেকে যেত ওর হাতে, সেখান থেকে অন্যের হাতে। একই কেটলি থেকে এক পয়সার মাপে চা ঢেলে দিয়ে যেত বেয়ারা। তবু দিবাকরের মধ্যে একটা সুপ্ত অঙ্কুর বড় হচ্ছিল। তাঁরা তা টের পেতেন না। সে কাজ করত মনোযোগ দিয়ে, একটু বেশী একাগ্রতায়, তাঁদের মনে হত। প্রত্যেকটা কাগজ খুঁটিয়ে পড়ত, চিঠির নকল লিখত অধ্যবসায়ের সঙ্গে। যেন সে বিশ্বাস করত অন্য কিছুতে। তাঁরা অনুভব করতেন শুধু দূরত্বটা। তাঁদের কেরানীদের সারে সে যেখানটায় বসত সেখানে মনে হত একটা বড় ফাঁক

পড়ে থাকত। কেউ আফিসের কোন কাজের বিষয় জিজ্ঞাসা করলে সে জবাব দিত নির্ভুল ভাবে, এত নির্ভুল যে তা মনে হত অমানুষিক। ক্রমে তাঁদের মনে তার প্রতি একই সঙ্গে একটা শ্রদ্ধা আর ভয় জাগ্রত হতে থাকল। আফিসের জড়-নিয়মের আড়ালে যে আরও দুর্নিরীক্ষ্য নিয়ম কাজ করে সেখানে সে প্রবেশ করেছে। সদাগরী আফিসের কেরানী হয়েও তার জানা তাঁদের অনধিগম্য। আফিসের স্নায়ুগুলো তার চোখে স্পষ্ট। সে সব দেখতে পায়, অথচ তাঁরা তাকে দেখতে পান না।

কোম্পানার হেড আফিস বোম্বাইতে ছিল। একবার সেই সময়কার বড় সায়েব কঠিন ব্যাধিতে পড়লেন। জরুরী কাজে হেড আফিস থেকে তার এল সায়েবকে তলব করে। ঠিক কি কারণে তাঁর মনে নেই, দিবাকরকেই যেতে হয়েছিল আফিসের কাগজপত্র নিয়ে। দিন সাতেক পরে দিবাকর ফিরে এল। কিন্তু সেই সাত দিনে সে সম্পূর্ণ বদলে গেছে। তার দূরত্বের দেয়াল আরও উঁচু করে তুলে ধরে সে ফিরে এল। গিয়ে বসল তার চেয়ারে কোন কথা না বলে। শোনা গেল যে সে ম্যানেজারের এ্যাসিষ্টাণ্টের পদ নিয়ে এসেছে হেড আফিস থেকে। তাঁরা আর তার স্বাভাবিক মানুষকে কোনদিন দেখতে পান নি তারপর থেকে। তার মধ্যে যে মানুষের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ছিল সে ঢাকা পড়ল তার চোখের ঔদাস্যের চাউনীতে। তার মুখের দাগ কঠিন রেখায় ফুটে উঠল। কুঞ্জবাবু একদিন দিবাকর ডাকনামটা ছেড়ে রায়বাবু বলে ডাকলেন, তুমি আহ্বানটা গলায় আটকে গিয়ে আপনি বেরিয়ে এল। তার গলার স্বরে এমন একটা হিম-অস্পর্শনীয়তা ফুটে উঠল যা বাক্যালাপকে আপনা হতেই রুদ্ধ করে দিত। কখনো সে কথা বলে উঠলে অন্য সকলে চুপ করে যেত, টেবিলগুলো থেকে মাথা ফিরিয়ে চেয়ে দেখত। কখনও পুরাতন অভ্যাসে তাঁরা কথা বলতে এসে চাইতেন দুটো বরফের টুকরোর মত তীক্ষ্ণ চোখের মণিতে; আমতা আমতা করে অপ্রতিভ চোখে তাঁরা তাড়াতাড়ি ফিরে আসতেন। অথচ এই পরিবর্তন কখনও অস্বাভাবিক মনে হয় নি। তাঁদের মধ্যে সে পরিবর্তন কোনদিন পৌঁছয়নি অবশ্য। যেটুকু পৌঁছেছিল, তা তাঁর মন থেকে এক এক করে পূর্বের অনেক কিছু মুছে দিয়েছিল, স্মৃতিকেও বাদ রাখেনি। কিন্তু দিবাকর রায় এই দীর্ঘ সাতাশ বছর ধরে কেবলই নিজেকে বদলেছিল। ক্রমে আফিসের সায়েব অবসর নিয়ে দেশে ফিরে গেল। ক'দিন আফিসের কেরানীদের মধ্যে, তার মধ্যে কুঞ্জবাবুও ছিলেন,

একটা জল্পনা আর উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল—নতুন ম্যানেজার আসবে। হয়ত খাঁটি সায়েব, হয়ত দেশী সায়েব—তবু না আসা পর্যন্ত তাঁরা তাঁদের খুশিমত আপন আপন ভবিষ্যত পাল্টে দেখেছিলেন। যেদিন দিবাকর গিয়ে ওই মাঝের টেবিলে বসল, তাঁরা ভেবেছিলেন, হয়ত কোন গণ্ডগোল হয়েছে, হয়ত সায়েব নতুন লোক, জাহাজ থেকে এদেশের মাটিতে এখনও পা দেয় নি। কিন্তু যখন একদিন দিবাকরের সইটার নীচে ম্যানেজারের সীল তাঁদের চোখে পড়ল সেদিন তাঁরা চমকে উঠলেন আর চেয়ে দেখলেন; যেন প্রথম তাঁরা দেখতে পেলেন তাকে—তার সমস্ত সপ্রকাশিত সত্তাকে। সে দিবাকর রায়, দীর্ঘ সাতাশ বছর তারপর সে ক্রমাগত দূরে চলে গেছে—এত দূরে যে তাঁরা আর সে বিস্মৃত মানুষ দিবাকরকে কোথাও দেখতে পেলেন না। চেয়ে দেখলেন তাঁরা একটা ছায়ার, একটা মুখোসের মুখচ্ছবির দিকে।··· অনেকদিন কেটে গেছে। কুঞ্জবাবু পানের পয়সা মিটিয়ে দিয়ে আফিসের দিকে হেঁটে চললেন। হঠাৎ তাঁর মনে আরেকটা মুখ ভেসে উঠল। সেটা শান্তনুর। রায়বাবু সামনের মাসে ওকে জবাব দেবেন। কেন যেন কুঞ্জবাবু একটু বিমনা হয়ে যান। চলতে চলতে তাঁর সাদায় কালো মেলা ভুরু জোড়া কুঁচকে থাকে, চোখ দুটো মগ্ন হয়ে থাকে। তিনি চেয়ে থাকেন মনের মধ্যে ভেসে ওঠা মুখটায়, তাঁর মনে হয় সেও এই গোটা পৃথিবী থেকে কোন ভাবে যোগ ছেঁড়া। কেবলই যেন পর পর কাচের দেয়ালের মধ্যে দিয়ে এগোয়, তার চোখ দেখতে পায় না। পায়ে পায়ে গুঁড়িয়ে যায় দেয়ালগুলো, ধারালো ফলকে ক্ষতবিক্ষত দেখায় মুখটা।

আফিসের দরজা দিয়ে ঢুকে তিনি সই করলেন খাতায়। একটু ফিরে চাইলেন শান্তনুর টেবিলের দিকে। দেয়ালের ধারে মোমবাতি জ্বেলে সে কাজ করছিল। কি মনে হয় কুঞ্জবাবুর। আস্তে আস্তে এসে দাঁড়ালেন ওর পিছনে। তাঁর উপস্থিতি ও টের পায় না।

—কি গো কখন এলে আফিসে?

ভয়ানক চমকে পিছন ফিরে তাকাল সে।

—জিগ্যেস করছিলাম কখন আফিসে এসেছ।— মৃদু গলায় অত্যন্ত আস্তে জিজ্ঞাসা করেন তিনি। চমকানো জন্তুর মত সে বিহ্বল ভাবে তাকায় কুঞ্জবাবুর মুখের দিক থেকে ঘর পেরিয়ে রায়বাবুর টেবিলে। তাঁর অনুপস্থিতিটা যেন অবিশ্বাস্য। হয়ত এখানেই কোথায় রয়েছেন। ছায়ার

মত। কুঞ্জবাবু হয়ত সেই ছায়ার সংকেতে তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। তার চোখ ফিরে আসে কুঞ্জবাবুর মুখে। ভাঙাচোরা গলায় একটা বিকৃত কর্কশ শব্দ গলা দিয়ে বেরিয়ে আসে ত্রাসের কম্পিত স্বরে—ঠিক দশটায় এসেছি—লেট হয়নি সার—সাধুচরণ—বলে সে একটা আঙ্গুল অনিশ্চিতভাবে তুলে ধরে চুপ করে থাকে। তার চোখে পাতা পড়ে না, নির্নিমেষে তাকায় কুঞ্জবাবুর দিকে।

—আহা ভয় পেয়ো না। বারোটায় এলেই বা আজ ক্ষতি কি ছিল!—চারিপাশে চোখ বোলাতে বোলাতে হেসে কুঞ্জবাবু বললেন—সায়েব দিল্লী গেছে। সোমবারে ফিরবে। জিগ্যেস করছিলুম—কাজকর্ম কেমন হচ্ছে?—

শান্তনু হাতে ধরা একটা চিঠির দিকে চোখ নামিয়ে চাইল। যেন তাদের সে সাক্ষী মানতে পারে। কুঞ্জবাবু ভাবছিলেন কথাটা পাড়বেন। কাচের দেয়াল যে দেখতে পায় না। কিন্তু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি চুপ করে থাকেন। একটা অবোধ্য শঙ্কা ছড়িয়ে পড়ছিল তার চোখে-মুখে। তাঁর দিকে চেয়ে সে দেখছিল সন্দেহে। কেন এই ব্যক্তি তার কাছে এসে দাঁড়িয়ে কথা বলছে? কে এ? সে তাঁর নাম জানে। পৃথিবী-জোড়া কুঞ্জবাবুদের একজন। কিন্তু তাঁর গলার স্বরকে সে চিনতে পারে না। সে খোঁজে তাঁর দৃষ্টিতে। কুঞ্জবাবুর নির্লিপ্ত চাউনীতে তার চোখ এসে ঠেকে থাকে। সে তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নেয়। কথাটা অন্যদিক থেকে পাড়বার চেষ্টা করেন তিনি—আফিসের চিঠিগুলো ঠিকমত পৌঁছয় না—বলছিলেন রায়বাবু—ফিরে আসে ঠিকানা খুঁজে না পেয়ে। এই সে-দিন একটা টেণ্ডার পাঠানো হয়েছিল। সময়মত পৌঁছল না—কোম্পানীর একটা কাজ ফস্কে গেল—বুঝলে ত, সদাগরী আফিস—লাভ ক্ষতির ওপরে চলে। এ কি আর সরকারী দপ্তর—লাগে টাকা গৌরী সেন জোগাবে—সদাগরী আফিসে কেবল লাভ চাই—ক্ষতি হলেই চক্ষুস্থির—রায়বাবু—গলা নামিয়ে কুঞ্জবাবু বললেন—কোন কারবারে লাভ হবে তা ঠিক বোঝে—আর কোন লোক দিয়ে লাভ হবে তাও—বলতে বলতে থেমে গেলেন তিনি। তাঁর সব কথাগুলো যেন এক অরণ্যের নিস্তব্ধ গায়ে লেগে ফিরে আসছিল। তবু আবার বলে চলেন—

—কোম্পানী চলে রায়বাবুর তেলোতে, তিনি ঠিকমত চালান, ঠিকমত চলে—একটু বেঠিকে পা ফেললে আর চলবে না। কোথায় কোন ইস্ক্রুপ ঢিলে

রায়বাবু অমনি টের পান। বছরের পর বছর গড়িয়ে যায়, লক্ষ লক্ষ টাকা আমদানী হয়, লাভ হয় কত তার ইয়ত্তা কে রাখে। রায়বাবু ইষ্টিয়ারীং ধরে আছেন, লাভের গাড়ী ঝড়ের মত ছুটে চলেছে। তুমি আমি তুচ্ছ ভাই—নাটবল্টু। ঢিলে হলে টাইট দেবেন, পুরোনো হয়ে গেলে বদলে নেবেন। আর অকেজো হলে—বলে কুঞ্জবাবু তাকালেন শান্তনুর দিকে। কিন্তু তাঁর উপমা-বহুল কথার অন্তরালে যা ছিল তা শান্তনুর চৈতন্যে প্রবেশ করে কিনা তা তিনি বুঝে উঠতে পারেন না।

—অকেজো হলে ছুড়ে ফেলে দেন।—হঠাৎ কুঞ্জবাবুর চোখে দপ করে অতীতের অনেক ছবি জ্বলে ওঠে। কতজন এসেছে এই আফিসে। কতজন চলে গেছে। সাবেক কালে ত্রিশজন কর্মচারী কাজ করত। এখন মোটে জন এগার তাঁরা মিলিয়ে। তবু আফিসের চাকাটা ঘুরেছে অবিরত। একই বেগে, একই তালে। যেন অন্ধ জানোয়ার, গড়িয়ে চলেছে সকাল দশটা থেকে পাঁচটায়, শ্রুতিহীন, দৃষ্টিহীন। তার পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে যায় কখনো এমনি এক একটা মুখের ছবি, বা ম্লান হয়ে আসে তাঁর নিজের মত। সকলের উপরে ছড়িয়ে থাকে রায়বাবুর ছায়া, এক বিভীষিকাময় অন্ধ নিয়মের সচেতনতা, এক অন্ধকার দেয়ালের গায় ইতিহাসহীন কঙ্কালের হিসাব মেলাবার নির্ভুল নিয়ম মাত্র। কুঞ্জবাবু স্তিমিত চোখে চেয়ে থাকেন ধুলোপড়া র‍্যাকগুলোর দিকে। তাড়াবাঁধা ফাইলগুলোয়; মোটা মোটা খাতাগুলোয় বছরের পর বছর অনেক লোক ঘাড় গুঁজে চাইতে চাইতে তাঁর মত আলো মুছে যেতে দেখেছে চোখের মণিতে। এক একটা পাতা খসে পড়েছে পাথরের গায়ে। এই ঘরের ভ্যাপসানো হাওয়া, পুরোনো কাগজের সোঁদা সোঁদা গন্ধ জীবন ব্যেপে ফুস্‌ফুস ভরে নিয়েছে। কোনদিন ত জানতে পারেনি, আলবাঁধা ধানক্ষেত পেরোতে পেরোতে আকাশে যে উদাস হাওয়া বয়, রোদমাখা তৃণের শস্যের শিশিরের সৌরভ সম্পৃক্ত হয়ে সে হাওয়া একটু কুড়িয়ে নিতে। তাদের দৃষ্টি প্রতিহত হয়ে ফিরে এসেছে দেয়ালগুলোয়। বাইরে জানালার চৌকো আলোর দাগ ফুটিয়ে রেখেছে একটা ছায়াকে। এসেছে গেছে কত। রায়বাবু বদলেছেন, পাল্টেছেন, কখনো ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন। কি লাভ এই অন্য একটা নূতন অপঘাতী জীবের কথা ভেবে? যাক না সে এই অন্ধগহ্বর ছেড়ে—এত বড় পৃথিবীতে তার স্থান মিলবে না একঠাঁই? কুঞ্জবাবু শান্তনুর দিকে ঝুঁকে বললেন—তাঁর গলাটা শোনায় কোমল—লেখ যা লিখছ। ভুল কোরোনা।

ভুল করলে রায়বাবু খুব রাগ করেন। বুঝলে, কোম্পানীর কাজ—তুমি আমি কে—তুচ্ছ! আসল হলেন মালিক!—রহস্যের সঙ্গে আঙুল তুলে দেখিয়ে তিনি হেসে ফিরে গেলেন আপনার টেবিলে।

শান্তনু তাঁর ফিরে যাওয়া মূর্তিকে অনুসরণ করে চাইল মাঝের শূন্য টেবিলটার দিকে। কেউ নেই বসে। সে বেরিয়ে যেতে পারে অনায়াসে—মনে হয়—সিঁড়ি দিয়ে নেমে, তারপর হেঁটে অন্য কোথাও। দুপুর বেলা লোক থাকে না রাস্তায়—একটা চৌকো টিনের নিশানা ঝুলে থাকে ল্যাম্পপোষ্টের গায়ে। তার উঁচু মাথা অস্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে রোদের আলোয়। এই সময় থেকে বিচ্ছিন্ন অন্য কোথাও। ভাবতে ভাবতে সে কাজ করতে থাকে।

পাঁচ

সেদিন বাসে যেতে যেতে আচম্বিতে কয়েকটা ক্ষণ শান্তনুর এমন এক আবৃত কোণে আলো জ্বেলে দিয়েছিল যার অস্তিত্ব সে নিজেও কোনদিন জানত না। তার পরেও সে বুঝতে পারেনি কি ঘটেছিল সেই কয়েকটা ক্ষণে। তার সচেতন মনের প্রকাশ যতটুকু ছিল তা কেবল বাইরের রূঢ় আলো থেকে কোন এক অন্তর অন্ধকারে লুকোবার প্রয়াসে ব্যস্ত থাকত—তার ভিতরে এক স্পর্শহীন অবলুপ্তির মধ্যে সে জেগে থাকত, তার জানালা দিয়ে সে শুনত দেহের কোথাও একটা ধ্বনিই কেবল বেজে চলেছে দিনে-রাতে। তার ভাষা নেই, কোন অর্থও ছিল না। অন্ধকারের মতই তা হয়ে থাকত অব্যক্ত, তবু তাই ছিল তার আপনার সব চেয়ে সপ্রমাণ বোধ। ঘুমের মধ্যে যে ছায়ায় সে মরে যেত প্রতিদিন—তা থেকে পুনর্বার ফিরে আসার এইটেই ছিল সবচেয়ে প্রবল যুক্তি, সে থেমে থাকত এই ছায়া আলোয় মেশা নির্জনতায়। সেইখানে কয়েকটি মুহূর্ত হঠাৎ শান্ত আলোয় জ্বলে উঠেছিল, প্রদীপের মত তার কোমল উদ্ভাস স্পর্শ করেছিল তার অন্ধকারে মোড়া দেয়ালের গা। তখন সেই ভিতরের ধ্বনি আপনাকে মিশিয়ে দিতে চেয়েছিল সুরের মত কিছুতে। যা ছিল স্তব্ধতা তা জেগে উঠতে চেয়েছিল কোন উদাসী রেশ নিয়ে ভেসে আসা হাওয়ায়—তার জাগরণকে সম্পূর্ণ করে তুলতে চেয়েছিল। সে জানত না এতদিন, তার ভিতরে এই হঠাৎ জাগরণ যে আকস্মিক বিস্ময়কে প্রকাশিত করেছিল তার মিল ছড়িয়ে ছিল তার চোখে দেখা তবু না দেখতে পাওয়া অনেক কিছুতে। একদিন একটা চলতি রাস্তার দুধারে শিরিষের সারির নীচে দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে সে অবাক হয়ে চেয়ে দেখে পড়ন্ত বেলার আলোয়—অপর্যাপ্ত সোনার মত ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। দুধারে খিলানের মত উঁচু হয়ে জুড়ে গিয়েছিল গাছগুলোর মাথা, আকাশে একটা মেঘের স্তূপ গতিহীন হয়ে থেমে ছিল। আকাশের শূন্য সীমায় একটা চিল মিলিয়ে যাচ্ছিল, ধীরে ধীরে যেন ঠোঁটে করে সেই দিনশেষের

আলোটাকে মুছে নিয়ে। তার জীর্ণ দেহের রেখা ধরে কিসের অস্পষ্ট ধ্বনি গড়িয়ে আসে—অনেক দিনের লুপ্ত জলধারার শব্দের মত তা মনে হয়। তার ছায়ামগ্ন ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে এত অপর্যাপ্ত সোনা-ধরা আলোয় নিজেকে সমর্পণ করা মনে হয় বেদনার মত। সেই আলোয় ভরা সন্ধিলগ্ন তাকে নিয়ে যেতে চাইছিল কোথাও যেখানে তার দৈন্যের স্মৃতিও তুচ্ছ। তার দেহ এক এক তিল অন্ধকারের মত যেন তপিত হতে চাইছিল সেই অগাধ আলোয় তার অবরুদ্ধতাকে অতিক্রম করে, তার আজন্মনিহিত বেদনাকে ফিরিয়ে দিতে। এক নিমেষ থেকে আরেকটা নিমেষে পার হয়ে যেতে যেতে যেন সেই অসম্বৃত রাঙানো আলোয় তার প্রতিটি বন্ধনকে সে খুলে দিতে পারত। অবাক হয়ে চেয়ে ছিল সে, তার একাকীত্ব এত সহজে মুছে যেতে পারাকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। চাইতে চাইতেই মেঘের গায়ে আলো নিভে এসেছিল। কিন্তু তার একলার অন্ধকার তখন কত অস্পষ্ট ছবির ইঙ্গিতে ভরে থাকে। কেল্লার কিনারায় স্বর্ণাভ গোধূলীতে ভরে থাকে তার দু'চোখ। শিরিষের ছায়াঘন নির্জন কালো হয়ে ওঠে। মাঠ বয়ে শুকনো হাওয়া এক ঝলক বয়ে আসে। তার গায়ে ঘাসের গন্ধ। মনে হয় সচকিত হয়ে ওঠে গাছের পাতাগুলো। সে কান পেতে শোনে। তার শরীরে ঘুমন্ত ঝিল্লিগুলো নিস্তব্ধ মীড়ের মত বেজে ওঠে। কোন এক দ্বিপ্রহরে —মনে হয় তা চিরকাল অদৃশ্য হয়েছিল—সে কেবল বিস্মৃত ছিল বলেই তাকে দেখতে পায় নি। তার দৃষ্টিহীন চোখে প্রদীপের মত জ্বলে উঠেছিল একটা ক্ষণ যা সমস্ত সময় থেকে আলাদা। তারপরে তা মিশে গেছে অন্য মুহূর্তগুলোর স্রোতে। তবুও তার মনে হয় যেন তা এই মুহূর্তগুলোরই গায়ে মিশে বয়ে চলেছে। তার চোখে লেগে প্রতিটি আলোর কণা প্রত্যাহত হয়ে ফিরে আসে—হয়ত আলোর সঙ্গে ছায়ার মত জড়িয়ে থাকে তেমনি সুন্দরতর কিছু; সে তবু অগাধ দিনের আলোতেও অন্ধের মত হাতড়ে ফেরে।

অনেক রাতে বাড়ী ফিরেছিল সেদিন। দরজায় পৌঁছেও তার চেতনা যেন জাগতে চায় না। সে ডুবে থাকে বিস্মৃতিতে। গলির গায়ে অল্প দূরে শার্সি দেওয়া গ্যাসের আলো কিছু দূর অবধি উজ্জ্বল হয়ে পড়েছিল। একটুও কাঁপে না আলো। মেঝের চৌকো শানের দাগগুলো ছবির মত ফুটে থাকে। তার ছোট খর্ব আকৃতির বাঁকা-

চোরা ছায়া লম্বা হয়ে হেলে পড়ে সরু পথটায়। দরজায় হাত দিতে কবাট আপনা থেকেই খুলে গেল। ভিতরে ঢুকে খিল তুলে দিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে এল সে উঠোনের দিকে। রান্নাঘর থেকে কথাবার্তার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। হঠাৎ সজাগ হয়ে ওঠে সে। একটা কৌতূহল তাকে আকর্ষণ করে, সিঁড়ি দিয়ে পা টিপে টিপে কয়েক ধাপ উঠে আবার নেমে এসে দাঁড়ায় শেষ ধাপে। তাদের নিভৃত কথাবার্তায় কান পেতে থাকতে একটা অজানা কৌতূহল যেন অনুভব করে। তার মায়ের গলা সে শুনতে পায়, কিন্তু স্বরটা আলাদা। তার কানে অপরিচিত ঠেকে। নিতাই খেতে খেতে জড়ানো গলায় জবাব দেয়। সে বাইরে দাঁড়িয়ে শোনে। সংসারের কথাবার্তা, আরও কত কি—সেগুলো বুঝতে পারা যায় না। হঠাৎ চমকে ওঠে। মনে হয় কথাগুলোর মোড় একদিকে ফেরে, রুক্ষ শব্দ ফুটে ওঠে। করুণাদেবী বলতে থাকেন—

—ওকে তো আর বিধাতা মানুষের সদগুণ দিয়ে পাঠান নি সংসারে। মানুষের মত চলাফেরা করে, তবু মানুষের বুদ্ধি ও পায়নি। কথা বললে হাঁ করে তাকায় নয় ত হাসে, জবাব দিতে কথা গুলিয়ে ফেলে।—ওর—

—ওটা পশু—মুখ চালাতে চালাতে বলল নিতাই—অবিকল পশুর মত হাবভাব। চাউনিটা দেখেছ ?—

করুণাদেবী জবাব দেন না। দুজনের কল্পনা ঘিরে থাকে একটা পশুবৎ মানুষ বা মানুষের মূর্তি পাওয়া পশুর মুখের দিকে চেয়ে। তারপর ছবিটাকে মুছে ফেলে দেন উভয়ই মন থেকে। বছরের পর বছর পার হয়ে গেছে এমনি। তাঁদের কথাবার্তা এইখানে এসে থেমে গেছে। তাঁরা পরিবারের মধ্যে এই তৃতীয় প্রাণীকে দেখেছেন একটা ঝাড়নহীন গাছের মত গজিয়ে উঠতে। তার প্রাণাবেগহৃত অস্তিত্ব তাঁদের হৃদয়ে স্থান পায় নি। নিতাই আবার বলতে শুরু করে।

—ব্যবসার যা দিনকাল, ভাবি আফিসে গিয়ে রায়বাবুকে ধরাধরি করে ওটার মাইনে আরও দু-দশটাকা বাড়িয়ে দিতে বলি। আমায় খাতির করে। বুঝলে মা—গেলে কখন—বলে কত বড় কোম্পানীর অফিসার রায়-বাবু—গেলেই অমনি চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলে। এই সেবার কি পার্টি হল—চিনেবাজার ছেড়ে আমার দোকানে সেটকে সেট অর্ডার পাঠিয়ে দিল। বলে আজই না হয় ভিখিরী হয়েছি, এককালে ত বংশের নামডাক

ছিল। সেটা জানে রায়বাবু। এক পাড়ায় থাকত এই সেদিনও। বললে কি আর কথা ঠেলবে। দশটা টাকা সোজা নয়—

—তাই করিস বাছা—বলে করুণাদেবী উঠে পড়েন।

সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে কান পেতে শুনছিল আরেকজন। রান্নাঘর আর সিঁড়ির দেওয়াল যেন সরু সরু গরাদের মত ফাঁক হয়ে যায়, ফাঁক দিয়ে তার মূর্তিকে সে দেখে, হলুদ কালি পড়া বিষণ্ণ আলোয় শীর্ণ নড়বড়ে একটা ছবি—রাতের গভীর প্রহরে দু'জোড়া চোখ চেয়ে দেখে তার দিকে। অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে এল সে। শব্দগুলো যেন পিছন পিছন তাড়া করে আসে। পশু—পশুর মত চাউনি—পশুর মত হাবভাব। তার পরিচয় এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনায়। এছাড়া অন্য পরিচয়হীন সে পথ থেকে পথান্তরে হেঁটে ফেরে। ছাদে উঠে এসে এক কোণে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে করুণাদেবীর উঠে আসার জন্য। চারিদিকে মেঘহীন অন্ধকার ঝরে পড়ে আকাশ থেকে। কিছুক্ষণ আগে মনে পড়ে আকাশে একটা অবর্ণনীয় আলোর ছটা ভরে ছিল। জোয়ারের মত তা প্লাবিত হয়ে গিয়েছিল তার দেহের স্নায়ুগুলোর রেখা ধরে। মনে হয় সেটা কোন কল্পনার মোহ। এই অনস্তিত্বে মুছে যাওয়া অন্ধকারে মিশে থেকে সে চারিদিকে তাকিয়ে দেখে। একটা বাড়ীর ঘড়িতে বারোটার ঘণ্টা বাজতে আরম্ভ করে। বাড়ীটা একটা শ্রান্ত পশুর মত ঘুমের ঘোরে কাৎরায়। করুণাদেবীর পায়ের আওয়াজ সিঁড়ি দিয়ে শোনা গেল। দরজার তালা খুললে শান্তনু ভিতরে ঢুকে জামা খুলে সাবধানে টাঙ্গিয়ে রাখল। একবার সেদিকে ফিরে সামান্য চমকে ওঠেন করুণাদেবী। কয়েকটা শব্দ ঠোঁটের গোড়ায় এসে থেমে যায়। তিনি অন্যমনস্ক হয়ে মশারীটা টেনে নামাতে লাগলেন। এখানে ওখানে ছেঁড়া বেরিয়ে পড়ে। সত্যিই উলিধূলি হয়ে গিয়েছিল সেটা। গোটা কয়েক টাকা পেলে নেট কিনে সেলাই করে নিতেন নিজে। চালটা এখনও ভাল রয়েছে, ভাবতে ভাবতে আবার তিনি ঘটিতে খাবার জল আনতে নীচে নেমে গেলেন।

ছয়

বিকেলের রোদ হেলে পড়েছিল দক্ষিণের জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে। খোলা দরজায় আলসের ছায়া সংকীর্ণ ছাদটায় আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে দেখছিলেন করুণাদেবী। সেই দুপুর থেকে তিনি আজ একরাশ ছেঁড়াখোঁড়া নিয়ে বসেছিলেন—দেখতে দেখতে বিকেল গড়িয়ে গেল। বেশী কাজ তেমন নয়। দু'একটা তালি মারা, দু'একটা ফোঁড় এখানে সেখানে দেওয়া। নিতাই গোটা দুই গেল বছরের তৈরী সার্ট ফেলে দিয়েছিল। এমন কিছু পুরোনো হয় নি, সামান্য কাঁধের কাছে ফেঁসে বা পিঠটা ছিঁড়ে গেছে। পরা যায় এখনো দু তিন মাস। করুণাদেবী তাই সেগুলো এক করে নিয়ে বসেছিলেন। একটা নিকেল-ফ্রেমের চশমা চোখে এঁটে তাঁকে এসব কাজ করতে হয়। কিন্তু বারে বারে চোখ টাটিয়ে উঠছিল, চশমা নামিয়ে আঁচলের খুঁটে চোখ মুছে আবার ধীরে ধীরে একটির পর একটি ফোঁড় তুলে মিলিয়ে আনছিলেন ছেঁড়াগুলো। জামা কটা শেষ হয়ে গেলে আরেকদিন কাশ্মিরী পশমের শাড়ীটা নিয়ে বসবেন। বেশ সময় কেটে যায়। ফুলতোলা পাড়ের অপরূপ দেখতে কাপড়টা। কর্তামশায়ের দেওয়া। কতদিন বাক্সে তোলা আছে; বিধবা হওয়ার পর থেকে তোরঙ্গের তলায় পড়ে পড়ে সেটা দিন গুনছে। পোকায় কেটে দেয়, আবার সেলাই করেন, আবার কাটে। রং ম্লান হয়ে এসেছে, তবু সেটার দিকে চাইলে বড় আনন্দ হয়। বড় পছন্দসই ছিল জিনিষটা। ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন একটু, সূচ বিঁধে যায় হাতে, একটা অস্পষ্ট কাতরোক্তি বেরিয়ে আসে তাঁর মুখ থেকে। হঠাৎ অসন্তোষে ভরে ওঠে সারা মন,—একি তাঁর কাজ? কতদিন নিতাইকে বলেছেন তাঁকে একবার নিয়ে যেতে ডাক্তারের কাছে। কত ফেরীঅলাও ত' পথে ঘাটে চশমা হেঁকে বেড়ায়। লোকে বলে চাল্‌সে ধরে চক্ষুতে চল্লিশ পেরোলেই। তাঁর ত ষাটের কোঠায় পৌছেছে বয়স। যার কাজ তার দেখা নেই, তিনি মরবেন ভূতের বেগার বয়ে।

বিড় বিড় করে আপন মনে অভিযোগ করে চলেন করুণাদেবী, হাতও চলে সমানে। নিতাইয়ের অনেক কিছুই ভাল লাগে না তাঁর যদিও তা প্রকাশ করেন না তিনি। কার কাছেই বা করবেন! দুবেলায় দুটো কথা বলার লোক ত ওই সৈরীর মা। মাঝে মাঝে সেও আপনি না এসে ছুঁড়িটাকে পাঠায়। দু'চক্ষে দেখতে পারেন না ছুঁড়িটাকে। হাবভাব মোটেই সুবিধের নয়। সব সময়ে যেন রসে ভাসছেন। বেটাছেলে দেখলেই মাগীর কান পর্যন্ত হাসি ফোটে। যা হোক, কখনো কদাচিৎ আসে এই রক্ষে। তবুও নিতাইয়ের দোষ দেখতে গেলে অনেক কিছুই চোখে পড়ে। আবার চোখ টাটিয়ে উঠতে করুণাদেবী তাড়াতাড়ি চশমাটা খুলে ফেলে চোখ রগড়াতে শুরু করলেন। জ্বলুনির চোটে দু'ফোঁটা জল তাঁর কুঞ্চিত গাল বেয়ে ঝরে পড়ল নামানো চশমায়, আরও ঝাপসা হয়ে গেল কাচটা। আশ্চর্য! ঢের ঢের চামার দেখেছেন তিনি, কিন্তু আপন পেটের ছেলের মত এমনটি বুঝি আর চোখে পড়ে না! সামান্য একটা চশমার কাচ, পাল্টানো ক'টা টাকারই বা আর মামলা—সেটুক্ উগ্‌গার করতে নিতাইয়ের বুক ফেটে যায়। বললেই বলে, আর দু'চারটে দিন সবুর করো, আমি একটু সামলে নি। দেরী যখন হয়েছেই—দু'চারটে দিনে এমন কিছু এসে যাবে না। মেলা হড়বড় কোরো না।—শোনো কথার ছিরি! এধারে ক'টা বছর এমনি গড়িয়ে গেল সে-দিকে খেয়ালই নেই। ছিঃ ছিঃ! ছেলের কাছে মুখ ফুটে চাইতে মাথা কাটা গিয়েছিল তাঁর—তবু সেটা যদি করে দিত। আর আপন মাগী যখন ঘরে ছিল তখন সাড়ি গয়নার ধুম কি! করুণাদেবীর হৃদয়ও কঠিন হয়ে গেছে। যারা ছিল তারা কেউ নেই। কোনোদিন কি কিছু প্রত্যাশা করেছেন এগুলোর কাছে? একটা চামার আর একটা—সেলাই শেষ করে এনে-ছিলেন তিনি। বেলা প'ড়ে আলোও ক্ষীণ হয়ে এসেছিল—দেখা যায় না সূচের মুখ। ভুরু কুচকে চাইছিলেন, কার যেন ছায়া পড়ল দরজা দিয়ে—করুণাদেবী চমকে মুখ তুলে তাকালেন। সৈরীর মা দাঁড়িয়ে দরজার গোড়ায়। সেলাইটা নামিয়ে রেখে বললেন—

—কাজ উঠে গেল সব?

—আজ্ঞে হ্যাঁ বৌদিদি—সৈরীর মা দোরগোড়ায় বসে পড়ে বলল—সেলাই নিয়ে বসেছিলে? এগুলো বুঝি বড় ছেলের জামা, যেগুলো সেবারে করিয়েছিল? তা হ্যাঁগো বৌদি, ছোট ছেলেটা কদিন ধরে ছেঁড়া জামা গায়ে আফিস

যাচ্ছে, তা আঁপনি সেটা মেরামত করে দেন নি। আমি বলব বলব মনে করি রোজ। আহা, ছোঁড়াটা গায়ে দিয়ে রোজ আফিসে যায়, তোমার সেটাই আগে ধরা উচিত ছিল।

হঠাৎ করুণাদেবীব মুখ বর্ণশূন্য হয়ে আসে। কম্পিত গলায় বললেন, —হ্যাঁ সৈরীর মা, তুমি বলছ কি? আমি কি বড় ছেলে ছোট ছেলে ভেবে সেলাই করি? ছোট ছেলের জামা ছেঁড়া তা দিলেই পারে? আমি কি কখনো না করেছি, না করবো?— বলতে বলতে অশ্রুরুদ্ধ হয়ে আসে তাঁর গলা। তাড়াতাড়ি সেলাই নামিয়ে রেখে আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখ মুছতে যান, কিন্তু কম্পিত হাত ভুলে চশমায় লেগে চশমাটা ছিটকে মেঝেয় পড়ে। তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিয়ে দেখলেন একটা কাচ তার ভেঙ্গে গেছে। অভিমান উপচে ওঠে গলায়, নিজেকে আর সম্বরণ করতে পারলেন না। চশমাটা সৈরীর মার দিকে দোষী করার মত বাড়িয়ে ধরে বললেন—নাও—এবার ছোট ছেলে বড় ছেলে সকলেরই জামা সেলাই ঘুচে গেল। চক্ষুর মত ধন---তা বুড়ো মায়ের একটা চশমাও বলে জোটে না। কেবল সেলাই করতে আর হাঁড়ি ঠেলতে আছি—কোন চুলো ত খোলা নেই।— বাকি কথাগুলো আর বলতে পারেন না, চোখ দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল গড়িয়ে পড়তে থাকে তাঁর।

ভয়ানক অপ্রতিভ হয়ে সৈরীর মা ভেবে পায় না কি বলবে সে। গিন্নীকে সে চেনে। যখন দশ বছরের খুকী এ বাড়ীতে মায়ের সঙ্গে আসত তখন কর্তামশাই বড় ছেলের বউ ঘরে এনেছিলেন। কিন্তু এত দীর্ঘদিনেও কি সে মেজাজের হদিস পেয়েছে তাঁর?

—দেখ কাণ্ড! ভেঙ্গে গেল চশমাটা? আহা কি বললাম গো মুখ পুড়ে যে আপনি রাগ করলেন বৌদিদি? ছোট ছেলেটার জামাটা তো তুমিও দেখতে পাও রোজ—।

—দেখতে পাই বৈকি, সব দেখতে পাই। এখন তোমরা দেখ প্রাণভরে— চশমাটা খোলের মধ্যে ভরতে ভরতে অসন্তুষ্ট চিত্তে উঠে পড়লেন করুণাদেবী। অভিমানের জমা ক্ষোভ মনে হঠাৎ এমন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠায় বিপন্ন বোধ হয় নিজেকে। তবুও সৈরীর মার ক্রূর কথাগুলো যেখানে তাঁর ক্ষত সব থেকে গভীর সেখানেই খোঁচাটা যেন মেরেছিল। তিনি সত্য বলেই তার প্রদাহ আরও তীব্রতর অনুভব করেন। সত্যিই শান্তর জামাটা ছেঁড়া কদিন ধরে

দেখছেন। আর তাঁকে সেলাইয়ের জন্যে দেওয়ার যুক্তিটাও অসার, তাও তিনি জানেন। কোন ছেলেই তাদের জামা মেরামত করতে বলে না তাঁকে। নিতাই ভয়ে বলে না পাছে এক বাণ্ডিল সুতো কিনে দিতে হয়। শান্তও কোনদিন বলে না। শিশুকালে শান্তনুর জামা ছিঁড়ে গেলে তাই সে পরত। এখনও আপন মনে ওপরের ঘরে বসে বসে ছুটির দিনে সেলাই করে ছেঁড়াখোঁড়া। তিনি কতবার দেখেছেন, দেয়ালে ঠেস দিয়ে নিবিষ্ট মনে মেয়েদের মত একটি একটি করে ফোঁড় তুলে সেলাই করতে।

—তাহলে আসি গো আজ— সৈরীর মা ঝনকাঠের পাশ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল। করুণাদেবী চমকে উঠলেন। তুচ্ছ ঘটনাটার ভিতর দিয়ে তাঁর মনের জমা আবেগ বেরিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ যেন অত্যন্ত একলা মনে হয় নিজেকে। সৈরীর মা বিদায়ের প্রার্থনা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে চলে গেলেই এই খাঁ-খাঁ বাড়ীটায় তাঁর একলাকে নিয়ে পড়ে থাকতে হবে দীর্ঘ রাত অবধি। একটু যদি তন্দ্রা আসে অমনি মনে হয় দরজায় যেন কার করাঘাত ভেসে আসে। চমকে জেগে ওঠেন। কিন্তু নিতাই ফেরে অনেক রাতে। হঠাৎ আকুল হয়ে ওঠে মনের মধ্যে কিসের যেন এক উদ্বেগ—কিসের অস্পষ্ট ছায়া চারিদিকে দাঁড়িয়ে থাকে—তিনি দেখতে পান না। চোখের দৃষ্টি রাতে আরও অন্ধকার মনে হয়, তাদের উপস্থিতি সচেতন করে রেখে দেয় তাঁকে, তন্দ্রাভিভূত হতে দেয় না। তবু সৈরীর মার সঙ্গে কথা বলে দু-দণ্ড কাটে। চলে যাবে সন্ধ্যে হতেই! তিনি ব্যাকুল হয়ে তাকান। ছি-ছি, বুড়ো বয়সে অহেতুক চোখের জল ফেলা! সৈরীর মার কি বা দোষ? কেন বিধাতা তাঁকে এমন বিরাগ মন দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছেন? কিন্তু কি করবেন?

উত্তর না পেয়ে অনির্দিষ্ট ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল সৈরীর মা। করুণাদেবী পিছন ফিরে কি একটা খুঁজছিলেন। গলার সুরে মৃদু অনুযোগের রেশ ফুটিয়ে বললেন—

—আজ একটু পরে গেলেই ত পারিস। ভাবছিলাম কাল রবিবার—আজ দুটো খাবার করে রেখে দি। ছুটির দিন, একটু ভালমন্দও রোজ খাওয়ার সময় থাকে না ওদের—

—তা ভালই ত গো। নিচে এস তবে বৌদি, আমি উনুনটেয় আঁচ দিইগে। দুটো কথা বলেও বাঁচব।

—তুইও বাঁচবি আমিও বাঁচব। উঃ একা একা বাড়ীটায় এক একদিন যেন দম আটকে আসতে চায়।

এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে এসে যেন জমে ওঠা গুমোট কাটিয়ে দিয়ে গেল। সৈরীর মা আঁচল গোছাতে গোছাতে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন করুণাদেবী। হঠাৎ নিজেকে এমনভাবে খান খান হ'তে দিতে নেই। কি ভাবল হয়ত, ছিঃ। তাঁর বয়স হয়েছে, জীবনটাও গড়িয়ে গড়িয়ে এবার এক জায়গায় এসে থামবে। সে জীবনের প্রায়ান্ধকার সকালবেলায় আর ত দৃষ্টি পৌছয় না। অনেক দূর চলে এসেছেন। তবুও মাঝে মাঝে অনেক দিনের প্রবাস পথযাত্রীর মত মনটা পিছন ফিরে যায়। কুটির ছেড়ে পথ তাকে নিয়ে চলেছিল, তা দিগন্ত পার হয়ে পৌছয় অন্য কোথাও। কেন মন চঞ্চল হয়ে ওঠে! জামাগুলো গুটিয়ে একটা বাঁশের চাঙারীর মধ্যে জড়ো করে রেখে দিয়ে তালা খুঁজতে লাগলেন তিনি। যাক গে, কোনো আগ্রহ নেই তাঁর, জামা ছেঁড়ে ছিঁড়ুক। কে তারা যে এত তদ্বির করতে হবে? খিলটা তুলে তালাটা আটকে টেনে পরীক্ষা করে দেখলেন। আপনা থেকে তাঁর ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে ওঠে। অন্যমনস্ক হয়ে নীচে নেমে এলেন করুণাদেবী।

সৈরীর মা ঘসি ভেঙে গুলের আগুন দিয়েছিল উনুনে। ধোঁয়ায় ঘর ভরে উঠতে বেরিয়ে এসে বলল—হ্যাঁ গো বৌদি, কে একজন মারা গেল কাগজে—খুব ধুমধাম ঘটা করে নিয়ে গেল রাস্তায় লোক—কে গা?

—তুই কাগজ পড়িস?—স্মিত হেসে জিজ্ঞাসা করলেন করুণাদেবী।

—না বৌদি—আমরা মুখ্যু সুখ্যু মানুষে পড়তে কি জানি। আর কখনো এটা সেটা জিনিষ কাগজে মুড়ে আনি তাতে ছবিটে আসটে দেখি। খুব ধুম কিনা তাই জিগ্যেস করছিলুম।

—কী জানি কে গেল। আমারও ত কাগজ নেওয়া হয় না—মাঝে মাঝে নিতাই গল্প করে তাই শুনি। আর সদর রাস্তায় বান বয়ে গেলেও আমার এ গলির ভেতর কোনো সাড়া আসে না। চারদেয়ালের মধ্যে কতটুকুই বা জানতে পারি। তোরা জানিস তোরা বাজারে ঘোরাফেরা করিস। হালের খবর তোদেরই মুখে মুখে ঘোরে।

—তা যা বলেছ বৌদি—হেসে মুখ ফিরিয়ে নেয় সৈরীর মা। বাজারের কথা প্রায়ই ঠাট্টা করে বলেন বৌদি।

—তা কি বলছিলি বড় লোকটার কথা, থামলি কেন?—গল্পের আগ্রহে উৎসুক চোখ তুলে চাইলেন করুণাদেবী।

হঠাৎ সৈরীর মা'র মুখ জলের কল খুলে দেওয়ার মত বইতে লাগল, —ও সে ভয়ানক ধুম করে নিয়ে গেল। লোকে লোকারণ্যি হয়ে গেছল। রাস্তায় হরিসংকীর্তন, ফুলের মালা, দামী খাট, ধূপধুনো—খই ছিটোতে ছিটোতে নিয়ে গেল। সে মানুষের তিলঠাই ছিল না যদি দেখতে। বলে খুব বড় নাকি দেশের মানুষ, লক্ষে একটি জন্মায়। ঢাউস যেন পেটখানা, মাথাভরা টাক, আমি দেখতে পেয়েছিলুম গলা বাড়িয়ে। আর দুধারে পয়সা বিলোচ্ছে গরীব দুঃখীজনকে; আহা এমনি করেই স্বর্গে যান বড় বড় মনিষ্যিরা। বড় রাস্তায় মোড় ঘুরে যখন চলে গেল বাঁদিকে, তখনও কি ছাই শোভাযাত্রার অন্ত আছে। সভব উজোড় করে লোক পৌঁছল কাশীমিত্তিরের ঘাটে। বলে পরে শুনলুম বৌদিদি, নাকি সেই বাবু খুব দরাজ মনের লোক ছিল। তেনার যে রক্ষিতে ছিল সেও নাকি গিয়েছিল ঘাটে, বলে শাড়ী-গয়না সব ফেলে হাতের খাড়ু ভেঙে দিয়েছিল মা গঙ্গার জলে আর মাজার নীচে অবধি এই এলোচুলের গোছা কেটে বিধবাদের মত ছোট করে ছেঁটে ফেলেছিল। বাবুর চার বেটা এসেছিল গঙ্গার ঘাটে। খুব চোখের জল ফেলল লোকে—

—তারপর?—অকৃত্রিম বিস্ময়ের সঙ্গে তাকালেন করুণাদেবী।

—তাই বলি বৌদি, যেতে হয় ত অমনি করেই যাওয়া ভাল। কি বল? আমরা হলুম গে ছোটলোক, তবু এ সব কাণ্ডকারখানা দেখলে মনটা উঁচু হয়ে ওঠে। তাই ভাবি বৌদি, আমাদের কর্তামশায়ও খুব বড় মনের মানুষ ছিলেন—তবু শেষ বয়সটা বড় কষ্ট পেয়ে গেছলেন তিনি। আর তোমার কথা যখন ভাবি বৌদি—দেয়ালের দিকে স্থির চেয়ে থেকে কথাগুলো থেমে গেল সৈরীর মার।

—আমার কথা তোকে ভাবতে হবে না সাতসন্ধ্যে। বল দু'চারটে আরও সহরের খোস গল্প, শুনি—আপনার উল্লেখ চাপা দিয়ে অপ্রসন্ন গলায় বললেন করুণাদেবী।

—সহরের কথা আর কি বলব বউদি, সহরের রকম সকম আমার আর আজকাল তত ভাল লাগে না। কি যে ছাই ক' বছর থেকে নতুন হাওয়া খেলছে দেশময়, সব যেন রাতারাতি পাল্টে যাচ্ছে। লোকের ভাবসাব হয়েছে মন্দ। তুমি চারদিকে দেয়াল বন্দী থাক, আমার মন বলে

বেশ আছ। বিধাতা মন্দের ভাল রেখেছে তোমারে একঠাঁই। সহরের কথা আর জিগ্যেস কোরোনা।—

উনুন ধরে উঠেছিল। করুণাদেবী রান্নাঘরে জিনিষপত্র একত্র করে নিয়ে এসে বসলেন উনুনের সামনে। কদিন দুধ জ্বাল দিয়ে একটু ক্ষীর করেছিলেন। ভেবেছিলেন নারকেল দিয়ে খান কয়েক চন্দ্রপুলী গড়িয়ে রাখবেন। তাই নারকেলটা হাতে তুলে নোড়া দিয়ে ঘা মেরে ভেঙে এগিয়ে দিলেন সৈরীর মার দিকে কুরবার জন্যে। উনুনটা বয়ে যাচ্ছিল, এই ফাঁকে একটু চায়ের জল বসিয়ে দিলে মন্দ হয় না। তিনি সন্ধ্যে হলে পূজো সেরেই তারপর জলগ্রহণ করেন। তবে চায়ে দোষ নেই, শাস্তরে কোনো নিষেধ পাওয়া যায় না।

—নে বাছা, নারকেলটা কুরে ফেল পেতলের থালায়। আমি এধারে জোগাড় করি।- বলে পিঁড়িটা টেনে নিয়ে বসলেন তিনি।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। রান্নাঘরের বাতিটা ধোঁয়ায় তেল কালিতে অপরিষ্কার হয়ে জ্বলছিল দেয়ালের গায়। তার স্থির অনুজ্জ্বল শিখা ঘরটার ঝুলপড়া জীর্ণ দেওয়ালে পড়ে জায়গায় জায়গায় বালি খসে যাওয়া ইঁটের গাঁথনি ফুটিয়ে তুলেছিল। কড়িকাঠে বড় বড় আলকাতরার জমে থাকা ফোটা চক-চক করছিল আলো লেগে।

—সহরের কথা কি বলব—থেমে যাওয়া সংলাপটার জের টেনে আবার আরম্ভ করল সৈরীর মা।—শুনেছ ত রিদয় ওস্তাগরের বস্তিটে ভেঙে দিয়েছে সরকারের থেকে। নতুন মস্ত চওড়া রাস্তা হবে সেখেন দিয়ে। বস্তির মালিকদের নাকি মোটা টাকা খেসারত দিয়ে জমির দাম মিটিয়ে দেছে। শোনা যায় নাকি আমাদের বস্তিটের ওপর শিগ্‌গির নজর পড়বে তেনাদের। সহরে উন্নতি হচ্ছে, তাই নাকি এসব আওজন পড়েছে। রিদয় ওস্তাগরের বস্তিটে যখন ভাঙল তখন সে কি সোরগোল উঠেছেল পাড়ায়, যদি দেখতে বেতে বৌদিদি। আমাদের বস্তিটেও ত বেশীদূর নয়। আর যখন এক-টাকে ভাঙতে নেগেছে তখন এক এক করে সবই যাবে, নয় কি? সহরে নাকি একটাও বস্তি রাখবে না। যত নোংরা আবর্জনা সব দূর করে দেবে। পরিষ্কার সব রাস্তা হবে, পার্ক হবে, ঘোড় দৌড়ের মাঠ তৈরী হবে, আরও কত কি হবে। বড় বড় লোকেরা সব বাড়ী করবেন। মস্ত মস্ত লাইট বসবে, চওড়া ফুট হবে—হঠাৎ চুপ করে সৈরীর মা হাতের নারকেলটা কিছুক্ষণ তুলে রইল হাতে করে। তারপর করুণাদেবীর দিকে ফিরে বলল,—আচ্ছা বৌদি আমরা গেরস্ত নোক আমরা কোথায় যাব?—

নিজের নির্লিপ্ত ফিরিস্তি বিবৃত করতে করতে সম্ভাবনাটা যেন তার মনে জাগ্রত হয়। একটু আশঙ্কিত হয়ে একটা ভাল জবাবের আশায় সে চেয়ে রইল করুণাদেবীর মুখের দিকে। অনেক কিছু তার ছোটলোকের ঘরের মেয়েলোক বলে বুদ্ধিতে কুলায় না। অনেক বছর তেমনি অনেক না বোঝার মত দেখে দেখে তার বিস্ফারিত চোখের পাতা যেন স্থায়ী ভাবে কুঁকড়ে গেছে, সে দুটো পিট পিট করে সে চাইতে থাকে।—

—কেন কাশী মিত্তিরের ঘাটে জায়গা হবে না তোদের?—হেসে ফেলে বললেন করুণাদেবী।

—তা যা বলেছ বৌদি।—নির্দ্বিধ মনে সৈরীর মা আবার নারকেল কুরতে শুরু করল—কাশী মিত্তিরের ঘাটে একবার পৌঁছতে পারলেই ল্যাটা চুকে যায়। মাগো, বৌদি সেকি দুমদাম কড়কড় শব্দ কদিন ধরে। আমাদের বস্তীর লোকেদের বেশীর ভাগ হল মাটকোঠা—পাতলা বাঁশের ছাঁচায় মাটি লেপে দেয়াল তোলা আর টিন টালীর ছাদ। আর এক এক গুঁতো মারে বৌদি, এক একটা দেয়াল অমনি ধড়াস্ করে খসে পড়ে। আহা তিনপুরুষ চারপুরুষ ধরে মনিষ্যি বাস করেছে, মরেছে, বিইয়েছে, কত হাসি আনন্দ দেখেছে ঘরগুলোয়, মাগো—আর দু ঘণ্টার মধ্যে গড়ের মাঠ করে দিলি মুখপোড়ারা! মুখে আগুন তেনাদের যেনারা এমন বিধি বিহিত করলেন! তারপর লোক-জন ঠেলাগাড়া বোঝাই করে জিনিষ-পত্তর তুলে নিয়ে যেতে লাগল এক এক করে। কেউ কাঁদল, কেউ গাল পাড়ল, কেউ এমনিতেই চুপে চাপে সরে পড়ল। আর কত জিনিস বৌদি, হাজার হলেও গেরস্ত বাড়ী এক একটা, দু দণ্ডে সরতে বলা কেমনতারা তুমিই বলো। হাঁড়ি, কলসী, ডেকচি, উনুন, বাক্স, পেঁটরা, মাদুর, কাঁথা ইস্তক কারুর কারুর পোষা বকরিগুলোও ঠেলার ওপর চাপিয়ে নিয়ে চলল। বস্তিটের তিন ঘর—ওই তোমরা যাকে কি বল সেই তেনারা ছিল। মাগীরা বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে বাবার কালে এমন ঢলাতে লাগল যে দিন দুকুরবেলা আমার অব্ধি বৌদি, লজ্জায় চক্ষু হেঁট হয়ে যাচ্ছিল। তনাদের পিরীতের ছোকরা কয়েকটি গুণ্ডোবাবু এয়েছিলেন। সবাই মিলে সপ্প করতে করতে রওয়ানা হয়ে গেল। ব্যস্—সাঁঝ গহবে, যেী ছিল কতকালের মানুষগুলোর ভিটে—সেটা খাঁ খাঁ ময়দান হয়ে পড়ে রইল একবারে। ইস্।—সে কুরুক্ষেত্র দৃশ্য সৈরীর মা যেন প্রত্যক্ষ দেখতে পায় চোখের সামনে। চুপ করে চেয়ে রইল দেয়ালগুলোর দিকে।

—আর লোকগুলো গেল কোথায়?—জিজ্ঞাসা করলেন করুণাদেবী।

—এই বোঝো এখন, কোথায় গেল তা আর জানলুম কোত্থেকে। আমাদের শ্রীমন্ত ধোপা ওই বস্তিটের বাসিন্দে ছিল। জিগ্যেস করলুম কোথায় যাবে? বললে ভবানীপুরে ক্যাঁসারিপাড়া না কোথায় নতুন বস্তিতে উঠে যাবে। তা এখানকার কত বাড়ী তার বাঁধা, সেগুলো আর জুটবে না ত? মানুষগুলো ছিল এতকাল চাক বেঁধে, এখন চার তরফে ছড়িয়ে মিশে যাবে কে কোথায় কে জানে?—একটু চুপ করে থেকে সৈরীর মা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা বৌদি, এসব হচ্ছে কেন বলতে পার?

—কি সব?

—এই যে এই এত ঘরভাঙা ভাঙি, বস্তিপাট ভেঙে তছনছ করছে, এ সবের মর্মোটা তোমরা ভদ্দরলোকে যতটা বোঝ আমরা বলে ছোটলোকের মাথায় ততটা ঢোকে না। তাই জিগ্যেস করছিলুম।—

জল গরম হয়ে গিয়েছিল। করুণাদেবী চা ভিজিয়ে নিজের পাথরের বাটি টেনে নিয়ে চা ঢাললেন তারপর বাকিটা সৈরীর মার হাতের কলাই চটা বাটিতে ঢেলে দিতে দিতে বললেন—কি জানি আমিও কি ছাই অত বুঝি। এই নিতাই মাঝে মাঝে বলে অনেক কথা তাই শুনি একটু আধটু। তা বুঝিনে বাপু আমিও তেমন সবকিছু। এককোণে পড়ে থাকি, বাইরে কি ঘটে না ঘটে টেরই পাই নে। নিতাই খুব বোঝে—বুঝলি কিনা—ও হোল কারবেরে মানুষ। এ যুগটা ওর হাতের তেলোয় গোণা। তাই বলছিল, সেদিন নাকি দেশময় খুব মহা উন্নতি হবে তারি তোড়জোড়ে লেগে গেছে চতুর্দিকে।—'

সৈরীর মা বড় বড় চোখ করে গলায় সুর টেনে বলে উঠল—ওমা তাই না কি, তা সে কেমন ধারা হবে?

করুণাদেবী উনুনে কড়া চড়িয়ে এক পলা ঘি ঢেলে দিতে দিতে বললেন—কি জানি, ঠিক বুঝতে পারিনে—এই রাস্তা ঘাট বাড়ীটাড়ী আফিস দপ্তর হবে। বড় বড় কোম্পানী খোলা হচ্ছে চারিদিকে। বিস্তর টাকার মামলা সে সব। খুব বড় বড় লোক নাকি এ সবের পেছনে রয়েছে।

—তা হলে সহরে আর আমাদের মত ছোটলোক-মোটলোকেরা থাকবে না মোটেই?

—আ মোলো যা, তাই আবার হয় নাকি! ছোটলোক থাকবে না ত যাবে কোথায়? আর গেলে চলবেই বা কি করে, কাজকম্মো রাস্তা ঘাট

ঝাঁটপাড়া কুলি কাবারি ধাঙ্গড় মেথর মুচি-মুদ্দফরাস না হলে চলবে কি করে! সব থাকবে, তবে হয়ত যেখানে ভাল ভাল রাস্তা ঘাট ইমারৎ হবে, যেখানে ভাল ভাল লোকেরা চলাফেরা করবে সেখেনটায় তোরা থাকবি নে। একটু আড়ালে গিয়ে বাস করবি—

—ত্‌,তা-ই ত! এত খবর একটিও জানতুম না ত! তা বৌদিদি, এ ব্যবস্থা হাজার হলে বেশ ভালই হচ্ছে। আর হবে না—বলে কিনা কত বিচক্ষণ ব্যক্তিরা বিবেচনা করেই না এসব করছেন। বড় ছেলের মুখে বুঝি খবর পাও এত?

—হ্যাঁ, নিতাই বলে সব কথা। ও ব্যবসা করে, পাশে মল্লিকদের সঙ্গে খুব খাতির ওর। মল্লিকরা এসব ব্যাপারে নাকি খুব জড়িয়ে আছে।—ক্ষীরের বাটিটা টেনে নিয়ে বললেন করুণাদেবী। নিতাইয়ের উপর অসন্তোষের ভাবটা এতক্ষণে অনেক কমে গিয়েছিল। কাল রবিবার। রবিবার প্রায় সারাদিনই সে বাড়ীতে কাটায়। কথা বলতে বলতে কখন দিনটা পার হয়ে যায় টেরই পান না। সেদিন রান্নাবান্নার যোগাড়ও একটু বেশী থাকে।

-হ্যাঁগো বড় ছেলে আর বিয়ে করবেনা?—ফট করে কথাটা বলে ফেলে তাকাল সৈরীর মা। করুণাদেবী পিছন ফিরে বসে ছিলেন। তাঁর ভ্রূ কুঁচকে ওঠে। কিন্তু সৈরীর মা তা দেখতে পায় না। যে কথাটা তাঁর অন্তরের অন্তরালে সব সময় ঘুর ঘুর করে বেড়ায় তারই প্রতিধ্বনি যেন শোনেন সৈরীর মার গলায়। অনেক-বার তিনি লক্ষ্য করেছেন সৈরীর মার এই মনের কথা ছোবল মেরে তুলে আনার অবিশ্বাস্য পটুতা। করুণাদেবী তাই মুখ তোলেন না। কতবার তিনি আর সৈরীর মা এই কথা আলোচনা করেছেন, এক কথাই বার বার ঘুরে ঘুরে বলা হয়েছে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামার মত। এখন জবাব দিতেও ক্লান্তি বোধ হয়।

-বড় ছেলে এই বেলা বিয়ে না করলে করবে কবে? বলি বয়স ত আর বসে থাকছে না।

—কি করব বল যদি বিয়ে না করে একলা থাকতে চায় ত জোর করে রাজী করাতে পারিনে ত আর।

—হ্যাঁ, একলা আবার বেটাছেলেয় থাকতে চায়। আগুন বলে ঘি পেলে পেরথক হয়ে থাকে আর কি—

তার গলায় এমন কিছু ছিল যে করুণাদেবী হঠাৎ মুখ তুলে সন্দিগ্ধচিত্তে তাকালেন। কিন্তু সৈরীর মা তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টি উপেক্ষা করে অন্য দিকে

চোখ ফিরিয়ে নেয়, চোখাচোখি হয় না। করুণাদেবী বুঝতে পারেন না ওর মনের কন্দরে কি কি বিষের শিকড় লুকিয়ে থাকে যা প্ররোচিত করে এই বাঁকা উক্তিকে।

—তার মানে তুই বলছিস বিয়ে করবার ইচ্ছে আছে নিতাইয়ের?—অনিশ্চিত ভাবে কথাটা বললেন তিনি।

—মত আছে কি অমত তা তো তুমিই ভাল জানবে বাপু। গর্ভে ধরেছ যাকে তার নাড়ীর খবর তুমি টের পাবে না? আমি কেবল তোমার কথাই ভেবে মরি। বুড়ো বয়সে কষ্ট করে মরবে সারা জীবন।

সৈরীর মার গলার সুরটা আরও খারাপ লাগল তাঁর। কেমন যেন রহস্য করে কিছু আটকে রেখেছে পেটের মধ্যে, কিন্তু কি তা জানতে দেবে না। রাগ হল তাঁর। কুপিত কণ্ঠে বলে উঠলেন—

—দেখ মাগী—রহস্যি করিস্ নে।—কি বি আগুন ছিষ্টি ঘেঁটে দেখেছিস্ তুই লা, যে পষ্ট বলতে গলায় কাঁটা বিঁধছে?

—আমি যা দেখবার তাই দেখি।—সারমেয়ী সুলভ উদ্ধত চাউনী মেলে সে জোড়া চোখ তুলে রাখল করুণাদেবীর অগ্নিময় দৃষ্টিতে, তার পর নিজের কথার ধৃষ্টতা মেপে মেপে বলল—এখন তুমি দেখগে!—

হতভম্বের মত হাতে উর্ধ্বস্থিত খুন্তি নামাতে ভুলে গিয়ে চেয়ে ছিলেন তিনি। সৈরীর মার কথার ভাব তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না পুরোপুরি। উক্তিটার পিছনে কি রয়েছে? কিন্তু তাঁকে ভাববার অবসর না দিয়ে সৈরীর মা আবার বলে ওঠে—বড় ছেলে যদি বিয়ে করতে নাই চায়, ত ছোটটা কি অপরাধ করেছে? ওটার বিয়ে দাও না!

চমকে ওঠেন করুণাদেবী। শব্দগুলোর অর্থ পুরোপুরি তিনি নিজেও বুঝতে পারেন না। অথচ সৈরীর মার মুখের দিকে চেয়ে তার অর্থ যেন আরও পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

—শান্তর বিয়ে?—অস্ফুট স্বরে প্রায় ফিসফিস্ করে বললেন তিনি।

—হ্যাঁ গো! ছেলেটাকে তুমি চোখ মেলে দেখলে না কোনো দিন। বিয়ে দিয়ে তাকে সংসারী করে পরপারে চলে যাও—তবেই ত কর্তব্য সারা হবে। নয় ত কি এমনি ভাসিয়ে রেখে বিদেয় নেবে?

তবুও যেন বুঝতে পারছিলেন না করুণাদেবী। মনের পটে ভেসে ওঠে একটা ম্লান শীর্ণ মূর্তি, একা একা ছায়ার মত যে আসে যায় দৃষ্টিরুদ্ধ চাউনী

মেলে, যে এসেছিল তাঁরই ভিতর দিয়ে একদিন এই পৃথিবীতে। তাঁর মর্মে একটা অনাবৃত শূন্যস্থান মাত্র সৃষ্টি করে সে সরে গেছে অনেক দূরে। কোনদিন সে কথা ভাবেন নি করুণাদেবী। কোনদিন স্বপ্নেও মেনে নিতে পারেন নি তাঁদের যথার্থ সম্পর্ক। এক অপরিচিতকে বিধাতা পাঠিয়েছিলেন তাঁর জঠরে, এক ফোটা স্নেহ তার প্রতি হৃদয়ে না দিয়ে। কে সে? তিনি সত্যি চেনেন না তাকে। তাকে সংসারী করার ভার কেন তাঁর উপরে? একটা তীব্র গ্লানিতে ভরে ওঠে মন। বিষমাখা গলায় বলে ওঠেন তিনি—

—তুই বলছিস কি সৈরীর মা, ওই আধা-মানুষ আধা-পাগল, মনমরা লোক, কে ওকে মেয়ে দেবে?

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সৈরীর মা বলে উঠল—তোমার মত মন যে বাপমায়ের সে দেবে না। কি এমন অযুগ্যি আমাদের শান্ত? কোনোদিন ভাবলে ওর বিষয় একটুকু? আমার যদি অমনও একটা ছেলে থাকত তাহলে দেখতে এই ছোটলোকের ঘরেও কত আদর হত। আহা, মুখ নীচু করেই রইল চিরটাকাল। যাক্ গে বাপু—তোমাদের ঘরকন্না তোমরা বোঝো, আমি চললুম, রাত হয়েছে।

দুম করে উঠে পড়ল সৈরীর মা। তার প্রত্যেক ভঙ্গীর মধ্যে প্রতাপান্বিত মহিমা বিন্দুমাত্র ঢাকবার চেষ্টা না করে গটগটিয়ে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে।

কথাগুলো মর্মে মর্মে বিঁধে যেন বিষ ছড়াচ্ছিল সারা গায়ে। পিছন পিছন উঠে গেলেন তিনি দরজা পর্যন্ত। ইচ্ছে হচ্ছিল ডেকে তিনি প্রাণ খুলে গালি পাড়েন নয়ত ঝাঁটা মেরে দ্বিতীয়বার বিদায় করে দেন। কিন্তু কিছুই করলেন না; দরজার ফাঁক দিয়ে সৈরীর মার মূর্তিটা অদৃশ্য হয়ে যাওয়া দেখতে দেখতে চোখে মুখে একটা হিংস্র জিঘাংসা ফুটে ওঠে তাঁর। মিনিট খানেক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। তারপর চাপা নিঃশ্বাসের সঙ্গে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে—বাজারে খান্‌কি মাগী কোথাকার!—এর বেশী কিছু বলেন না, বলবার প্রয়োজনও মনে করেন না। খিলটা তুলে দিয়ে ফিরে এলেন করুণাদেবী রান্নাঘরে। চারিদিক থেকে হঠাৎ নিস্তব্ধতা এসে ঘিরে ধরে। অতিরিক্ত শূন্য মনে হয় যেন ভিতরে। একবার তাকান দেয়ালগুলোর দিকে। একটা টিকটিকি স্থির হয়ে ছিল দেয়ালে বাতিটার কাছে। তার একটা ছায়া পড়েছিল অবিশ্বাস্য রকমের বড় হয়ে। চোখ দুটো কালো

হীরের মত জলছিল। কি স্থির দেয়ালগুলো। অপলক চোখে চাইতে থাকেন করুণাদেবী। ভয় করে, নিদারুণ অতীতের ভয় জড়িয়ে থাকে চারিদিকে। ভাবেন চেঁচিয়ে উঠবেন, চেঁচিয়ে সচকিত করে দেবেন দেয়ালগুলোর নিস্তব্ধতাকে। নিতাইয়ের নাম ধরে ডাকবেন। কিন্তু দেয়ালগুলো তাঁর মনের চেয়ে অসীম শক্তি ধরে আছে। মুখ দিয়ে কোনো শব্দ ফোটে না। আস্তে আস্তে শিকল তুলে দিয়ে খোলা বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন তিনি। মাথার উপর এক কুচি আকাশ তারায় আঁকা। ঘ্যাঁসটানো পায়ে করুণাদেবী আস্তে এগিয়ে যান আবার সদর দরজার দিকে। খিলটা নিঃশব্দে খুলে একটু ফাঁক করে তাকিয়ে দেখেন বাইরে। লোকজন চলে দু-একটা কখনো। মুখগুলো দেখা যায় গ্যাসবাতির নীচে দিয়ে পার হলেই। দিনের বেলা ফেরীওলা হেঁকে যায়। তাদের গলার স্বর অনেকক্ষণ শোনা যায়। গলির শেষ প্রান্তে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে শেষে থেমে যায়। বাসন বিক্রী ঠং করে কাঁসরে ঘা মেরে রোল তোলে—তাঁর কানে এসে লাগে। শোনেন ওপর তলা থেকে। মানুষ-গুলোর মুখ দেখা যায় না। কল্পনায় যেন দেখতে পান গলির বাঁক ঘুরে কত মানুষ চলেছে, কত অসংখ্য মানুষ রোদের তাত মেখে, ছাতা মাথায় পুঁটুলি কাঁধে—দিবারাত্র। এ কটা পায়ের শব্দ যেন এগিয়ে আসে। করুণাদেবী উৎসুক চোখ মেলে চেয়ে দেখেন। একটা শীর্ণ দেহ এগিয়ে আসে গ্যাসের আলোর নীচে থেকে, দরজার কাছে এসে থেমে দাঁড়ায়। তারপর হাত তুলে ক্ষীণ ভাবে দরজার কড়া নাড়ে। তার চোখ মনে হয় যেন দেখতে পায় না। একান্ত অভ্যাসের বশে চিরাচরিত প্রথার মত সে কড়া নাড়ে, দরজার ফাঁকটা নজরে পড়ে না। করুণাদেবী ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখেন শান্তনুর মুখের দিকে, দরজা মেলে ধরবার জন্য হাত ওঠাতে পারেন না। তার ভাবলেশহীন রং-জ্বলে-যাওয়া মুখের দৃষ্টি সোজা তাঁর উপরে নিবদ্ধ। হাত নামিয়ে অপেক্ষা করে থাকে সে। মনে হয় দরজা খুলে না দিলে সারারাত হয়ত তেমনি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে, ঘরে ফেরা গৃহপালিত পশুর মত। আশ্রয় চাওয়ার প্রয়াসও ফোটে না যেন তার মুখের স্তব্ধ রেখাগুলোয়। একটা কবাট অলক্ষিতে খুলে ধরেন করুণাদেবী, তারপর নিঃশব্দ পায়ে ফিরে যান।

শান্তনু কবাট বন্ধ করে ভিতরে ঢুকে রান্নাঘরের দরজায় আলো জ্বলতে দেখে একটু যেন অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অন্যদিন নীচে অন্ধকার থাকে। করুণাদেবী জপ করেন উপরের ঘরে। একটু অনিশ্চিতভাবে থেমে থেকে

সে এগিয়ে গেল রান্নাঘরের দিকে। করুণাদেবী পিছন ফিরে জিনিষপত্র গোছ-গাছ করে উঠবার উদ্যোগ করছিলেন। একটা অশরীরী বোধ যেন শান্তনুর উপস্থিতিটা তাঁকে টের পাইয়ে দেয়। চন্দ্রপুলির থালা নামিয়ে আস্তে আস্তে ঘাড় ফিরিয়ে চাইলেন তিনি। সে একটা কবাট ধরে দাঁড়িয়েছিল। কি চেয়ে দেখছিল তা তিনি বুঝতে পারেন না। অস্পষ্ট অস্বস্তি এসে জড়িয়ে ধরে তাঁর মনকে। গৃহহীন কুকুরের মত একটা ভাব তার মুখে, যেন রান্নাঘরের দরজা দিয়ে উঁকি মারছে অনধিকারে। মন অজান্তে ছেই ছেই করে ওঠে, তাড়াতাড়ি সেটা চাপা দিয়ে মন থেকে দূর করবার চেষ্টা করেন প্রাণপণে। মুখের কঠিন রেখাগুলোকে কোমল করে এক টুকরো হাসিতে ভেঙ্গে ফেলতে চান, একটা শব্দ উদ্‌ভ্রান্ত মনে খোঁজেন কিছু জিজ্ঞাসা করার মত যা হৃদয়ের উষ্ণতায় সম্পৃক্ত; কিন্তু মেলে না। তার চোখ চেয়ে থাকে নিষ্পলক। চন্দ্রপুলীর থালাটা নৈবেদ্যে উৎসর্গীকৃত। সে দেখে দূর থেকে, পুজারীর ষোড়শোপচার যেমন কৌতূহল ভরে দেখে।

—কে শান্ত। আজ তাড়াতাড়ি ফিরলি যে?—গলায় একবাশ রুদ্ধতা ঠেলে জিজ্ঞাসা করলেন করুণাদেবী।

—মা, ওগুলো কি গড়িয়ছে?

ভীষণ চমকে ওঠেন তিনি। এ কি গলার স্বর তাঁর কানে এসে লাগে! কোন একটা গুহাহিত মর্ম থেকে উঠে এসে যেন তা পৌছয়। তাঁর সকল দেয়ালগুলো টপকে, অনেক পরিচিতের মত। কে যে জরাজীর্ণ দেহের অন্তরাল থেকে এমন স্বরে কথা বলে। করুণাদেবীর মন সংশয়ে ভরে ওঠে, তাঁর দৃষ্টির সমান্তরালে দাঁড়িয়ে ওই উপস্থিতি একান্তই বাস্তব তবু বিশ্বাস হয় না তার গলা—কোন জবাব তিনি খুঁজে পান না—

—চন্দ্রপুলী।—আড়ষ্ট গলায় বললেন করুণাদেবী। থালাটা হাতে করে উঠে দাঁড়িয়ে একটু থেমে বললেন—নিয়ে যা একটা, ওপরে তোর খাবার ঢাকা রয়েছে, খাস তারি সঙ্গে।

এগিয়ে একটা চন্দ্রপুলী হাতে করে বাড়িয়ে ধরলেন, হাতটা কাঁপছিল অল্প। সৈরীর মার কথাগুলো কাঁটার মত ফুটে ওঠে মনের ভিতরে। জ্বলে যায় সর্বাঙ্গ।

একটা কৃশ পাণ্ডুর হাত বাড়িয়ে সে সেটা গ্রহণ করে, নৈবেদ্যের মত, দেখতে পায় না দাত্রীর লোলচর্ম আবৃত কাঁপা হাতখানা ছায়ায় পড়ে থাকে বলে।

সাত

অনেকগুলো কথার টুকরো, শৈশবের ভাঙ্গা খেলনার মত ছড়িয়ে থাকে আশেপাশে। সে চেয়ে থাকে, মেলাবার চেষ্টা করে না। টুকরোগুলো ছোট ছোট ছবি হয়ে কথা বলে, অর্থহীন কথার অসমাপ্ত টুকরো সেগুলো, বলে থেমে যায়—আবার ফুটে ওঠে ছবি হয়ে। আস্তে আস্তে দেহটার তীর থেকে ঘুম সরে যাচ্ছিল একটা কোমল পর্দা সরিয়ে নেওয়ার মত চেতনাকে সকালবেলার কোলে মেলে রেখে। সে ঘুমিয়েছিল, যেমন কালো দীঘির বুকে রাতের অন্ধকার মোড়া থাকে। সন্ধিরেখাটা মুছে গিয়েও সে তেমন সজাগ বোধ করে না। তার চোখের দেয়ালে দিন এসে সজোরে ধাক্কা দেয় না। ইন্দ্রিয়গুলো অগোচরে দেখে দিনটার দিকে চেয়ে। কানের পর্দায় স্পর্শ করে থাকে একটা নীরবতা, ভেঙে যেতে চায় না। বন্ধ পাতার মধ্যে দিয়েও সে জানতে পারে দিনের মুখ কোন কিছুর অবগুণ্ঠনে ঢাকা, কিসের মন্ত্র ছোঁওয়া লেগে তার আলো যেন কোমলতর হয়ে আছে। অন্য অবারিত দিনগুলো থেকে তা একটু স্বতন্ত্র, একটু নির্জন, যেন কোন সংগোপনে বসে ভাববার অবকাশের মত। সে চোখ মেলে তাকায় না, মনের শ্লথ গ্রন্থিগুলোকে পড়ে থাকতে দেয় এলোমেলো। কানে একটানা ফিস্‌ফিস্‌ শব্দ এসে ঢোকে—অন্য কোন গূঢ় অস্তিত্বের আলাপের মত শোনায় তা, ভয় হয় চোখ মেললেই বুঝি বা থেমে যায়।

সে যেন চোখ না খুলেই জানতে পারে আকাশের মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল রাশি রাশি মেঘ। দিনটার প্রারম্ভে তাই সংগ্রামের ঘোষণা ছিল না, ছিল একটু মৌসুমী গন্ধ লেগে, যা সঙ্গে করে বয়ে এনেছিল কোলাহলের ফাঁকে ফাঁকে কান পেতে শোনা অনেক নির্জন প্রহরের কথা। জানলার ফাঁক দিয়ে হাওয়া শির শির করে ঘরে এসে ঢোকে, দু-একটা ছেঁড়া কাগজের টুকরোকে তুলে নিয়ে ছুটোছুটি করে, তারপর থেমে যায়। কয়েক মুহূর্ত চঞ্চলতায় ভরিয়ে তোলে নিস্তব্ধ ক্ষণগুলোকে, তারপর আবার একটানা ফিসফিস আওয়াজ ঝরতে থাকে। তার চাদরে ঢাকা স্পন্দহীন দেহটার উপর দিয়ে সে হাওয়া বয়ে পার হয়ে যায়। তার মনে হয় অত্যন্ত হাল্কা আঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়ে যেন ছুঁয়ে ছুঁয়ে সর্বাঙ্গ পরখ করে দেখে। আবার মনে হয় মাঠে ঘাসের

মাথাগুলো ছুঁয়েও যে হাওয়া এমনি বয়ে চলে—গাছের নতুন কচি পল্লবে ঢাকা ডালগুলো নুইয়ে দিয়ে বইতে থাকে একটানা হু হু করে, ফিস্ ফিস্ করে—। সে যদি এমন কোন নির্জনতর অস্পষ্ট জগতের মধ্যে চোখ না খুলে আস্তে আস্তে সরে দাঁড়াতে পারত, তা হলেও সেই হাওয়া বইত তার দেহটাকে ছুঁয়ে।

হঠাৎ চমকে উঠে সে তাকায় তার বিছানায় শায়িত মূর্তিটার দিকে—হাত-পা অস্থি চর্মসার শরীরটা আবৃত সাদা চাদরে, তার কাচের মত চোখের পাতা নামান, শিরদাঁড়ার গিঁটগুলো পথের নিশানার মত উঁচু উঁচু। দেহটার গহ্বর থেকে একটা আওয়াজ বেজে চলেছে দিন রাত, তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তার জন্ম-মৃত্যুবোধ—অপার তিমিরের মধ্যে অনেক দূরে ফুটে ওঠা একটা ধারাবাহিক সংকেতের মত। আর কখনো কোন জন্মান্তরের সীমায় হঠাৎ জেগে ওঠার মত একটা কোমল মুখের ছবি চকিতে ভেসে ওঠে। সে মুখ তার হৃদয়কে বিস্ময়ের মুঠোয় ধরে থাকে। একটা কালহীন স্রোতের টান ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায় তার জরাধৃত শরীরকে—ভিজে হাওয়া ভরে যায় সেই স্মৃতিতে—তার দেহের প্রতি অণুতে বৃষ্টির শব্দের প্রতিটি আঘাতে সে যেন টের পায়।

চোখ মেলে চাইল সে। আকাশ মেঘে ঢাকা। নিঃশব্দ হাওয়া বইছে বাইরে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি কুয়াশার মত অস্পষ্ট করে দিয়েছে জানলায় আকাশের ছবিকে। সেই সঙ্গিহীন নারকেলের পাতা ঝুঁকে পড়েছে হাওয়ার দমকে—মনে হয় সারা জগত কি এক কৌতুকোচ্ছ্বাসে ভরে উঠেছে তার হৃদয়ের বাইরে। একটা অসম্বৃত আবেগ ভরে ফেলতে চায় তার সমস্ত সত্তাকে—তাকে রোধ করার ইচ্ছাও সে খুঁজে পায় না। কেন মেঘে মেঘে একাকার হয়ে থাকে আকাশ যাকে স্পর্শ করা যায় না, অথচ তার জাগরণকে আকুলতায় ভরে দেয়! তার সমারোহ এক অবর্ণনীয় পুলকের বেদনার মত দুলতে থাকে তার মনে। সে ভেবে পায় না।

উঠে পড়ে সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিল। আজ রবিবার। আজ তার ছুটি—সে ঘুরে বেড়াতে পারে ইচ্ছামত রাস্তা দিয়ে। দিনটা ভিজে, একটা ধূসর মেঘার্দ্র আলো ছড়িয়ে রয়েছে সব কিছুর গায়ে। তার মন আশায় উন্মুখ হয়ে চায় আকাশের দিকে।

আজ রবিবার. তায় বাদলা করেছিল আকাশটায়, সংসারের উদ্যোগ যেন ক্রমাগতই টানতে দেরী হয়। উনুনের উপর জলের হাঁড়ি থেকে সাঁই সাঁই আওয়াজ উঠছিল 'একটানা জল ফুটে ওঠার পূর্বমুহূর্ত কটা চিত্রিতের মত স্থির হয়ে চেয়ে থাকেন করুণাদেবী। কপালের উপরে সার সার রেখার কুঞ্চন ফুটে ওঠে। কলতলা থেকে মেয়েগলার অনর্গল কথাগুলো কানে এসে ঢোকে, তিনি নির্লিপ্ততার অন্তরাল থেকে উন্মুখ হয়ে শোনেন। পাশে চায়ের পেয়ালা, কাঁসার বাটিতে রাখা গতরাত্রের বাসি দুধ, একটা চা ছাঁকার খয়েরী ছোপধরা শুকনো খড়খড়ে ন্যাকড়া, পাথরের রেকাবীতে ছোট ছোট করে চুড়োকরা চিনি সাজানো। করুণাদেবীর দৃষ্টি ছুঁয়ে ছিল উনুনের ফাঁক দিয়ে গনগনে আঁচে বসানো উজ্জ্বল পেতলের হাঁড়িটার তলায়। লালচে আভায় ঝকঝকে আয়নার মত দেখায় নীচেটা।

—আসিনি বলে কি মরেচি আমি! তোমার কথা কেমনধারা যেন বড় দাদাবাবু! মাইরি বলছি, শ্বশুরবাড়ী গিয়ে মন আমার টেঁকেনা একফোঁটা! মামীর হাতের রান্না না খেয়ে অরুচি ধরে গেল মুখে।—

মাগো! বেহায়া মাগীর কথার কি ছিরি! ধুমসো মিনসের সঙ্গে সমানে বসে ইয়ার্কি দিচ্ছে তখন থেকে—বোগ্‌নো মাজা আর ফুরোবে না এজন্মে! —অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে করুণাদেবী একবার হাঁড়ির ঢাকনাটা সরিয়ে উঁকি দেন ভিতরে—জলটাও ফুটছে না তখন থেকে! গোঁজ হয়ে দাওয়ায় উবু হয়ে বসে নিতাই দাঁতন করছে ত করছেই—ছিঃ! ছিঃ!

—মায়ের কাছে তোর বরটাকেও আঁচলে বেঁধে নিয়ে এলে পারিস—তা হলে ত ল্যাটা চুকে যায়!

হেহেহেহে করে মোটা পুরুষ গলার হাসি গড়িয়ে ঢুকলো রান্নাঘরে।

সৈরীর মা কোন্দল করে শোধ তুলছে তাঁর ওপর ছুঁড়িটাকে পাঠিয়ে দিয়ে। থাকে থাকে বেহায়া ছুঁড়ি পালিয়ে আসে শ্বশুরবাড়ী থেকে হাড় জ্বালাতে। কি করবেন তিনি, মানা করতেও পারেন না। এতটুকু বয়স থেকে মায়ের আঁচল ধরে এসেছে—দিনভোর এ বাড়ীতেই থাকত খেত ঘুমোত, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলা করত—এক রকম বাড়ীর মতই ধরে নেওয়া হত এতদিন। দেখতে দেখতে ডাগর ডোগর হয়ে উঠল। এই সেদিনও মনে পড়ে তাঁর—এতটুকু, কোমরে একফালি ন্যাকড়া জড়িয়ে হাতে দু'গাছ লাল কাচের চুড়ি পরে রান্নাঘরের ঝনকাঠের বাইরে বসে থাকত থাবাগেড়ে

—একমাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া রুক্ষু চুল—ভালটা মন্দটার লোভে নড়ত না সেখান থেকে একঠাঁই—তাঁর মনে হত ওকে মেনী বেড়ালটার মত, জুল জুল করে ওর চাউনী দেখলে।···

আবার এক দমক মস্করার হাসি উপছে এসে পড়ে তার কানে, নোংরা জল ছিটকে এসে লাগলে বীতশ্রদ্ধায় যেমন মন ভরে যায় তেমনি। করুণাদেবী আর নিজেকে সম্বরণ করে রাখতে পারলেন না, চেঁচিয়ে বলে উঠলেন রান্নাঘর থেকে—বলি হ্যাঁ লা সৈরী, বোগ্‌নো মজার নাম করে সারা সকালটা হাসি মস্করা করে কাটাবি! বলি ঢের ঢের কুড়ে দেখেছি—তোর মত এমনটি আর দেখলাম না।—কয়েকটা কঠিন বিশেষণ জোর করে গিলে ফেলেন বলতে গিয়ে। ইচ্ছে করে উঠে গিয়ে ঢুম করে মাগীর গায়ে উপুড় করে দেন গরম জলের হাঁড়িটা—ফোস্কা পড়ে যায় সর্বাঙ্গে—রূপের জলুষ কালো কালো কলঙ্ক রেখায় পুড়ে গিয়ে ছেপে দেয় ছুঁড়ির বেহায়াপানা।

যাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়, সে তাড়াতাড়ি জিভ কেটে বুকের কাপড় টেনে নিয়ে সভয়ে তাকায় রান্নাঘরের চৌকাঠের দিকে। তারপর আশ্বস্ত হয়ে নীরবে একগাল হেসে দাওয়ার দিকে তার নিবিড় কালো চোখ হাসিতে অপরাধপ্রবণ করে মেলে ধরে।

সেখানে নিতাই উবু হয়ে বসে দাঁতন করছিল। বাঁ হাতখানা দু' হাঁটুর উপরে জোড়া করে রেখে উপর থেকে তার দৃষ্টি একনিষ্ঠভাবে দেখছিল সৈরীকে, দেখছিল কতকটা দুধের বাটির দিকে হুলো বেড়ালের মত একাগ্রতায়। মা'র গলার অপ্রসন্ন স্বর কানে পৌঁছতেই সে দাঁতনটা জোরে জোরে ঘষতে আরম্ভ করে, কিন্তু চোখ সরিয়ে নেয় না।

যৌবনের একটা অধ্যায় আছে যখন দেহ হয়ে ওঠে প্রথম আষাঢ়ের মেঘধ্বনির মত বিস্ময়কর এবং নবীন। সে ডাক আকাশের গা থেকে যখন ভেঙে পড়ে মাটিতে তখন পুলকিত রোমাঞ্চের মত শিশুতৃণেরা অমনি জেগে ওঠে, সবুজ আগুন জ্বলে ওঠে মাটির দিগন্ত ঢেকে। তেমনি সৈরীর দেহও যেন ভরে উঠেছিল প্রথম যৌবন সমাগমের চমকানো বিদ্যুতে। সৈরিন্ধ্রী, আলতো উচ্চারণে যা সৈরী—কলতলায় একরাশ বাসনের গাদা নিয়ে মাজতে বসেছিল সকালবেলায়। তার নিটোল হাত নেচে নেচে বেড়াচ্ছিল বাসনগুলোর গায়ে, লাল নীল সবুজ কাচের চুড়ি মসৃণ কালো হাত ঘিরে বেজে চলেছিল, আঙুলের নখে লাল প্রলেপনকে সে সাবধানে ছাইয়ের

স্পর্শ থেকে মুক্ত করে রাখছিল। ঝুঁকে পড়ে বাসন মাজতে মাজতে কখন এলো ঘন চুলের রাশ তার পানের মত কপোল ঘিরে নেমে আসছিল— মাঝে মাঝে ঘাড় ঝাঁকি দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছিল সেই ঘন কৃষ্ণদাম কাঁধের দিকে, মেঘের বুকে বিদ্যুতের মত অমনি এক ঝলক হাসি শুভ্র দাঁতের পাটিতে ঝিকিয়ে উঠছিল তার কালো ঠোঁটের ফাঁকে আর কাজলটানা ভ্রমর চোখের মণিদুটো টলটলে অস্থির কটাক্ষে বিঁধে দিচ্ছিল নিতাইয়ের দৃষ্টিকে। সে কটাক্ষ এক একবার যেন নিবিড় চৈতন্য অবলুপ্তির মত একটা যবনিকা টেনে দিচ্ছিল নিতাইয়ের চোখের পর্দায় - তারপর ফিরতি আরেকটি তেমন বিলোল কটাক্ষের প্রসাদাপেক্ষায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে চেয়ে থাকছিল সে।

সৈরীর এই নবমুকুলোদ্গত রূপের ঝাঁঝ, যা চিটেগুড়ের মত দেহ থেকে পৃথক করা যায় না, প্রলুব্ধ করছিল নিতাইকে। তার চোখ বারে বারে লেহন করছিল তার পায়ের নখ থেকে শুরু করে সর্বাঙ্গ। ঘোমটা খসা ঘন কেশরের মত নিবিড় চুলের ঢেউ যেখানে ভেঙ্গে পড়েছিল পিঠে একরাশ বিষভরা কালো সাপের মত, পিঠ থেকে ব্লাউজের নীচে খুলে থাকা একফালি বলিষ্ঠ ক্ষীণ কটিদেশের রেখায়, সেখান থেকে কাপড়ের আঁটসাঁট বাঁধনে জেগে ওঠা সুডোল উরুর দাগে। কাজ করতে করতে আঁচল খসে কখন পড়ছিল বুক থেকে, সস্তা ছিটের তৈরী ব্লাউজের গলায় লাল নীল হাতে ফুল তোলা কারুকার্য মালার মত ফুটে উঠছিল। বুকের কাপড় তুলে দিতে ভুলে থাকছিল সৈরী অনেকক্ষণ। নিতাইয়ের চোখ তখন অবাধে চলে বেড়াবার ছুটি পেয়ে সৈরীর দেহের প্রত্যেক ভাঙ্গনে ভাঙ্গনে এসে স্থির হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। যেখানে চোখ পৌঁছয় না বা পৌঁছান উচিত নয়, তার দৃষ্টির বেআব্রু হাঁক যেন সেখানেও অধৈর্য তাগিদে আবরণ খসিয়ে নিতে চাইছিল।

হঠাৎ সৈরী কথা বন্ধ করে মুখ তুলে চাইল নিতাইকে পেরিয়ে—। ক্ষণিকের এই ছন্দভঙ্গে নিতাইয়ের ভ্রূ তড়িৎ আঘাতের মত জট পাকিয়ে যায়। সে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সৈরীর দৃষ্টি অনুসরণ করে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিল শান্তনু। শেষ ধাপে নেমে তার চোখ এসে পড়ে সৈরীর দিকে, তার হাঁটুর উপরে তোলা শাড়ীর মধ্যে ফুটে ওঠা উরুর ইঙ্গিতের দিকে—তার রূপ যা মনে হয় চকমকি ঠুকে একটি স্ফুলিঙ্গের স্পর্শে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে।

একটা প্রচণ্ড আকর্ষণ। যেমন অন্তরীক্ষ থেকে উল্কাশিলাকে ভূ-কেন্দ্রের

দিকে টেনে নামায়—তেমনি শান্তনুর রক্তধারাকে তার শিরা উপ-শিরায় বেগে ধাবিত করতে থাকে। কয়েক মুহূর্ত সে পাথরের মত দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখতে থাকে সেদিকে। পরক্ষণেই তার চোখ এসে মেলে সৈরীর চোখে। সৈরীর দৃষ্টিতে রূঢ় ইঙ্গিত ফোটে, যেন একই সঙ্গে তার অপূর্ণতা, অক্ষমতা আর পৌরুষকে আবাহন করে সে মধুর ব্যঙ্গে। সে যেন শিকারী ব্যাধের চোখে ধরা পড়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে থাকে। তার সম্বিতহারা দৃষ্টিকে ফেরাতে পারে না। কতক্ষণ এমনি হতবুদ্ধির মত সে দাঁড়িয়ে থাকত তা সে নিজেও জানত না।

মৃদু গলায় সৈরী বলে উঠল—কি ছোড়দা, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

চমকে উঠে শান্তনু অনুভব করে পাশ থেকে আরেক জোড়া চোখও তার দিকে চেয়ে প্রশস্ত হয়ে ছিল। যন্ত্রের মত সে মুখ ফিরিয়ে তাকায় সোজা নিতাইয়ের চোখে। সে যেন মুহূর্তে কুঁকড়ে যায় তাপ লাগা জীর্ণ পাতার মত। নিতাই তার দিকে চাইছিল সেই চোখে যেমন সম্ভোগরত মানবযুগল কোনো কুতূহলী চতুষ্পদের দৃষ্টির প্রত্যুত্তরে চায়।

কুঁকড়ে যায় সে। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর কণায় তার দেহটা যেন তাদের উদ্ধত পর্যবেক্ষণের সামনে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ভেঙে পড়ে। মুখ নীচু করে সে নেমে যায় কলতলায় মুখ ধুতে। উপরে বিষণ্ণ মেঘভার আকাশ যেন আড়ালে সরে থাকে—মুখ তুলে চাইতে পারে না সে। কলতলায় সৈরীর পাশ দিয়ে চৌবাচ্চাটার দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে তার পা কেঁপে যায়, টাল সামলাতে না পেরে টলে পড়তে পড়তে কোনোরকমে সামলে নেয় নিজেকে।

—আহা-হা! ও জায়গাটা পেছল যে, সাবধানে যেতে হয়!—সৈরী মৃদু হেসে সমবেদনার গলায় বললে। তার মনে হয় তার গলায় কপট স্বর প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ করে তার দৈন্য লক্ষ্য করে। মুখে জলের ঝাপটা দিতে গিয়ে শান্তনু অনুভব করে মুখটা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, ঠাণ্ডা জলের স্পর্শে শির শির করে ওঠে গা।

হঠাৎ বুক দমিয়ে দেওয়া একরাশ শঙ্কার মত তার মনে হয়, কলতলায় তারা তাকে কৌতূহলভরে দেখছে। তাদের চাউনীর উগ্রতা আর নির্লিপ্ত অবজ্ঞা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে, তার ঝুঁকে থাকা শরীরের পিছলে যাওয়ার ভঙ্গীতে, তার শরীরের প্রত্যেকটি অংশকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তারা মেলাচ্ছে একটা পশুর সঙ্গে। এই পশুর মধ্যে তার আকাশে মুখ তুলে চাওয়া প্রাণ

স্তম্ভিত হয়ে ছিল, মাত্র কয়েকটি ক্ষণ আগে তা ভেসে চলেছিল কল্পলোকের তীর ধরে—বিদ্ধ জীবটার মধ্যে তা এখন ছটফট করছে।

মুখ ধুয়ে উঠে এল সে রান্নাঘরে। করুণাদেবী চা ছেঁকে অন্যমনস্কভাবে একটা পেয়ালা ঠেলে দিলেন তার দিকে। পেয়ালাটা কুড়িয়ে নিয়ে একটু দাড়িয়ে রইল সে। কিন্তু করুণাদেবীর নিরবকাশ মুখচ্ছবিতে কোনো রেখা সরে না। তিনি বাইরে থেকে আসা কথাগুলো গভীর আগ্রহ আর বিতৃষ্ণায় শুনছিলেন।

দরজা দিয়ে বিপন্ন মন নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল শান্তনু। তাড়াতাড়ি গলিটা পেরিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে হাঁটছিল সে। আকাশ আসন্ন বর্ষণের নম্রতায় ঝুঁকে রয়েছিল সহরের বুকে। লোক চলাচল তাই আরও বিরল ছিল। সে তাড়াতাড়ি হেঁটে চলে কিছু না দেখে, যেন ভিতরে কোন অধিবাসীর তাগাদায় কিছু থেকে পালিয়ে যেতে চাইছিল। সে পিছন ফিরে চাইছিল না, সামনেও না। তার বিশ্বাস, কোনরকমে এলোমেলো কয়েকটা রাস্তার সীমা পার হয়ে যেমন হারিয়ে যায় রোজ তেমনি হারিয়ে যেতে পারলে একটা আপাতমুক্তির অবকাশ তার জুটবে। তার পা অননুভূত পদক্ষেপে পড়ছিল রাস্তার পিঠে। সৈরীর চাউনী তাড়া করে নিয়ে চলে তাকে কুকুরের মত, নিজের মনের বিস্তীর্ণ পথ দিয়ে তাড়া খাওয়া জানোয়ারের মত সে ছুটে চলে সোজা। তাকে রেহাই দেয় না তার অবজ্ঞাহত প্রাণ, ছুটিয়ে নিয়ে চলে পথ থেকে পথে। বর্ষার প্রচ্ছন্ন ধূসর আলো ঢেকে থাকে সহরের সার সার স্থির বাড়ীগুলোর ছবিতে। একটুখানি আড়ালের জন্য প্রাণপণে সে হাঁটে একাকী।

কিসের উদ্বেগ তাকে তার নিভৃত একাকীত্বের মধ্যে তিষ্ঠতে দেয় না সে প্রশ্ন সে জিজ্ঞাসা করে না। হয়ত পথ থেকে পথান্তরে ছড়িয়ে পড়তে চায় সে। যে তীব্র অনুভূতি তার জীর্ণ দেহের প্রকোষ্ঠে বন্ধ করে রাখা দুঃসহ ব্যথার মত তাকে পথের গতিস্রোতে ছড়িয়ে শূন্য হতে চাইছিল সে। শূন্য গাঢ় আকাশের পটে মেঘের প্রান্তরেখা বিলুপ্ত, একটানা একরঙা চাদরের মত ছড়িয়ে ছিল আকাশ, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির কণায় আবহাওয়া ভরে উঠেছিল। দিনের চোখ ম্লান হয়ে আসে, অস্পষ্ট ঝাপসা অশ্রুভারের মত জল ঝরতে থাকে আকাশ থেকে। দুধারে বাড়ীগুলো দেখায় ছোপ দিয়ে

আঁকা ছবির মত। দু' একটা কুকুর বৃষ্টি থেকে সরে যায় ফুটপাথ ছেড়ে। ঝাপসা হাওয়ায় অণু অণু জলের ফোটাগুলো মাঝে মাঝে হেলে পড়ে একসার কাঁপা সুতোর মত, জমে জমে তার শুকনো চোখের পাতা ভরিয়ে তোলে।

অন্যমনস্ক হয়ে সে হেঁটে চলেছিল। একটা গাড়ী-বারান্দার নীচে দাঁড়ানো দুটো নিশ্চল মূর্তি ঐকান্তিকতাহীন চোখ তুলে দেখছিল আকাশ। একটা থামের গায়ে সাদা রং করা চৌকো টিনের নিশানায় বাস দাঁড়ানোর সংকেত লেখা। কখন তার পা দুটো ধীরে থেমে দাঁড়িয়েছিল সে জানতে পারে নি। তার চোখ কৌতূহলহীন ভাবে চেয়ে থাকে টিনটার দিকে একদৃষ্টে। চারিপাশের অন্য আকারগুলো সরে যায়, মনে হয় একটা তন্ময়তা নেমে এসেছিল তার মধ্যে। হয়ত তেমনি ভাবে সে দাঁড়িয়ে থাকত আরও কিছুক্ষণ, একটা বৃষ্টিঝরা অস্পষ্ট দিনের আলোয় দেখা নিশানার দিকে তাকিয়ে। কিন্তু সে যেন হঠাৎ অনুভব করতে পারে, তার দাঁড়িয়ে থাকা সম্পূর্ণ একলা নয়। সে অজ্ঞাতে চোখ নামিয়ে আনে, থামটার গা বেয়ে রাস্তায়। তার বিশ্বাস হয় না। মনে হয় চলতে চলতে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, আবার জেগে উঠেছে। সব গতিময়তা থেমে গেছে চারিপাশে তার। কেবল বৃষ্টির ফোটাগুলো ছাড়া। তারা এত অগুনতি রাশিতে এত নিঃশব্দতায় ঝরছিল যে আরও অপ্রাকৃত হয়ে থাকে চারিদিক—তার দাঁড়িয়ে থাকা, থামের গায়ে স্থির ঝোলান টিনটা, রাস্তা। আর মেয়েটির আকৃতি, যা মনে হয় অভাবনীয়। চোখাচোখি হতেই মেয়েটি একটু চমকে ওঠে। তারপর সামান্য দ্বিধার একটা অস্পষ্ট আভাস মনে হয় বিলম্বিত করে একটা বিচ্ছিন্ন মুহূর্তকে। সে ভাব ঢেকে সে বলে—নমস্কার!—শান্তনুর কানে অনেক দূরান্ত থেকে শব্দটা এসে পৌঁছয়। একটা বাদামি কাপড়ে ঢাকা ছোট ছাতার আড়ালে হাত দুটো তুলে মেয়েটি নমস্কার করে। সে ঠিক করতে পারে না কেমন করে প্রত্যভিবাদন করবে। বৃষ্টির ঝাপসায় একটা ছোট অকিঞ্চিৎকর মূর্তি মনে হয় বাস্তবাতিরিক্ত। দুটো নিস্তব্ধ চোখের দৃষ্টি দেখায় স্পর্শাতীত।

একবার রাস্তার দিকে চেয়ে মেয়েটি বলে—দেখেছেন, আজও বাসের দেখা নেই। আর সকাল থেকে কেবল বৃষ্টি। সেদিনও এমনি দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল কতক্ষণ। কেউ বেরোয় না নিশ্চয়ই এমন দিনে—

সে আবার দেখে সামনের দিকে তাকিয়ে থেকে। ধীরে ধীরে শান্তনু যেন উপলব্ধি করে তার চারিপাশের বাস্তবকে। তার কুণ্ঠা যেন সরে যায় মন থেকে।

মনে হয় সেও কিছু বলে। অনেক কথা শব্দের আকার ধরে ফুটে উঠতে থাকে ভিতরের একটা পর্দায়, তাদের ঝঙ্কারে তার সমস্ত জীর্ণ দেহ বেজে ওঠে। সময়টা দীর্ঘ হয়ে সেতুবন্ধের মত জুড়ে যায় এক দ্বিপ্রহরে। একটা রৌদ্রজ্বলা দ্বিপ্রহর আর তার চোখের উপরে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। মধ্যের কাল বিস্মৃত হয়। মনে হয় এই সময়টাই আগাগোড়া বর্তমান ছিল—মাঝে তার জেগে ওঠা একটা সুড়ঙ্গের অন্ধকার ছায়ায় মিশে থাকে। তার মুখের আড়ষ্ট রেখাগুলো মিলিয়ে আসে কোমলতর হয়ে। অন্যগুলো ঢাকা পড়ে যায় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির রেণুতে।

—অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন আজকেও? রোজই এখানে দেরী করে বাস আসে। কিন্তু অন্যদিন ত আপনি আসেন না?

সে চমকে ওঠে। কি করে শব্দগুলো বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে সে বুঝতে পারে না। তার গলার স্বর সে নিজেও চিনতে পারে না—এত সহজ তার সুর। একটু হেসে মেয়েটি তারদিকে ফিরে তাকায়—রোজ এখান থেকে উঠিনে। কোন কোনদিন দুপুরে ক্লাস থাকলে এদিক দিয়েই যাই। হাতে সময় থাকে—তা ছাড়া অনেকটা কাছে।

—আজও বুঝি ক্লাসে যাচ্ছেন?

মেয়েটি বিব্রত হয়ে তাকায়। কথাটার অসমীচিনতাকে এড়িয়ে গিয়ে সে বলে—না আজকে রবিবার। আজ ত আমার ক্লাস নেই।— অসঙ্গতিটার উল্লেখ করতে তার মুখে একটা সঙ্কোচের ছায়া এসে পড়ে। তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে।

শান্তনুর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। সে অনুভব করে দুর্মদ একটা ভুল তার অসাড় ঠোঁট দুটোতে ভুল শব্দটাই এনে দিয়েছে। কথার অসঙ্গতির চেয়েও সেই অজানা আড়াল থেকে যে দুর্নীরিক্ষ্য ভুলের হাত তাকে সব সময় ঠেলে দেয় একটা গহ্বরের দিকে তা যেন আবার জেগে ওঠে। মুখ থেকে রক্তের শেষ আভা সরিয়ে নিয়ে যায় তা। সে সুন্দর এক স্বপ্ন-ঘুমে হেঁটে যেতে যেতে একটা খাড়া পাড়ের দিকে ঝুঁকে রয়েছে—নীচে গভীর অন্তহীনতা, তার তল দেখা যায় না। আকণ্ঠ শুকিয়ে ওঠে তার। প্রাণপণে সে ফিরে যেতে চায় কয়েক মুহূর্ত আগেও সেই অবাধ নির্ভরতার সীমায় যা দূর থেকে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তার শক্তি যেন নিঃশেষে ফুরিয়ে গিয়েছে, তার দুর্বল দ্বিধা কুণ্ঠিত মন যেন আরও প্রচণ্ড বিক্রমে মাথা উঁচু করে।

মন্ত্রের আড়ালটা সরো সরো হয়ে থাকে। ফাঁক দিয়ে তার প্রাত্যহিক অনপনেয় নিস্ফলতা আবার চেয়ে দেখে। মনে হয় একটা পরম মুহূর্ত এসেও পিছলে পড়ে যেতে চায় আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে। ডুবন্ত মানুষের মত প্রাণপণে আপনাকে সে উদ্ধার করার চেষ্টা করে তার খর্বতার চোরাবালি থেকে। একটু হাসি যা এমন সময় অনেক কিছু দৈন্যকে ঢাকতে পারে কোন মতেও তার ঠোঁটে ফুটে উঠতে চায়না। মর্মান্তিক প্রয়াসে তার ঠোঁটের রেখাগুলো বিকৃত হয়ে ওঠে। যেন আপনার গহনে কোন এক অমানুষিকতাকে দেখে সে আঁৎকে উঠেছে—তার ভেসে ওঠার আশা ক্ষীণতর হয়ে মিলিয়ে যায় ধীরে ধীরে। সে কথা বলতে চায়, কিন্তু অনুভব করে তার সারা দেহ কণ্টকিত হয়ে উঠেছে। ঠোঁট দুটো শব্দহীন কিছু আউড়ে চলে যা সে নিজেই শুনতে পায় না। তাদের কয়েক হাত ব্যবধানের মাঝে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির ফোটাগুলো এসে তার মুখের দাগ ঢেকে রেখেছিল। মেয়েটি তাই দেখতে পায় না সে দাগ-গুলো, কিন্তু তবু তার মনে হয় অস্বাভাবিক পাণ্ডুর দেখতে তা—গলার স্বর শোনায় অস্পষ্ট ফিস ফিস শব্দের মত। রাস্তা থেকে চোখ সরিয়ে এনে সে বলল, —তাইত, এই বৃষ্টির মধ্যে কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকা যায়! সারা বর্ষাটাই শেষে মাথার ওপর দিয়ে সমস্ত জল ঝরিয়ে থেমে যাবে। জলে ভেজাই সার হবে।—কথার শেষভাগটা তার এক টুকরো হাসিতে ভেঙ্গে পড়ে। —তার চেয়ে বরং চলুন একটু হেঁটে এগিয়ে যাই ওদিকে, ট্রাম পাব।—সে তাকাল চোখ তুলে।

শান্তনু অনুভব করে পরিত্রাণের মত কিছু। সে একটা হাত অনির্দিষ্ট ভাবে তুলে দেখায় সামনের পথের দিকে। তারা হেঁটে চলে। আবার ছন্দটা বাজে তার মনে। বৃষ্টির নীরব পতনের মত। পায়ের প্রতি পদক্ষেপে অপরি-বর্তনীয় সময় পিছিয়ে যায়। সে সব কিছুকে পিছনে রেখে চলে আসতে পারে। তার কানে কোন শব্দ স্পর্শ করে না, কেবল বৃষ্টির শব্দ ছাড়া। তার ফিস ফিস ঝরার শব্দই যেন পৃথিবীতে শোনা যায়। আকাশের দিকে তাকিয়ে সে দেখে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির ফোটাগুলো ভাসতে ভাসতে এসে জড়িয়ে যায় তার শরীরে। তাদের নিঃশব্দতা ছড়িয়ে পড়ে বুকে। তার পাশে হেঁটে চলা মেয়েটির মুখের দিকে একবার তাকায় সে। তার চোখে একটা অদ্ভুত আলো ঝুঁকে ছিল, যেন সেই কাজলের মত দিনের ছায়ায় মিশে তার চোখে হারিয়ে থাকে। কোন কিছুকে স্পর্শ করে না সে দৃষ্টি।

শান্তনুর মনে হয় না এই সময়টার গোড়া শেষ কোথাও নিহিত হয়ে থাকতে পারে। যেন তা এই বাদলের ছায়া-মুহূর্তগুলোর গ্রন্থিতে কুঁড়ির মত গাঁথা। সে বিস্মিত হয়ে থাকে মনের ভিতরে—চলতে চলতে একবার পার্শ্ববর্তিনীর দিকে ফিরে বলে কেন তা সে ভেবে পায় না—

—কই বৃষ্টি ত পড়ছে না—মেঘগুলোই যেন নেমে এসেছে মাটির কাছে।

মেয়েটি চলতে চলতে চোখ তুলে তাকায় ধোঁয়া ধোঁয়া আকাশের মেঘসম্পৃক্ত ডানার দিকে—তার অশ্রুভার বিধুর ছবি মনের সঙ্গোপন থেকে একাকী চেয়ে থাকে। যেন অনেক কথা থেমে গিয়ে ভার হয়ে ওঠে হৃদয়। মুখ নামিয়ে শান্তনুর দিকে ফিরে বলে—বৃষ্টিতে এমন হেঁটে যাওয়া কি সুন্দর! কেমন অস্পষ্ট হয়ে যায় সবকিছু যা অন্যদিন চোখে লেগে থাকে, দেখা যায় না। চোখের সামনে একটা পর্দার মত টাঙ্গানো—বলতে বলতে সে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে চুপ করে থাকে। তার মুখে কি একটা অবোধ্য করুণ ছায়া এসে পড়ে, ঝাপসা আলোয় তার রেখাগুলো পরিস্ফুট বোধ হয় না। কোন ভাবনায় মগ্ন হয়ে থাকে তার চোখ দুটো, জানলা দিয়ে একফালি রোদ এসে মেঝেয় পড়ার তন্ময়তার মত। কিন্তু শান্তনু তা দেখতে পায় না। সে তার নির্জনতাকে হারিয়ে আবার খুঁজে পেয়েছিল। সেখানে সমস্ত মন নিরুৎসুকে চেয়ে থাকতে পারে। অভূতপূর্ব স্বাদ সেই থেমে থাকার, যদি এক দীর্ঘ লয়ে বেজে উঠে সেই রাগিনী ফুরিয়েও কেবল শব্দহীন গুঞ্জরণে বেজে চলত চিরসময় ধরে। রাজপথ শূন্য করে ঢেকে ছিল অযুত জলকণার রাশি, নিঃশব্দ স্পর্শের অনুভূতি রেখে নেমে আসছিল বাতাসের গায়ে ভেসে। আর স্তব্ধ হয়ে বেজে চলে সেই রেশ, থেকে থেকেও মনে হয় কোন সীমাহীনকে ছুঁয়ে রয়েছে।

কখন রাস্তাটা এসে জুড়ে যায় জন-চলাচলে মুখর অন্য এক পথে। ছাতি মাথায় লোকজন হনহনিয়ে চলে ফুটপাথ বেয়ে। রেস্তোরাঁ থেকে রেডিওতে খবর শোনায়। সে চমকে জেগে ওঠে। বৃষ্টির কাদা ময়লা জল ছড়ানো পথ আওয়াজে গম গম করে। বলিষ্ঠ পশুর মত সহরের পেশীগুলো সঞ্চালিত হয়। হঠাৎ সে যেন সরে যেতে থাকে, দুর্নিবার স্রোত ক্রমাগত পিছিয়ে নিয়ে চলে তাকে, হারিয়ে দেয় একটা আবর্তে। একটা ট্রাম এসে দাঁড়াতে মেয়েটি ফিরে বললে—আপনি যাবেন না?

—আমি?—না, কোথাও যাব না—এমনিই হেঁটে যাচ্ছিলাম।—

বিস্মিত হয়ে তাকায় মেয়েটি উঠতে উঠতে।

—নমস্কার।—আবার নিশ্চয়ই দেখা হবে।—

হাতটা তুলে সে নমস্কার করতে যাচ্ছিল। সে দেখে মেয়েটিকে উঠে যেতে—তার ঠোঁটের কোণে হাসির একটা আভাস জনস্রোতের ছবিতে মুছে যায়। সে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চারিপাশে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখে। একটা দোকানের প্রকাণ্ড আয়নায় রাস্তার বহমান ছবি ফুটে উঠেছিল। তার প্রতিবিম্বটা জেগে ওঠে আয়নার কাচে। সে চেয়ে দেখে। বীভৎস পাংশু দেখায় তার মুখ, জ্যোতি-হীন আঁচড় কাটা চোখের মণি। চুল এলোমেলো খাড়া খাড়া হয়ে আছে আর মুখের রং জলের ধোওয়াট লেগে ভিজে চামড়ার মত কালচে হয়ে উঠেছে—কাঁধ থেকে ছেঁড়া ন্যাকড়ার মত ঝুলছে সার্টটা।

—কি বাবু; কেয়া মাঙ্গতা?—উপরে উপবিষ্ট হোঁৎকা মত একজন হিন্দুস্থানী ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করল। আরও তিন চারজন কথা বন্ধ করে চাইছিল তার দিকে। চমকে উঠে সে সরে আসে দোকানের সামনে থেকে।

—সুরত দেখতা হায় রে—আপনা সুরত!—কুৎসিত হাসি পানের ছোপ দেওয়া কাল ঠোঁটগুলোয় মুচকে ওঠে। সে শিউরে উঠে ভীত জানোয়ারের মত এলোমেলো রাস্তা ধরে দ্রুত এগিয়ে চলে।

আট

—মা মাগীর গতর পড়ে আসছে—মিথ্যে কথা। ধুমকেতুর মত ছুঁড়িটা এসে যখনই পটেয় দাঁড়িয়ে সুর করে বলল—মায়ের কোমরে ব্যথা, আজকে আমি এলুম গো!—ওর মুখ দেখে ধরে ফেলেছিলেন করুণাদেবী যে পেটে শয়তানী বুদ্ধি নিয়ে ছুঁড়ি আজ এ বাড়ি এসেছে। বাসন-কোসন মেজে তুলে দিয়ে সৈরী এসে বসল দোরগোড়ায় একটা কবাটে ঠেস দিয়ে। তিনি আর না বলে পারলেন না—

—তুই যে শ্বশুরবাড়ি ছিলি মায়ে বলল—

—হ্যাঁ গো, শ্বশুর বাড়ী থাকলে কি আর বাড়ী আসতে নেই মামী? কতদিন বাদে এলুম, তোমার এখানে মাইরী বলছি না এলে প্রাণটায় শান্তি পাইনে।—

তা তো পাবেই না বিটি—মনে মনে বললেন করুণাদেবী।

—যাক, এসেছিস ভালই করেছিস—খবর ভালো তোর শ্বশুরবাড়ীর?

—আর ভাল মামী—,আমাদের গরীব লোকেদের ভালমন্দ অতশত আর বুঝিনে।—জবাব দিল সৈরী। একটু থেমে যেন চকিতে কিছু মনে পড়ায় হঠাৎ চোখ তুলে বলল—মামী, শুনলুম নাকি তুমি তীথ্যে বেরুবে, বলছিল মায়?

মনে মনে জ্বলে ওঠেন করুণাদেবী। তীর্থে বার হ'লে বড় সুবিধে, বাড়ী বসে ছেনালি করার কোন বাধাই আর থাকবে না। বড় অসুবিধে হচ্ছে তিনি থাকায়। ভুরু কুঁচকে বললেন—তীর্থে গেলে তুই বুঝি ভাত রেঁধে খাওয়াবি?

—ওমা ছি—সে কি গো, আমরা হলুম গে শূদ্দুরের জাত, তোমাদের হেঁসেল কখন ছুঁতে পারি!—বলেই হেসে আবক্ষ হেলিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে সৈরী কতকটা বেড়ালের মত আদুরে গলায় বলল—মামী তীথ্যে গেলে আমিও যাব কিন্তু তোমার সঙ্গে বলে দিচ্ছি। ছোটবেলা থেকে তোমাদের বাড়ীতে মানুষ হলুম, ফেলে যেতে পারবে না।

আশ্চর্য হয়ে আড়চোখে চেয়ে দেখলেন করুণাদেবী। মেয়েটার মুখে কি

কি কপট রেখা গুপ্ত ছিল ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। একটু চুপ করে যেন বুঝতে না পারার ভাণ করে বললেন—

—বলিস কি—সোয়ামী ঘরদোর সব ফেলে যাবি? কোলে কচিকাচা নেইই না হয়—তাই বলে এই বয়সে তীর্থে যাওয়ার ইচ্ছে করাও পাপ! এমন ডাগর বয়স তোর! তীর্থে যায় লোকে সব আশা আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে ঠাকুরের পায়ে শেষ দিনকটা সঁপে দিতে। এখন কখনো ঘর বাড়ী ছেড়ে—

—আ দেখ না, ছোটলোকের আবার ঘর বাড়ী! বলে তোমার চরণ দুখান যেখানে রাখবে মামী সেখেনেই ত ঘর আমার! সে হবে না কিন্তু—আমি যাবোই—বলে সৈরী একরকম ললিত ভঙ্গিতে ঘাড় বেঁকিয়ে মিট মিট করে চাইতে লাগল তাঁর দিকে।

তীর্থে যাওয়ার বাসনাটা বরাবরই মনে হত তাঁর যেন অন্য কোনো পক্ষের তাগিদই ছিল তাতে বেশী। তাই সে কথার উল্লেখ হলেই মনটা কেমন অকারণে সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। তবে চিন্তাটা যে মাঝে মাঝে তাঁর মধ্যে ঘুরে ঘুরে আসত না তা নয়। কখন মনে হয় তীর্থে যাওয়াটা উপলক্ষ, যার কাছি ধরে এখনও অনেকগুলো আশা আকাঙ্ক্ষা চোখ মেলে চায় সহসা। দীর্ঘ জীবনে ছেদ পড়ে থেমে থেমে যাওয়া ছবিগুলো পুনরাবর্তিত হয়। তবু ছুঁড়িটার নির্লজ্জ বেহায়াপনার সঙ্গে তীর্থভ্রমণের বাসনাটা একান্ত অসঙ্গত অসহ্য ঠেকে তাঁর। মনে মনে কিঞ্চিৎ উষ্ণ হয়ে বলে উঠলেন—

—হ্যাঁ গেলেই হ'ল আর কি! কপালে না থাকলে আবার তীর্থধর্ম। এই বাড়ীতেই দেখিস একদিন হাড় কটা জুড়োবে।—হঠাৎ কি একটা মনে হতে করুণাদেবী সৈরীর দিকে একটু ক্রুরভাবে চেয়ে বললেন—

—তা কোন কোন তীর্থ করতে প্রাণ চায়, শুনি ত বাছা তোর মুখে একবার?

—বৃন্দাবনে মামী—উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ফেলে সৈরী—মামী বড় সাধ একবার বৃন্দাবনে যাই। জান মামী আমার ছোট বয়সে কেমন সোন্দর গলা ছিল। এক বৈরেগী বাবাজী গান শুনে বলেছিল—তুই আমার সাক্ষেৎ শ্রীমতী রাই, এমনতর গলা তোর—চল্ আমার সঙ্গে বৃন্দাবনে, রাধারাণীর দাসী হয়ে থাকবি। সেই থেকে জান মামী ক্ষ্যাণ ক্ষ্যাণ আমার প্রাণটা কেমন উদাস করে ওঠে। বাপের জন্মে কোনদিনে বৃন্দাবন যাই নি—তবু মাইরী বলছি মামী,—মনে হয় একবার সেখানে গিয়ে পড়লে দেখব স—ব—আমার চেনা।—

বলতে বলতে তার মুখে কি এক ভাবের ছায়া সত্যিই ছড়িয়ে পড়ে—আনমনে সজল আকাশের দিকে চেয়ে গুনগুন করতে থাকে সে।

করুণাদেবী আনাজগুলো কড়াইতে ছেড়ে দিয়ে খুন্তি নাড়ছিলেন। গরম তেলে কাঁচা জিনিষ ছ্যাঁক করে একরাশ বাষ্পকে ছুড়ে দেয় উপরে, তীব্র ঝাঁঝ লেগে মুখের রেখাগুলোকে কুঞ্চিত করে তোলে। তিনি সৈরীর ভাবাপ্লুত মুখটা পিছন ফিরে থাকায় দেখতে পান না—কথাগুলো শুধু কানে এসে ঢোকে। আনাজগুলো নেড়ে চেড়ে জল ঢেলে দিয়ে যখন তিনি মুখ ফিরিয়ে তাকালেন তখন সৈরীর ভাবঘোর তন্ময়তায় তিনি যেন পড়লেন অন্য কিছু– যেন তার কাজলপ্রেক্ষিত আঁখিপল্লবে যে জলবিন্দু চকচক করছিল মনে হ'ল তা নকল কাচের পুতি সাজানো।

—রসের সায়রে ভাসছেন!—মনে মনে ভাবলেন তিনি। একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে গলার সুরে পরিহাস টেনে এনে বললেন—তা বৃন্দাবনে গেলে তোর একটি কেষ্ট ঠাকুরও জুটে যাবে, যা বলিস বাছা—

—মাগো, কি বিচ্ছিরী মুখ তোমার মামী—কপট ক্রোধের সুরে বলল সৈরী—কেন কেষ্ট ঠাকুর কি আমার নেই?

—কটা আছে তাই জানতে চাইছিলুম লা—

—ধ্যেৎ! তোমার মন বড় খারাপ, মাইরী বলছি—বলে সৈরী সত্যিই আরক্ত হয়ে উঠে মুখ ফিরিয়ে নিল। রুষ্ট ভীমরুলের মত তার ঘাড়টার দিকে চেয়ে কৌতুক অনুভব করেন করুণাদেবী।—

মেঘ ঢাকা বেলার সূর্য এসে দাঁড়িয়েছিল শিয়রের উপর। দু-চারটে মৃদু কথার আলাপনে সময় মৃদুমন্দ বয়ে যায়, তিনি জানতে পারেন না। হাজার হোক মেয়েটার প্রতি তাঁর একটু স্নেহেরও কোণ সদা নিভৃত থাকে। চোখের সামনে বসে থাকলে ততটা অস্বস্তি লাগে না, বরং কথা বলে মনটা একটু হাল্কা ঠেকে। খানকয়েক ফুলুরি ভেজেছিলেন—হাতে চারটে তুলে নিয়ে আলগোছা বাড়িয়ে ধরলেন সৈরীর দিকে—আহা খাক—শিশুকালে যেমনটি দিতেন—মনে পড়ে তাঁর।

—নে এ দুটো মুখে ফেলে দে। তারপর চাল কটা একটু বেছে ধুয়ে দে ত মা—জল গরম হয়ে গেলে ছেড়ে দি।—তাঁর স্নেহসিক্ত গলা শুনে মুখ ফিরিয়ে তাকাল সৈরী। হাতে পড়া মাত্র ফুলুরি চারটে সে বিনা দ্বিধায় পর পর মুখে ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলল। করুণাদেবী আড়চোখে

তার খাওয়ার ভঙ্গী দেখে হাসি চেপে রাখেন কোনোমতে—ছুড়ি রাক্ষস! ওই খিদে নিয়েই তিথধর্ম কপালে আছে ওর।

—মামী—ছোটদা এই বাদলায় হন্‌হনিয়ে বেরোলো কোথায়!—সৈরী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল তাঁর দিকে চেয়ে। করুণাদেবীর মুখের ভাব বদলে গেল। নিরুৎসুক গলায় বললেন—কি জানি কোথায় গেল! কোথায় যায় না যায় তা ত আর জানায় না—।

—দেখ দিকি, এই বর্ষায় ছাতাও নেই, ভিজতে ভিজতে বোধহয় বন্ধুর বাড়ী গেল—

—বন্ধু না চুলোয়। নে দেখি এগুলো সেরে ফেল, পরে কথা বলিস!—

হাত ধুয়ে চালের কুলোটা এগিয়ে নিয়ে সৈরী খুদ বাছতে লাগল।

—বন্ধুর বাড়ীই গেছে বোধহয়।—

—কোথায় ওর বন্ধু—ত্রিসংসারে ওর একটা আলাপী লোক নেই। একা একা টো টো করে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, কতদিন দেখেছে নিতাই।—

—আহা কেন এমন ধারা।—বন্ধু নেই বান্ধব নেই একলাটি ঘুরে বেড়ায়। যা বল বাপু—লোক কিন্তু ছোড়দা ভাল মানুষ একধারা—

—হুঁ।—চুপ করে রইলেন তিনি। তাঁর মনেও এই প্রশ্ন যে না জাগে তা নয়। বাপের গুণ ষোল আনাই বর্তেছে।

—ও মা—মাগো—হাঁক ছেড়ে নিতাই এসে দাঁড়াল চৌকাঠের ওধারে। –

—কই, বাজারের থলেটা দাও দিকি—দেরী হয়ে গেছে ঢের—

—এই এত বেলায় বাজারে কি ছাই পাবি যে যাচ্ছিস্।—ছেলের মুখের দিকে অসন্তুষ্ট দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন করুণাদেবী।

—আহা কত কাজ সকাল থেকে করলাম দেখলে না ত। আর রবিবার এমন কি আর একটা বেলা বেশী হল—

—কাজ ত ভারী—ঘণ্টা ভোর দাওয়ায় বসে দাঁতন করলি—মনের জমা উষ্মা উগরে ফেলে তবে একটু স্বস্তি বোধ হল তাঁর।

—কেন দেরী হয়ে থাকে ত শান্তকে পাঠালে না কেন বাজারে। গায়ে শার্ট চড়িয়ে বাবু হাওয়া খেতে বেরিয়ে গেলেন বোধহয়—।

—হ্যাঁ তাকে বাজার করতে দিয়ে উপোস করে থাকি গুষ্টি শুদ্ধ—। তোর যেমন কথা—

—ওটা একেবারে মনুষ্যত্বহীন—আজ কলতলায় মুখ ধুতে এসেছিল—দেখছিলুম আর আমার কেবলই বিশ্বেস হচ্ছিল—

কথাগুলো শুনতে শুনতে সৈরী খেই হারিয়ে ফেলে। অন্যমনস্ক হয়ে সে ঝুঁকে পড়ে খুদ বাছছিল। ঝুঁকে পড়া মুখখানির আংশিক ঢেকে ঘন কালো চুলের একগোছা নেমে এসেছিল গালের উপর। হঠাৎ কথা বন্ধ করে নিতাই হাঁ করে তাকিয়ে রইল সেইদিকে। এক মুহূর্ত ঘরটায় একটা আড়ষ্ট নিস্তব্ধতা জেগে রইল নিতাইয়ের গোগ্রাসে চাউনির সঙ্গে।

করুণাদেবী পিছন ফিরে উনুনে ন্যাতা বুলোচ্ছিলেন, কথার প্রবাহ বন্ধ হয়ে গিয়ে চুপ করে থাকাটা হঠাৎ কানে বেজে উঠল তাঁর। ন্যাতা হাতে তুলে ধরে পিছন ফিরে চাইলেন তিনি।

নিতাইয়ের একাগ্র মুখটা থেকে তার সন্নিবদ্ধ চাউনি অনুসরণ করে তাঁর দৃষ্টি এসে পড়ল লক্ষ্য বস্তুতে। তাঁর আর সহ্য হল না। রূঢ় কণ্ঠে বলে উঠলেন—বাজারে যাবি ত হাঁ করে দেখছিস কি!—

নিতাই হাঁ করে সত্যিই গিলছিল যেন। কোনদিকেই তার লক্ষ্য ছিল না, এঁটুলির মত তার চোখ দুটো লেপটেছিল সৈরীর কাঁধ থেকে আঁচল খসে পড়া বুকের অনাবৃত ভাগে। মা'র তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে চমকে উঠে ঢিল খাওয়া কুকুরের মত সে ছিটকে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তারপর জিভ দিয়ে শুকনো ওষ্ঠের উপরিভাগ ভিজোতে ভিজোতে মুখটা কুঁচকে বিকৃত করে সরে দাঁড়াল। সৈরী তাড়াতাড়ি উঠে কাপড় কাঁধে টেনে দিয়ে চোখ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে খুদ বাছতে লাগল।

দরজার আড়াল থেকে একগুঁয়ে গলায় বলল নিতাই—ঝোলা না দিলে কি খালি হাতে বাজারে যাব!

পর পর দুটো ঝোলা ছুড়ে ফেলে দিলেন করুণাদেবী বাইরে। নিতাই তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলে পর সৈরীর দিকে কোপদৃষ্টি মেলে কঠোর গলায় বললেন তিনি—কাপড়-চোপড় সামলে সুমলে বসিস্ ত কাজ করতে আসিস বাছা। নইলে মাকে পাঠিয়ে দিস। গতর খুলে ধরতে হয় ত আরও অনেক জায়গা হাট বাজার আছে। এ বাড়ী জায়গা নয়।

আচমকা অন্ধকারে লাঠি পড়লে চুরি করতে এসে চোরের মুখ যেমন বিকৃত হয়ে ওঠে, সৈরীর মুখও হয়ে ওঠে তাই। ফ্যাকাশে জড়সড় হয়ে বসে মুখ নীচু করে খুদ বেছে চলে সে।—

বাড়ী ফিরে এল শান্তনু দুপুর বেলা। কড়ি কোমলের আঘাতে ভরে ওঠা মন কখন নিভে গিয়েছিল একরাশ তুষের ছাইয়ের মত, দগ্ধ পোড়া কালিতে ঢেকে গিয়েছিল সারাটা মন।

উপরের ঘরে শুয়ে তার শ্রান্ত দেহটা বিশ্রাম চাইছিল। মনে হয় তখনো পথের গতিটা থেমে যায় নি ভিতরে। তখনো বেজে চলেছিল উতরোল হয়ে আর ছবিগুলো ভেসে উঠছিল—বন্ধ চোখের পর্দায় পর পর ক্রমিকতায় না এসে তালগোল পাকিয়ে একাকার হয়ে গিয়েছিল ডাঁই করা মৃতের শবের মত—পরিচিত অপরিচিত থেকে সনাক্ত করা যায় না। ভালয়-মন্দয়-শোভনে-অশোভনে মিশে পরস্পর সংলগ্ন হয়ে আবর্জনাবাহী গাড়ীর মন্থরতায় ভেসে চলেছিল মনের সড়ক ধরে। কিছুই মনে পড়ে না, আবার সব কিছুই যেন নগ্ন হয়ে ফুটে উঠছিল। শেষে তন্দ্রা এসে তার আতপ্ত মনটা কখন চাপা দিল সে জানতে পারেনি। আবার ফিরে এল ছবিগুলো। ঝকঝক করতে লাগল একটা উজ্জ্বল আয়না থেকে। উজ্জ্বল আয়নায় মেঘম্লান আলোয় তার মুখ ফুটে উঠল—হাজার ছবির টুকরো ভেঙ্গে গড়ে স্রোতের মত সরে যাওয়ার মধ্যে স্থির হয়ে রইল। সে চাইল মুখ সরিয়ে নিতে, কিন্তু চারি-দিকে আয়নাগুলো ভিড় করে এগিয়ে এল—তার মুখের দিকে তাদের অবয়বহীন আড়াল উঁচিয়ে দাঁড়াল। ঘুমের মধ্যেও তার মুখ বিকৃত হয়ে ওঠে।

যখন ঘুম ভাঙল তখন মেঘ সরে আকাশ ম্লান আলোয় করুণ হয়ে উঁকি দিচ্ছিল তার শিয়র গোড়ায়। একটা বিভ্রান্তির কবলে গিয়ে পড়ল অমনি, ভাবল বুঝি সকাল হয়েছে। তাড়াতাড়ি ধড়মড়িয়ে উঠতে গিয়ে একটা বেদনা শরীরের গাঁটেগাঁটে উৎকীর্ণ হয়ে সজাগ করে তুলল। ঘরটার চারদিকে তাকাল সে—শূন্য। কেবল তার একাকী দেহটা একহাতে ভর করে উঠে চুপচাপ বিছানার উপর থেকে চেয়ে। তার মনে হয় দেহটা পরিত্যক্ত পড়ে রয়েছে কোনো দরজার বাইরে—যখন বেলা পড়ে আসছে। আকাশের বুক ছেয়ে নিভে আসছে আলো আর গৃহহীন রাত বাইরে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ এই শূন্য নীরবতা সে সহ্য করতে পারল না—জনাকীর্ণ পথের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে, মানুষের একটু স্পর্শতাপ লাভের জন্য হু হু করে উঠল ভিতরে—হৃদয়ের দূর থেকেও অনেক মানুষের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে, একটু উত্তপ্ত বাষ্প কুড়িয়ে নিতে তার হিমে ভরা নির্জনতায়।

উঠে এসে সে সাবধানে সার্টটার ভিতরে মাথা গলিয়ে দিল। ছেঁড়াটা

মেরামত হয় নি। সে দিকটায় চাড় বাঁচিয়ে হাত ঢুকোতে ঢুকোতে সে চাইল চারিপাশে। চারিদিকে সবকিছু স্থির নিষ্পন্দিত। সে কেবল একটা অবয়ব, এই গতিহীন আকারগুলোর মাঝখানে, কি কারণে সরে যেতে চাইছে। কেন? এমনি জড় স্পন্দহীন আকার হয়ে থেমে থাকায় দোষ কি? কিসের তাগিদে সে এমনভাবে ছুটে বার হচ্ছে? তার ভিতর চিরপৃথক হয়ে আছে বাইরে থেকে। তার চেয়ে দেহটাকে পড়ে থাকতে দিত সে, পশুর মত নিরাসক্ত চোখে চেয়ে থাকত বাইরে, একটু পরেই দিনের শেষ আলো-টুকুও যখন নিভে আসত আলসের গায়ে। আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল সে। রান্নাঘরে মৃদু কথাবার্তা ভেসে আসছিল। বাড়ী থেকে বেরিয়ে পিছন পিছন একরাশ নিস্তব্ধতা হেঁটে চলে তার সঙ্গে। গলি পেরিয়ে বড় রাস্তায় পৌঁছে তার গতি শ্লথ হয়ে আসে। পড়ন্ত বেলা ডুবুরীর মত হাতড়ে নামছে সহরের গলি ঘুঁজিতে। কোথায় এবার যাবে? সে ভেবে পায় না। পথ দিয়ে লোক হাঁটে। অকারণে সে মুখ তুলে তাকাল একটা এগিয়ে আসা মূর্তির দিকে। কি এক অবোধ্য আশা মনকে তুলে ধরতে চায়। হয়ত— সে বুঝতে পারে না কেন এমন হয়—হয়ত কেউ এসে থমকে দাঁড়াবে হঠাৎ, হাত বাড়িয়ে কাঁধে রাখবে, বলবে একটা চিনতে পারার আকস্মিক হাসি মুখে ছড়িয়ে যেতে যেতে—আরে, এই যে, কতদিন পরে দেখা—এখান দিয়ে কোথায়?—বা ওই মত কোন কিছু। সে বুঝতে পারে না কেন এমন ভাবনা মনের ভিতর আসে। হয়ত আলাপ ছিল সে ভুলে গেছে, কখনও কোনো বিশেষ কারণে হয়েছিল। তার পরে অতীত মনে হয় এক অন্তহীন পথ—তার মধ্যে কোথায় হারিয়েছিল এতদিন। হয়ত দু'চারটে কথার সংলাপ স্ফুরিত হবে—পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতে যেতে আবার একটা রাস্তার মোড়ে সেই মুখ চলে যাবে জনস্রোতে মিশে। একটির পর একটি মুখ তার উৎসুক চোখের সামনে দিয়ে ভেসে চলে যায় পরিচয়হীন থেকে। ছুটির বিকেলে অগুনতি মানুষ দল বেঁধে বেড়াতে বেরিয়েছে। স্ত্রী পুরুষ সারে সারে ফুটপাত বেয়ে চলেছে। টুকরো টুকরো কথার ধ্বনি শোনা যায়। হাসির মৃদু ঝংকার জলভরা পেয়ালায় আঘাতের টুং টাং ছড়িয়ে চলে স্রোতের মত। ফুলের মালা, আতরের গন্ধ ছোট ছোট স্মৃতির টুকরোর মত এসে ছুঁয়ে যায়। মেয়েদের রঙীন শাড়ীর প্রান্ত হাওয়ায় ফুলে থাকে আলস্যভরে। আকাশে আলো হঠাৎ নিভে যাওয়ার আগে সোনার মত জ্বল জ্বল করে। ছোট

ছোট শিশুরা পার্কে ছুটোছুটি করে। রঙীন বেলুনের গোছা' ওড়ে—গাছের পাতায় বাদামী রং গাঢ় হয়ে আসে—আকাশে একটা তারা আলোয় ধুয়ে ফুটে ওঠে হঠাৎ। দোকানের ভিতরে চটুল সুরের গান রেডিওয় বাজে—সে চেয়ে চেয়ে হেঁটে চলে। তার আপন নির্জনতার কথা বিস্মৃত হয়ে থাকে—বাইরের জীবন স্রোতে দু-চোখ-কান অবগাহন করে ভেসে চলে। পারার মত অন্তর কেবলই টলে পড়ে যায় সব কিছুর ছোঁওয়া থেকে, কোনো কিছুকে ধরতে না পেরে। পা দুটো ক্রমাগত তাকে সরিয়ে নিয়ে যায় জনস্রোতের ভিতর দিয়ে অন্য কোনো জায়গায়।

আঁধার ঘোর ঘোর হয়ে এসেছিল। কখন এসে সে থমকে দাঁড়িয়েছিল গঙ্গার পাড়ে জানতে পারে নি। বর্ষার গঙ্গা ফুলে উঠে একূল-ওকূল বিছিয়ে পড়েছে। চারিদিকে সকালের বৃষ্টিভেজা স্পর্শ জড়িয়ে রয়েছে। সন্ধ্যা পেরিয়ে ধূসর আলো ছড়িয়ে ছিল জলের বুকে, তাও আস্তে আস্তে মুছে গিয়ে একটা কালো চাদর নেমে আসছিল চারিদিক ঢেকে। স্রোত বইছিল প্রকাণ্ড জলের বুকটায়, ছোট ছোট ঢেউ অলক্ষিতে জেগে উঠে এগিয়ে আসছিল পাড়ে। মাঝে মাঝে জাহাজের বাঁশি বিষণ্ণ সুরে বেজে উঠে কাঁপছিল হাওয়ায়। অল্প দূরে একটা ভেসে থাকা ষ্টীমার বাঁধার জেটি, তীর থেকে ঢালু হয়ে পুল দিয়ে জোড়া। কি ভেবে সে হেঁটে পুলের উপর দিয়ে জেটির অন্ধকারে এসে দাঁড়াল। জেটিটা জলের দোলায় দুলছিল অল্প অল্প—কানার এক হাত নীচেয় জলের মসৃণ স্রোত নিঃশব্দে বয়ে চলেছিল। দূরে জলের বুকে দু-একটা ষ্টীমারের সার্চলাইট অন্ধকারে দাগ কেটে জলের গা বেয়ে পেরিয়ে যাচ্ছিল। ছোট ছোট ঢেউগুলো আলো লেগে অগণতি সরিস্থপের চকচকে পিঠের মত ঝকমক করে উঠছিল। সকালের মেঘের রাশি অনেক উত্তরে পুঞ্জীভূত হয়ে স্থির হয়ে আছে। মাঝে মাঝে সেখানে বিদ্যুৎ চমকে উঠছিল। গঙ্গার টানা রেখা কালো হয়ে ফুটে উঠছিল থেকে থেকে। জেটির কানার দিকে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল শান্তনু। কেউ নেই জেটিতে। তার পায়ের কাছ থেকে ইঞ্চি পাঁচ ছয় দূরে জলের স্রোত বয়ে যায়। সে একদৃষ্টে চেয়ে দেখতে লাগল নিঃশব্দ স্রোত। মাত্র কয়েক আঙ্গুলের ব্যবধান। কি ভীষণ নিষ্ঠুর গতি তার পিঠের নীচে। তার পা দুটো পাথরের মত অনুভূতিহীন হয়ে থেমে রয়েছে জলের কানায়।

অবিরাম অবিশ্রান্ত স্রোত বয়ে চলেছে পায়ের তলা দিয়ে, মাঝখানে সামান্য কাঠের কয়েকটা তক্তা তাকে তুলে ধরে রয়েছে। সে জানতে পারছে না, সামনে পিছনে পায়ের নীচে দুর্দাম স্রোতের তোড় ঝড়ের মত বইছে অনন্তকাল, মানুষের স্মৃতির চেয়েও পুরাতন। অতলগর্ভ। আর মাথার উপরে আকাশ এক দৃষ্টিহীন শূন্য প্রদীপের মত স্থির হয়ে রয়েছে। চাইতে চাইতে তার দু চোখ যেন ডুবে যেতে লাগল সেই স্রোতে। কি ভীষণ মসৃণ গতি, কি নিষ্ঠুর স্পর্শ—আগুনের মত যেন অনুভূত হয় অন্ধকারেব চামড়ায়! কোথায় চলেছে এত ঝঞ্ঝায় উন্মাদ বুক নিঃশব্দে ধরে? সে জানে না। তার আদি অন্ত বোঝা যায় না। মুহূর্তগুলোয় সেই ঝড় ধরা রয়েছে। সব কিছু লয় হয়ে মহাপ্লাবনে বয়ে চলেছে। অন্য কোন প্রত্যক্ষতা সেখানে নেই।

সে স্রোত তার ভিতরের অন্ধকার ব্যাপ্তিতেও যেন ছড়িয়ে পড়ে। তাকে আকর্ষণ করে আপনার মহাস্রোতের কেন্দ্রে। কোন সাড়া কি জাগবে? সে ভাবে। বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ড উত্তাল ঘণ্টার মত বেজে চলে তার, সমস্ত সময়কে চমকে দিয়ে, অণুতে অণুতে শিহরণ তুলে। কেন এই স্তব্ধভাব? অনাদিকাল ধরে যে স্রোত বয়ে চলেছে তার বুকে তীব্র আকর্ষণে—তার অতলশায়ী প্রাণকে টেনে নিতে চাইছে এক মহাঢেউয়ের চূড়ায়; সে কি পারে তার তুষের ছাই চাপা প্রাণকে ঢেলে দিতে? এই হিমশীতল অন্ধ উত্তাল স্পর্শের জন্যই কি নিরবধিকাল সে জীবনের আলোকলগ্ন সীমায় সীমায় হেঁটে ফিরেছে? এই পরম মুহূর্ত তার জীবনের, অস্তিত্বের, তার খর্বতা দুঃখ গ্লানি-বিচ্ছেদের চিরায়ত আবর্তনের? চিরদিনের বিসর্জনের বাজনাই শুধু ভেসে আসে আকাশের নীল গায়ে? সে শান্তনু, কি কারণে চেয়ে কালো জলের অমোহনীয় স্রোতে? তার মনে পড়ে ভোরবেলা কি এক মধুভাব সে দেখেছিল আকাশের গাঢ় বিধুর ছবিতে। কি রাগিণী তখন তন্দ্রার মত বাজছিল ভিজে হাওয়ায় ভাসান বৃষ্টির ফোটায়। কিন্তু সেগুলো মুছে গেছে নিঃশেষে। এখানে গভীর অন্ধ বুক পাতা আর এক স্ফুলিঙ্গ যা তিমিরে হারাবার আগে অব্যবধিত। সে চেয়েছিল যেন সাপের সম্মোহনী আঁখিগহ্বরে। তার বুকের ভিতর গর্জন করে কি ভেঙ্গে পড়তে চায়। তাকে ক্রমাগত ঠেলতে থাকে পিছন থেকে। তার দেহ বাতাসের চেয়েও হাল্কা—হয়ত একটিও তরঙ্গ তুলবে না।...

হয়ত আর একটিমাত্র পদক্ষেপ সেদিন শান্তনুকে এক মহাস্রোতবহ

আকর্ষণের বুকে তুলে নিতে পারত। তার যৌবন-জরাহীন অস্তিত্বের ভুল মুছে যেত জলের রেখায়। কিন্তু সে দাঁড়িয়ে রইল সেই সীমায়, তার ইচ্ছা দুই প্রতিদ্বন্দ্বী অভিকর্ষের সন্ধিতে কোন অবলম্বন না পেয়ে ফিরে গেল তার গহনে। কাঠের পুতুলের মত দেহটা দুকূল ভরা স্রোতের কয়েক আঙ্গুল তফাতে জেগে রইল একটা চিহ্নের মত। একটিমাত্র পদক্ষেপ—যেমন প্রতিদিন পায়ে পায়ে অসংখ্য নিষ্ফল দূরত্ব সে অতিক্রম করে যায় অপরিচিত পথে দাগ না এঁকে। চোখ তেমনি সম্মোহিতের মত চেয়ে দেখতে লাগল। সে চোখে সে নিজের আপনা থেকেও মুছে গিয়েছিল। তা কেবল দেখ-ছিল জল আর জল, অন্ধকারের প্রকাণ্ড সজাগ শরীরের মত কালো মসৃণ ঢেউ খেলা পিছলে যাওয়া পাকিয়ে ওঠা গড়িয়ে এড়িয়ে যাওয়া, লক্ষ লক্ষ আঙ্গুল তুলে ছুটে আসা, আবার একটা শক্তিমান জানোয়ারের মত গুটিয়ে থিতিয়ে মরে যাওয়া—একান্ত জীবন্ত, সচেতন। কিন্তু তার চেতনাকে তা মুছে দিচ্ছিল আস্তে আস্তে, একটা পাথরের গা থেকে আলোর রশ্মি মুছে নেওয়ার মত।

তেমনি পাথরের মত সে দাঁড়িয়ে রইল, কতক্ষণ তা জানে না। দূরে কোথাও বাঁশি বেজে ওঠে। সে তন্দ্রা থেকে জেগে উঠে চোখ তুলে চাইল। অনেক দূর থেকে একটা ষ্টীমার এগিয়ে আসছিল। সে মুখ তুলে চেয়ে দেখতে লাগল। এই হঠাৎ গতিময় শব্দময় এগিয়ে আসা সে যেন কখনো দেখেনি। একটানা ঝক্ ঝক্ আওয়াজ কানে এসে ঝরে পড়ে। একটা জগৎ মনে হয় তার দিকে এগিয়ে আসে অন্ধকারের বুক সাঁতরে, আলোর সাতনরী মালা গলায় দুলিয়ে। কালো জলে আলোর ফুল ভেসে যায় দুপাশে, ছোট ছোট ঢেউগুলো হুড়োহুড়ি করে ছুটে যায় এগিয়ে।

ষ্টীমার এসে জেটির গায় লাগল। মুহূর্তগুলো শব্দের রাশিতে ভরে উঠল তখনি। একরাশ বাষ্পের ধোঁয়া কুয়াশার মত ফানেলের পাশ থেকে শিষ দিয়ে ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়ছিল চারপাশে। লোকজনের কলরবে ভরে ওঠে জেটির বুক। অস্পষ্ট দেখায় মুখগুলো মৃদু আলো ছড়িয়ে পড়ে। যাত্রীরা নেমে পুল ধরে এগোয়। পাড় থেকে কথাবার্তা চেঁচামেচি শোনা যায়। ছোট জেটিটা চঞ্চল হয়ে ওঠে। শান্তনু চমকে উঠে তাকিয়ে দেখে। সে যেন জেগে ওঠে আবার, জেগে উঠে বিমূঢ়ের মত তাকায়। চারিদিক হঠাৎ স্পন্দিত হতে থাকে; শব্দে আলোয় উষ্ণতায় ভরে যায়।

সে ফিরে দেখবার চেষ্টা করে জলের দিকে। ষ্টীমারের আলোর উদ্ভাসে অস্পষ্ট ঘোলাটে জল সরসরিয়ে বয়ে যাচ্ছিল। তার কালোরূপ কোথায় যেন অপসৃত হয়ে আছে। সে তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এসে দাঁড়ায় জেটির মাঝখানে। আকাশের দূর গায়ে তখনও মেঘগুলো থমথম করছিল। কিন্তু তার সমাহিত মন যেন একটা পর্দার আড়ালে ডুব দিয়েছিল। সে চেয়ে দেখে যাত্রীশূন্য ষ্টীমারটার দিকে। চক্ষুহীন জীবের মত সেটা আস্তে কেঁপে উঠতে উঠতে মোড় নিচ্ছিল। তার বাতিগুলোর রেখা ধীরে ধীরে সরে যেতে থাকে। দু একজন লোক জেটির উপরে দাঁড়িয়ে কথা বলে আপনাদের মধ্যে। তাকে কেউ দেখতে পায় নি। আস্তে আস্তে সে পুলটার দিকে এগোয়। শেষ যাত্রীরা তখন রাস্তায় দূরে হেঁটে চলে যাচ্ছিল। তাদের ছবিগুলোর পিঠে রাস্তার আলো স্থির হয়ে পড়ে। তার বুকের মধ্যে সেই অশান্ত স্রোতের ধ্বনি যেন ঘুমিয়ে পড়ে। দূরে ষ্টীমারটার ভেসে যাওয়া আলোগুলোর দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে পুলের উপর দিয়ে সে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়।

দু'দিন ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে প্রহরগুলোকে অলস ভাবে বইতে দিয়ে আকাশটা শেষে একেবারে মেঘমুক্ত হয়ে ঝকঝক করে উঠল। করুণাদেবী থেকে থেকে আকাশের মুখ দেখেন আর ভাবেন, বড়িগুলো রোদ না পেয়ে ভেপ্‌সে ওঠার মত হয়েছে ক'দিনেই। প্রায় পনেরো দিন থেকে মনে মনে এঁটে রেখেছিলেন রোদ থাকতে থাকতে বড়িগুলো দেবেন। জোগাড় জেরেত করতেই ত ক'দিন কেটে গিয়েছিল। আর যেমনি দিলেন কিনা অমনি দেবতা মুখ অন্ধকার করে বড়িগুলোর দিকে চেয়ে রইলেন। তাও রক্ষে একটু রোদের মুখ দেখা গেছে অবশেষে, নইলে সব পরিশ্রমই পণ্ড হত। যা হোক, বড়িটা আচারটা এটা সেটা করে রাখেন—কোনদিন বাজার না হলেও সৈরীর মাকে দিয়ে এক পো' আলু আনিয়ে নেন। ঝোলে দুটো বড়ি ফেলে দিলে তবু ভাত মুখে ওঠে। শান্তর মাইনের টাকা কটা নিয়ে নেয় নিতাই। তাঁর হাতে থাকলে হয়ত বা অন্য ধারা হত। কি খরচ হয় না হয় কিছুই টের পান না তিনি। মাসকাবার বাজারেই নাকি নিঃশেষ হয়ে যায়। তাঁর বিশ্বাস হয় না, তিনজনার সংসার, খাওয়ার ছিরি ত ঐ। কোনদিন নিতাই বড় ঝোলাটা নিয়ে বেরোয়, কোনদিন মাঝারিটা। কোনদিন আবার বলে,—দাও ন্যাকড়াটা, চট করে দুটো আলু মাছ কিনে এনে দি, আমার সময় নেই একটুও।—তিনি বিধবা কি খান? সে কথা মোটেই ভাবে না। এক একদিন নির্লজ্জের মত খালি হাতেই বার হয়ে যায় নিতাই হাতের দু' মুঠোয় যে কটা আনাজ ধরে তাই নিয়ে এসে ফেলে দেয়। হাতে বাজার! ছিঃ! শুনলেও ঘেন্না,—এ যেন বেণে বাড়ী—লজ্জার মাথা একেবারে না খেয়ে বসে থাকলে কেউ এমনভাবে বাড়ীশুদ্ধ সবাইকে উপোস করায় না। বললে চুপ করে থাকে, উত্তর দেয় না। নয়ত বলে—বেশী খেতে চেয়ো না—খেয়ে খেয়ে কি শেষে পথে দাঁড় করাবে?—ছিঃ ছিঃ—তাঁর ঠাকুরের দুটো বাতাসা বেলপাতা—তার পয়সাও জোটে না! একদিন চোখ রাঙ্গিয়ে বলে উঠেছিল,—খাও, খাও—এবারে আমার মাথাটাই মুড়িঘণ্ট করে

খাও—বলি বিধবা হয়েছো যে পুণ্যে সেই পুণ্যেই ছেলের মুণ্ডুটা চিবিয়ে না খেলে তৃপ্তি হচ্ছে না!—মনে করলেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, চোখের জল শুকিয়ে যায় লজ্জায়! চামার চশমখোর মিন্সের মুখে কিছু আটকায় না। কিন্তু আসল কথা তিনি বোঝেন। মনের মধ্যে কর্‌কর্‌ করছে ছোটঠাকুরঝির গয়না। সেগুলো হাত মুচড়ে নিতে পারলেই তবে প্রাণটা শেতল হয়! বলে কিনা একদিন,—দাও! দাও! দাওনা তোমার কাছে কি গয়না পত্তরগুলো আছে। বেছে গুছে তোমার নামে টাকাটা সুদে খাটাই। যা আয় হবে তাতে তোমার ঠাকুর রোজ বেলোয়ারী হুঁকোয় তামাক খেতে পারবেন! আটকে কি ফিকির হচ্চে তোমার?—কি কথার ছিরি, আহা! তিনি কথাটাকে চাপা দিয়েছিলেন এইভাবে—যাক্‌গে বাছা কি গয়না তা তোরাই ভাল জানিস আমার চেয়ে কোথায় আছে। ঠাকুরকে পূজো দিই তোদেরই মঙ্গল ভেবে—না হয় উপোস করবেন ঠাকুর!—উপোস অবিশ্যি করতে হয় না ঠাকুরকে। সৈরীর মাকে দিয়ে স্যাকরার কাছে একগাছ রুলী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন চুপে চুপে, টাকাটা নেন অল্প অল্প করে। বিশ্বেসী স্যাকরা, কর্তামশায়ের আমলে বাড়ী এসে ফরমায়েস নিয়ে যেত অন্দর থেকে। ঘোমটার নীচে থেকে কতবার হাত বাড়িয়ে ধরেছিলেন তিনি। তেলবাবরিচুলো মিন্‌সে এক এক করে চুড়িগুলো পরিয়ে দিত। আপন নিরাভরণ হাতটার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখেন করুণাদেবী। একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে যেন সেই অতীতের ছায়াগুলোর দীর্ঘ পথ ঘুরে ঘুরে। রুলীখান তাঁর নিজেরই ছিল। কোনকালে টাকা ফিরিয়ে বন্ধকী উদ্ধার করে নিলেই হবে। কে আর শোধ দেবে, শেষে ওই ওৎ পেতে রয়েছে শনিগ্রহ—ওর গর্ভেই যাবে। অস্বস্তিতে মন ভরে ওঠে। বড়ির হাঁড়িটা বাঁ হাতে করে দেয়াল ধরে ধরে করুণাদেবী ওঠেন সিঁড়ি দিয়ে। একধাপ একধাপ করে ওঠেন। কতকালের সিঁড়ি, ধাপগুলোর কানা গোল হয়ে হয়ে ক্ষয়ে গেছে। কষ্ট হয়—দেয়ালে হাত ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে ওঠেন। চুনকামের ওপর কালো তেল চকচকে ছোপ উঠেছে পাশে পাশে। হাঁপ ধরে বড়, বয়স হয়েছে—কেবল মনে করিয়ে দেয় যেন ধাপগুলো। খুকি বউ হয়ে একদিন এসেছিলেন এবাড়ী? এই ধাপকটা দিয়েই ত নেচে নেচে উঠতেন। তখন ও-বাড়ীতে থাকা হত, এ-দিকটা ছিল বউ-ঝিয়েদের হাসি গল্পের মহল। কত আওয়াজ ভরে থাকত সবসময়ে—ডাকাডাকি ঠুনকো কথার তরঙ্গ—এখন মনেও আসে না। ছাদে পৌঁছলেন তিনি। কোমরে

হাত রেখে আস্তে আস্তে ঘুরে চারিদিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন। বেশ রোদ উঠেছে। বৃষ্টি ধোয়া ঘর-বাড়ী আকাশ তক তক করছে মাজা পেতলের বাসনের মত। বড়ির কাপড়টা মেলে দিতে দিতে মেঘভাঙ্গা প্রখর সূর্য চন্‌চন্‌ করে বেঁধে চামড়ায়। বাবাগো, কি তাত গো এক বেলাতেই শুকিয়ে যাবে—আহ্লাদ হয় ভাবতে। বেলা ন'টা না বাজতেই এত রোদ্দুর! বড়িগুলো মেলতে মেলতে হঠাৎ করুণাদেবীর মনে পড়ে, সকাল বেলা শান্ত একবাটি চা নিয়ে ওপরে চলে এসেছিল, আর বেরোয় নি। কি করে এতক্ষণ? তাঁর কৌতূহল হয়, পা টিপে টিপে দরজার কাছে এসে দাঁড়ান। একটা আঙ্গুল দিয়ে কবাটটা সাবধানে একটু ফাঁক করে এক চোখ এঁটে তাকান ভিতরে। কি করে লোকটা? সামান্য দেখা যায়, পাটি পেতে চিৎ হয়ে শুয়ে। মুখের আধখানা দেখতে পান—চোখ বিস্ফারিত করে মেলে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে যেন কিছু দেখছে। সে মেলে ধরা চোখের দৃষ্টি কেমন অদ্ভুত। তাঁর ভয় করে—মনে হয় অপার্থিব কোন কিছুর দিকে চাইছেন তিনি। যে চোখ একটা পর্দা দিয়ে সর্বদা ঢাকা থাকত, তার আবরণ যেন খসে পড়েছে। একটা অবোধ্য চাউনি সেখানে তিনি দেখেন—যেন নিজের একাকীত্বের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে সে। তিনি চেয়ে থাকতে পারেন না সেই পুরো খোলা একটা চোখের দিকে। অস্বাভাবিক মনে হয়, তাড়াতাড়ি দরজাটা টেনে দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসেন।

বাইরের দরজায় জোরে কড়া নাড়ার শব্দ হয়। বাজার করে নিতাই ফিরে এল। থলিটা তার হাত থেকে নিয়ে করুণাদেবী রান্নাঘরে ঢুকলেন। বাঁ হাতে পাতায় মোড়া মাছটা দরজার গোড়ায় নামিয়ে রেখে নিতাই কপাল থেকে ঘাম হাতের পোঁছায় মুছে ফেলে আশে পাশে তাকাতে লাগল।

—মা দেখ মাছটা আবার বেড়ালে নিয়ে না সটকায়। যা দাম, মাছের বাজারে আগুন লেগেছে—কুচো চিংড়ি—তাই বলে কিনা আড়াই টাকা সের,—

—হ্যাঁরে, এই চারটি চুনো পুটি হাতে করে আনলি? কার ভোগে লাগবে ও কটি—?

—তা কি করি। ঘ্যান ঘ্যান কোরোনা মেলা—বাজারের খবর রাখ কিছু? চুনো পুটি আজ দেখছ—কাল আর তাও দেখতে পাবে না। ফড়েরা বলছে সর্বনাশ হবে নাকি আগামী বছর—।

—কেন রে কি হবে আবার?—শঙ্কিত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন করুণাদেবী।

—একটু সবুর কর, টের পেয়ে যাবে। যা পরিকল্পনার ধুম লেগেছে দেশে,

চুনোপুটি কেন বেলের আঁটিও মিলবে না। সব পরিকল্পনাতে লেগে যাচ্ছে। বাজারে কিছু থাকবার জো আছে।—

—এ্যাঁ, সে আবার কি পরিকল্পনা! একটু ভেঙে চুরে বল বাছা।—ঘর-বাড়ী ধরে টান মারবে না ত?—এবারে সত্যিই শঙ্কায় কেঁপে ওঠে তাঁর গলা। কানা ঘুষো তিনিও শুনেছেন—কি এক বিষম অরাজক হালচাল নাকি শীগ্‌গিরী দেখা দেবে।

—নেও ঠেলা! চোরের মন বোঁচকার দিকে! ঘর-বাড়ী টান মারবে কেন—বলে নিতাই আপন উদরে একটা আঙ্গুল গেঁথে বলল—এখানটা কমাতে হবে। নয়ত ঘর-বাড়ী বেচে ভরাট করো।—

—যাঃ যতসব অলক্ষুণে কথা। শত্তুরের ভুঁড়ি কমুক। তোর কোন দুঃখে শরীর পাত হবে? তা কি বলছিলি ও কথাটা—ভাল করে বল না একটু—খোলসা করে।

—নাও নাও—কথায় ঘরে কড়ি আসে না। আমায় দোকান খুলতে হবে ন'টার মধ্যেই। যা দিনকাল—বিক্রী ত নেই ঘোড়ার ডিম তার ওপর বেলা বারটায় দোকান খুললেই ব্যবসা আরও ফলাও হয়ে উঠবে। নাও—আবার দাঁড়িয়ে রইলে কেন হা করে—চা—টা দেবে না একটু!

—আয়, বোস এসে পিঁড়িটা টেনে নিয়ে। ভাত নামিয়ে চায়ের জল বসাই। নটা বাজতে এখনো দেরী আছে।—বলে করুণাদেবী গৃহস্থালীতে মন দিলেন। ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে উনোন নিকোতে নিকোতে চাইছিলেন নিতাইয়ের দিকে। কি পরিকল্পনা টল্পনা বলে অতশত বুঝতে পারেন না। কিন্তু শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে ছেলের রূপে তিনি এতাবৎ এতটুকু জেল্লা কমতে কোনদিন দেখেন নি। মাথায় চুল ছোট ছোট করে কদম ছাঁটা, হালফিলের দশআনি ছআনি ও দুচোখ পেড়ে দেখতে পারে না। মাথার পরিধি যেমন নিখুঁত গোল, মুখটাও তেমনি। রগ থেকে থুতনি অবধি গাল ভরাট করে রেখেছে মুখটাকে। চোখের নীচে গালের দুটো চকচকে উঁচু ঢিবি চোখ দুটোকে প্রায় লুপ্ত করে রেখে দেয়। নাকটা বড়ির মত—সেবার মা'র দয়া হয়ে এবড়ো খেবড়ো হয়ে খেয়ে গেছে ডগাটা। সরু খাই মুখ এতটুকু একটা বাংলার পাঁচের মত, দুটো কোণ চোকো, মধ্যে খাঁজকাটা বলিষ্ঠ থুতনিটার দিকে ঝুঁকে পড়েছে—তর্ক করতে গেলে অমনি সেটা সে বাড়িয়ে ধরে তাকায় ডালকুত্তার মত। আর রং নিতাইয়ের উজ্জ্বল শ্যাম বললে

মোটেই অত্যুক্তি করা হবে না। কিন্তু তবু করুণাদেবীর মনে হয় ওইই চাঁদ ধোওয়া রং। তবু যদি না সেবার বসন্ত হয়ে রংটা অমন জলে যেত। কিন্তু সবচেয়ে অদ্ভুত ওর চোখ ছুটো যা নেপালীদের মত বললে প্রায় গ্রহণযোগ্য হয়। কখন কখন মনে হয় চোখের পাতা একেবারে জুড়ে সে তাকিয়ে দেখছে—আসলে কিন্তু তিনি জানেন ওটা নিতাইয়ের দুষ্প্রবণতা। দোকানে বসে বসে খদ্দেরদের ধোঁকা দেবার জন্যে অমন চাওয়া অভ্যাস করেছে নিতাই। কিন্তু সেই চোখই রাগলে মুহূর্তে গোল গোল ভাঁটার মত খুলে যায় আর ভিতর দিয়ে যা উঁকি দেয় তা রোমহর্ষক। গর্দানটি বেশ নধর সুপুষ্ট চওড়া, গোল গাল কাঁধের উপরে কেশ-সংক্ষিপ্ত বর্তুলাকার মাথাটাকে সিধে করে ধরে থাকে। সর্বাঙ্গে খাঁজ খুঁজে পাওয়া কঠিন নিতাইয়ের। যেমন পেট তেমনি কোমর তেমনি ছাতি তেমনি তলা। সর্বৈব সাড়ে বিয়াল্লিশের একটা মোদ্দা মাপে ফেলা যায়। ভারি ভারি পায়ের গোছ, দশাসই জোয়ান চেহারা। হার মানায় সেকালের নবীন ময়রাকে। রেগে গেলে যা একটু ভয় করে দেখলে, কতকটা ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মত যেন ল্যাজ সিধে খাড়া করে শিং নামিয়ে ফোঁস ফোঁস করে ও। তখন করুণাদেবীও দক্ষ পাটোয়ারীর মত জাবনা হস্তে ঠাণ্ডা করেন ছেলেকে। মাতাপুত্রের সম্পর্কটা তাই পুরোপুরি প্রেমের বলা চলে না। কতকটা সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। তবুও নিতাইয়ের দিকে চাইলে চক্ষু জুড়োয় তাঁর। চা ঢেলে দিতে দিতে করুণাদেবী বললেন—আজ ফিরবার সময় ছু বাণ্ডিল সেলাইয়ের সুতো হাতে করে আসিস।

—কেন, সুতো আবার কি হবে?

—এই এটা সেটা মেরামত করতে দরকার হয় আর কি। জামাগুলো ছিঁড়ে গেছে।

—আমার জামা মেরামত করতে হবে না তোমাকে। আমি ছেঁড়া জামা পরতে পারি।—বলে সগুকেনা জামাটার আশেপাশে খুঁজে দেখে নিতাই। অপ্রসন্ন গলায় বলল—শান্তর জামা মেরামত করতে হয়, তাকে সুতো কিনে দিতে বল গে। আমি এত বোঝা একা বইতে পারব না বলে দিচ্ছি। এমনিই ত পিঠটা বেঁকে পড়েছে তোমাদের জুলুমে।---

—আচ্ছা বাবা তবে আনিস নে। তোকে আর ছু বাণ্ডিল সুতোর বোঝা বইতে হবে না! সত্যিই তো, পিঠখানা ভাল মানুষের পো'র এত বেঁকলে কি আর চলে!—বলে মৃদু হাস্য করেন করুণাদেবী।

চা খেয়ে গজ গজ করতে করতে উঠে গেল নিতাই। পরিকল্পনার ব্যাপারটা ছিকেয় গোটান রয়ে গেল।

দুধারে চারটে চারটে আটটা তালা, মোটা শিকল, হুড়কো, লোহার পাতা, উপরে নীচে ছিটকিনি। এক এক করে খুলতে পাঁচ দশ মিনিট কোনদিন না দেরী হয়ে যায়, কিন্তু নিতাই প্রত্যহ অধ্যাবসায়ের সঙ্গে প্রত্যেকটি তালা খোলে আর প্রত্যেকটি আঁটে। আঁটবার সময় তিনবার টেনে দেখে; কখনো দোকান বন্ধ করে নোনতা বাগানের মোড় অবধি এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ মনে পড়ে ডান কবাটের সেজ তালাটা কেমন চাবি ঘুরোতে গিয়ে কড়াং করে উঠেছিল। আবার ফিরে গিয়ে পরীক্ষা করে তবে স্বস্তি হয় নিতাইয়ের। তবে দোকানটা ভাল জায়গায়, একেবারে রাস্তার ওপরে বাজারের মাঝখানে। এ পাশটায় বোসেদের ছিট কাপড়ের দোকান। ওধারে জয়কালী রেষ্টুরেণ্ট। মাঝখানে তার দোকানটার অবস্থান যতবার সে দেখে ততবার একটা বাজি জেতার স্ফূর্তি ঘাই মেরে ওঠে নিতাইয়ের মনে। পাঁচ হাজার টাকা সেলামী দিলেও এমন দোকানঘর এখন কোথাও মিলবে না।

তালা খুলে কবাটগুলো সরিয়ে নিতাই ভিতরে ঢোকে, তারপর ভাল করে চায়। সব ঠিক আছে মনে হয়।

বেশ মাঝারী গোছের দোকান। উপরে কাঠের পাটা বিছিয়ে আরেকটা তলা তৈরী হয়েছে। একটা মই সিঁড়ি লাগানো। অন্যধারে চৌকির উপরে ডেস্ক বসানো। দোয়াত কলম ব্লটিং—পাশে চৌকো ক্যাশ বাক্স। দেয়ালের গায়ে লোহার সিন্দুক। জিনিষপত্রে ঠাসা দোকান। হরেক রকম চিনে মাটির বাসন-কোসন, পেলেট পিরীচ ফুলদানী—আতরদান চায়ের সেট, ভোজের সেট—পলকাটা কাচের রকমারী জিনিষ, রঙীন কাচের গেলাস, জগ—বিবাহের উপহার দেওয়ার ফুলতোলা বাংলা বা ইংরেজী হরফে লেখা সৌখিন কাচের জিনিষ, বাতিদান, বাতির শেড, ঝাড় লণ্ঠন—এমন কত শত জিনিষ। দুটো বেঞ্চি একধারে পাতা। খদ্দের এলে একটু বসবার জায়গা দেওয়া যায়। কাঠের সিলিং থেকে ঝোলান কয়েকটা দামী ঝাড় লণ্ঠনের গা থেকে আতশি কাচের ঝুমকোগুলো খসে গেছে দু-একটা—অনেকদিন ঝাড়ার অভাবে ধুলো জমেছে কোথাও, তা নইলে চারিদিক ঝকঝক করে।

—ওরে হেবো! হেবো!—দরজার কাছে গিয়ে নিতাই গলা বাড়িয়ে ডাইনে বাঁয়ে তাকাতে তাকাতে হাঁক দিল। অল্প দূরে একটা বারান্দার থামের আড়ালে দু-তিনটি পনেরো ষোল বছরের ছেলে বিড়ি টানতে টানতে জটলা করছিল। একজন তাদের মধ্যে দলচ্যুত হয়ে অল্প জোরে হেঁটে ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে এসে দাঁড়াল নিতাইয়ের সামনে।

—শালা থাকিস কোথায় রে এতক্ষণ!—চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলায় চর পড়ে গেল, বাঞ্চোতের টিকিরও দেখা নেই। শালা দূর করে দেব দোকান থেকে, ফের যদি কথা না শুনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানবি। কিরে বেটা, জবাব দিস্‌নে যে বড়?—

হেবো নির্লিপ্তভাবে কথাগুলো শুনছিল। হঠাৎ তার চোখ চকমকিয়ে ওঠে—বাবু কাল আপনি দোকান বন্ধ করে গেলে পরেই সামন্তবাবু এসেছিলেন।

নিতাই উৎকর্ণ হয়ে বলল—তুই কি বললি সামন্তবাবুকে?—

—বললুম, বাবু দেওঘর গেছেন মাল নিয়ে। ফিরতে দু' হপ্তা দেরী হবে।—

—ব্যাটা গাড়োল। কেন, দু'মাস বাড়িয়ে বলতে পারলি নে?

—হ্যাঁ, দু'হপ্তা শুনেই বলে কিনা—বাবুর ঠিকানা বল্‌, আমি ভগ্নীপতিকে চিঠে লিখে দি সেখানে—

—এই খেয়েছে, ভগ্নীপতিও রেখেছে নাকি একটা দেওঘরে?

—আপনিও যেমন বাবু—এই যেমন আপনার দেওঘর যাওয়া তেমনি তেনার ভগ্নীপতি—বুঝলেন কিনা—

হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা—প্রাণ খুলে নিতাই হাসতে লাগল। হেবোও।

নিতাই দত্ত মোটামুটি সেই ধরণের দোকানদার, যদি দোকানদার বলতে আলাদা কোন সংজ্ঞা নিরূপণ করা সম্ভব হয়—তাহ'লে তাকে বলা যায় যে সে পৃথিবীটাকে সৎ-অসতের ঊর্ধ্বে দেখবার বা তুলে ধরবার মত যথেষ্ট মনোবল রাখে। নিতাইয়ের পৃথিবীর একটা অভিকর্ষক কেন্দ্র আছে—সেটা ২৮/২ অমুক রাস্তায় তার চিনেমাটির দোকান ঘর। তার সৎ-অসতের প্রধান নিরিখ এবং তাবৎ বিচারে তার নীতিবোধের ফর্দের শিরোনামায় প্রথমেই সংজ্ঞাত একটি কথা এই যে—বিশ্ব সংসারে মানুষের হেতু যে কেন্দ্র সে নিরূপণ করে রেখেছে—সেই দিকেই তাদের মোড় নেওয়া উচিত। অর্থাৎ দুনিয়ার প্রত্যেকটি নীতিজ্ঞান সম্পন্ন মানুষের উচিত, শুধু

উচিত বললে' লঘু হবে, একান্ত দায়িত্ব, মাসে না হোক বছরে একবার অন্তত তার দোকানে পদধূলি অর্পণ করা। কিন্তু তা যখন হয় না, যখন মানুষের স্রোত সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি অবিরল গতিতে বয়ে যায় প্রতিদিন তার দোকানের দিকে অলস ভাবে চেয়ে থেকে—নিতাই ক্ষিপ্ত হয়ে কখনো একটা মনোহারী রঙীন চিমনিকে উদ্দেশ্য কয়ে বলে ওঠে,—লোকের পাপ পুণ্য বোধ সব লোপ পেয়েছে হালে। একি সেকাল আছে, যে দেখলে যদি পছন্দ হয় ত দু'দণ্ড দোকানে ঢুকে দুটো দর করেও যাই—কেনা না কেনা ভগবানের হাতে।—কিন্তু তা হয় কই? নিতাই ডেসকের সামনে বসে তাকিয়ে দেখে মানুষের মিছিলের দিকে, যারা অবিশ্রান্ত বয়ে যায় সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তের অনেক পরেও রাত ন'টা অবধি। নিতাই দোষী করে, কঠিন ক্ষমাহীন অভিশাপগুলো সে দেয় প্রথমত যে বিধাতা মহাজনের মত অলক্ষ্যে বসে কলকাঠি নাড়েন তাঁকে। দ্বিতীয়ত ঐ অসংখ্য মুখ্যুগুলোর অনিশ্চিত ভেসে বেড়ানোকে, যাতে সে কোনোদিন একছিটে ব্যবসায়ী বুদ্ধির বা শুভাশুভ বিচারর লক্ষণ দেখতে পায় না। তৃতীয়ত এক সঙ্গে নিজেকে, পিতৃপুরুষকে, পৈতৃক দোকানটাকে, মূলধনের অভাবকে, সরকারকে, রেঞ্জার্সের ভাগ্যকে। শেষোক্ত বিভক্তিটা অন্যগুলো থেকেও বলীয়ান এই কারণে যে সে অন্য দোকানদারের মতই প্রতি মীট্এ বুকির কাছ থেকে টিকিট কেনে। বারে বারে নানা রকম নাম, হরেক বানানে মন্তর পড়ে লেখে, কিন্তু অফলা ভাগ্য কয়েৎবেলের মত অসংখ্য বিরাগ নিয়ে নাসার উপর ঝুলে থাকে, নেমে আসতে চায় না। রেঞ্জার্সে অনেকেই টিকিট কাটে, অনেকেই তার মত রাত পোহাতে উনপঞ্চাশ হাজারী চেক খানার স্বপ্ন দেখে। তবু পুলের ছাপা লিষ্টি খানায় তন্ন তন্ন করে খুঁজেও অভীপ্সিত গূঢ় শব্দটা ফুটে উঠতে দেখা যায় না। প্রায় ছুঁই ছুঁই করেও ছোঁয় না। যেমন সেবারে সে দিয়েছিল, 'জয় মা কালী'। একদিন লিষ্টি খুলে দেখল পাঁচ জায়গায় 'জয় মা কালী' আর পাঁচ জায়গায়ই নম্বরে বেতাল হয়ে রয়েছে। হা কপাল! পরবর্তী রেসে নাম ধরল নিতাই, 'চিচিং ফাঁক'। একবার যদি এই বহু বিশ্রুত আপ্ত বাক্যটির জোরে শিল চাপা কপাল একটু উদ্ধার হয়। অবশ্যই তা হয়নি। কিন্তু নিতাই দমে না। তার মনে হয় স্বাভাবিক নিয়মেই ধর যদি এমন কিছু ঘটে একদিন সকালবেলা—না বিকেলবেলা —সে দেখল রাস্তার স্রোতটা সত্যিই মোড় নিয়ে একেবারে হু হু করে এসে

ঢুকছে তার দোকানের ডাইনে দরজা দিয়ে আর বেরিয়ে যাচ্ছে বাঁয়ের দরজা দিয়ে; হাতে কারো চিমনি কারো পিরীচ, কারো ফুলদানী, কাঁধে করে ঝাড় লণ্ঠনগুলো—আর ক্যাসবাক্সের ডালাটা খুলে রয়েছে অতিভোজনে চিৎপাত কুমীরের মত হাঁ করে—আর দোকান লোপাট—ইস্তক দোয়াত কলম গুলোও হাওয়া, তা হলে? ভাবতে ভাবতে অন্যমনা হয়ে যায় সে। না, রাধাবাজারে হেবোকে পাঠায় মাল আনতে। যায় আর আসে, মাল আসে আর মাল উড়ে যায়। ওঃ সে এক কুরুক্ষেত্তর কাহিনী হয় তা হ'লে! কিন্তু হেবোটা ছিঁচকে। একদিন এমন সুযোগ পেলেই কত কমিশন সরাবে বেটা তার ঠিক নেই। তাতে অবশ্য ঘাবড়ায় না নিতাই। বন্ধর আগে না হয় ছোঁড়াকে খপ করে চেপে ধরে প্যাণ্ট খুলে নিয়ে উপুড় করে ঝেড়ে ঝুড়ে নামিয়ে নেবে যে কটা পয়সা বেহাত হয়ে গেছিল।

কিন্তু নিতাইয়ের পৃথিবীতে এমন রোমহর্ষক ঘটনা ঘটেনা। তাই সে দোকানের কাচের জিনিষগুলো বারে বারে একটা পালক বাঁধা ঝাড়ন দিয়ে ঝাড়তে ঝাড়তে রাস্তার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলে—শালা, উটের মত হেঁটে চলেছে ত চলেছেই—যেন ওদিকে গেলেই বিনে পয়সায় হীরের এক টুকরো মিলবে। অর্থাৎ রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া লোকগুলো প্রত্যেকেই একজন গূঢ় খরিদ্দার, যাদের মতিগতি হালে মোটেই বুঝে উঠতে পারে না নিতাই। সচরাচর যে দ্বন্দ্বগুলি মানুষের জীবনে একীভূত হয়ে নানা রকম পীড়া বা ক্লেশকারিতার সৃষ্টি করে, নিতাইয়ের জীবন তা থেকে মুক্ত। তার জীবনে বা তার বিশ্বে মাত্র একটি দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব সে জানে, তা ক্রেতার মন নিয়ে কাড়াকাড়ির দ্বন্দ্ব। ক্রেতার মুখ দেখে সে প্রায় ফলিতজ্যোতিষীর মত স্থির করে ফেলতে পারে এ ব্যক্তি কতদূর এগোবে কতদূর পেছোবে, কতটা ছাড়বে কতটা টানবে বা মাজার জোর আছে কি নেই। মাঝে মাঝে মেয়েমানুষ খদ্দের ঢোকে দোকানে; তখন রাগে দাঁত কিড়মিড় করে নিতাই। আজীবন সে মেয়েছেলের কাছে হেরে গিয়েছে; এক মেয়েছেলে তাকে প্রায় সর্বস্বান্ত করে মুখে জোড়া কলা ঠেকিয়ে বর্তমানে সিনেমা করছে—আরেক মেয়েছেলে বাড়ীতে অহরহ তেল নেই নুন নেই করে জীবন বিষময় করে তোলে; আর দোকানে এই সব হাল ফ্যাশানের পাছা ঘুরিয়ে কাপড় পরনেওলা ছুঁড়িগুলো থেকে বেলেল্লা দিদিমা অবধি এসে দর করে কানে পোকা পাড়িয়ে দেয়। শেষটায় পাগল হয়ে

'নিতাই অনেক' সময়ে লোকসান করেই মাল ছেড়ে দেয়। লোকসান মানে অবশ্য লাভের লোকসান, কিন্তু তা কেনা দামের লোকসানের চেয়েও যে গায়ে লাগে বেশী। কিন্তু খদ্দের খদ্দের, তাই সে নিজের মুখে শো-কেসের স্থৈর্য এনে ধীর ভাবে বোঝায়—না দিদি, না মা ঠাকরুণ তাই কি হয়, ক'টা পয়সা আর লাভ করি বলুন! অমন করলে কি আর আপনাদের আশীর্বাদে করে খেতুম! হ্যাঁ মা লক্ষ্মী, নিয়ে যাবেন না তো কি আমি যক্ষির মত এগুলো আগলে বসে রইব। আজ্ঞে ঠিক দাম দেবেন বৈকি, দেবেন বৈকি। আজ্ঞে তা হলে আর কি করি বলুন, আমার কপাল!—বলে আগুনের মত জ্বলে মনে মনে। চামার মাগীগুলো! দয়া মায়া পিরীত নেই একটুও। তার দুনিয়ায় তাই হৃদয় বলে পদার্থটাই অলীক। কেউ তাকে ঠাঁই দেয় না। সেই বা দেবে কেন? যখনই তাই কোনো হাবাগোবা গোলমুখ গোল চশমা কেউ দোকানে ঢোকে অমনি নিতাই লাফিয়ে ওঠে, বাছা, জালে পড়েছো। এখন বেরোও ত দেখি!—সেই লোককে অতঃপর দিনকে রাত বুঝিয়ে কাঁচাকে পাকা, কালোকে সাদা, মরাকে জলজ্যান্ত বলে অভিভূত করে ফেলে নিতাই। খদ্দের যদি বিন্দুমাত্র অস্থিরচিত্ততার লক্ষণ প্রকাশ করে তা হ'লে নিতাই চোখের ব্যাখ্যায় কোনো অবকাশ রাখে না বুঝতে দিতে, যে হাতে কিছু মিছু না নিয়ে দোকান থেকে বেরোলে পশ্চাতে তার এমন চোখা চোখা বিদ্রূপ অনুসরণ করবে যে তার জ্বালা জুড়োতে ছ'মাস কেটে যাবে। অবশ্য তেমন খরিদ্দার দুর্লভ। আর অগত্যা মনে করেই নিতাই তাদের রোঁয়া কেটে নেয়। নয়ত সত্যি বলতে কি তার ভাল লাগে তেমনতর খদ্দের যার সঙ্গে বেশ সেয়ানে সেয়ানে কাঁধ শোঁকাশুকি একটু হয়—তার পর পাটোয়ারী বিদ্যের মারপ্যাঁচে যে জেতে সেই বামাল তুলে নিয়ে চলে যায়।

বিকেলবেলা যেন হাওয়া একটু ঘুরল। দু চারটে খদ্দের আসতে লাগল। ক্যাশ বাক্স কখন ঝনঝনিয়ে বেজে উঠতে লাগল। দু একটা করে উপরে রাখা মাল হেবো সিঁড়ি বেয়ে উঠে নামিয়ে আনতে লাগল। ঘণ্টায় ঘণ্টায় নিতাইয়ের মন চাঙ্গা হয়ে উঠতে লাগল। বিক্রির ফাঁকে ফাঁকে উবু হয়ে বসে রাস্তার দিকে জ্বল জ্বল করে চেয়ে বিড়িটা আশটা টানতে লাগল। বেলা ম্রিয়মান হয়ে এলেই ধুনো গঙ্গাজল ছিটিয়ে নিতাই দুহাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে শুঁড় ঠাকুরকে প্রণাম করল। এমন সময় চাটুজ্জে এসে ঢুকলেন দোকানে।

প্রৌঢ় লোক চাটুজ্জে, বাগবাজারে থাকেন। রোগা ঢেঙা চেহারা, দাঁত পড়ে গাল ঢুকে গেছে, যদিও সামনে দু একটা খুঁটির মত মাড়ির এপাশে ওপাশে উঁচু হয়ে দেখা যায় কথা বলতে হাঁ করলে। তাই গলার স্বরটা একটু জড়ানো। মাথার চুল সাদাতে কালোতে খাড়া খাড়া, ছুটো ছোট চোখে বয়সের ঘোলাটে ভাব তেমন ধরেনি। কোঁচান ধুতির ওপর হাঁটু অবধি পাঞ্জাবী, আর গরম কালেও গলায় চাদর না জড়িয়ে বার হন না কোথাও। প্রতি সন্ধ্যায় নিতাইয়ের দোকানে অবশ্য আগন্তুক তিনি। আর তার এমন গা সওয়া হয়ে গেছে যে কোনদিন না এলে আজকাল মনটা উস্‌খুস করে। পিতৃবন্ধু তায় হাবভাবে খুবই শুভানুধ্যায়ী।

—কি হে নিতাই, বলি হাট বাজারের খবর কির'ম আজ ?'—বলে চৌকির প্রান্তে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বেশ যুত করে বসে পড়লেন চাটুজ্জে।—ওরে হেবো, কি বাবা চাটা খাওয়াবি না আজ, না কি !

হেবো চা আনতে চলে গেলে চারপাশে তাকান।—বাঃ, আরে ও সেটটা ত নজরে পড়েনি এ্যাদ্দিন, নতুন আমদানী করলে বুঝি ?

—আজ্ঞে আমদানী চুলোয় যাক চাড়ুয্যে কাকা, যে কটা ঝুলে রয়েছে গলায় গলগণ্ডের মত এগন নামলে বুঝি !

—হে হে হে হে—তা বেশ বলেচো গলগণ্ডই বটে। তা নামবে বৈকি, নামবে বৈকি। এই আমার ছোট জামাইটে এখেনে থাকলে একদিন নিয়ে আসতুম তোমার দোকানে, হয়ত ওটা পছন্দ হয়ে যেত। নতুন বে করেছে, এ্যা, বুঝলে কিনা। এই ঘরবাড়ী সাজাবে খুঁটিনাটি কত কি কিনে বগাবগীর বাসা মনমতো হবে। তা সে গিয়েছে ডিল্লীতে নইলে…'

তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা চাপা দেবার চেষ্টা করে বলে উঠল নিতাই,—দিল্লীতে ? সেত অনেক দূর, কেন গেল হঠাৎ ?

—আরে হ্যাঁ হ্যাঁ। তাও বুঝি শোননি, ডিল্লীতে সেণ্টারে বদলি হয়ে গেছে, মস্ত পোষ্ট পেয়েছে। আড়াই শো টাকা মাইনে। টেঁপিকেও সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। তা তার উন্নতি হবেই। আমরা হলুম গে রিজেক্টেড মাল। হ্যা হ্যা হ্যা কি বল, আমাদের আর কি হবে।

জলে পুড়ে যায় নিতাই। শেষের কথাগুলো সে জানে বুড়ো শালা তাকেই লক্ষ্য করে বলছে। গুম হয়ে বলে,—কি আর করব বলুন, ঠাকুর্দা দিক মেরে রেখে গিয়েচেন উন্নতি আর হবে কোত্থেকে ! নইলে ভারতী এষ্টোরের খ্যাতি

ত আজকের নয়, সুনামও ছিল ঢের। আপনারাই ত বাপ দাদার আমলের কার-বার দেখেছেন চাড়ুয্যে কাকা।—

—থাকবেই ত থাকবেই ত।—রাস্তার দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে অল্প অল্প ঘাড় নাড়তে থাকে চাটুয্যে,—আর কেন থাকবে না, তাই বলি। তোমার বাবাটার যদি অমন ক্ষয়রোগ না হ'ত তালে কি আর ভাবনা ছিল তোমাদের। এ্যাই পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে তামাক টানতে। আসল কথা জান বাপু—

বাধা দিয়ে নিতাই বলে উঠল,—পায়ের ওপর পা দেওয়ার দিন ঘুচে গেচে কাকাবাবু। আজকাল বামুনই হও আর শূদ্দুরই হও কপালে জুটবে গোলামী, আর বড় সায়েবকে তেল রগড়ে দিতে পারলেই উন্নতি। নইলে কেউ খেতে দেবে না।—কোন রকমে কিছুটা পা'ণ্টা উশুল দিয়েই তবে নিতাই একটু ধাতস্থ হল।

চাটুজ্জে আড়চোখে অলক্ষ্যে একবার নিতাইয়ের ভবটা বুঝে নিয়ে যেন পূর্ব কথাটায় কোনও ছেদই পড়েনি, তেমন ভাবে আবার বলতে শুরু করলেন,—আসল কথা তুমি বোঝনি নিতাই—আসল কথা হ'ল টাকা।—হঠাৎ নিতাইয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে একটা মুঠো করা হাত তার সামনে বাড়িয়ে ধরে বললেন—টাকা, মূলধন চাই, নইলে কিছুই নাই। তোমার ব্যবসায় মূলধন আছে—তেমনি দেনাও আছে। কোনটা বেশী আমি জানিনে, জানবার দরকারও নেই। আসল কথা টাকা থাকলে দেনা থাকবে না, লাভ হবে—অমনি মূলধন বাড়বে। আরও লাভ হবে, আরও মূলধন বাড়বে। এমনি ধারা কেরমে কেরমে ওই শূন্যে গিয়ে চড়ক গাছে উঠে বসবে তোমার কারবার। আর নইলে, দিন আনি দিন খাইরে দাদা পয়সা আমার নাই। বুঝলে!—বলে চাটুজ্জে এমন ভাবে তাকালেন যেন নিতাই একটা গেঁয়ো মক্কেল শেয়ালদা কোর্টে এসে ঢুকেছে।

নিতাই নীরবে এ সমস্ত হজম করল। খোঁচাগুলো আরও তীক্ষ্ণ হয়ে লেগেছিল তার গায়ে। কারণ চাটুজ্জের উক্তিগুলো যথার্থই ছিল। টাকা তার নেই। প্রতিদিন ক্যাশ বাক্সেতে তলানি যা পড়ে থাকে তা দিয়ে হেবোকে মাল কিনতে পাঠায়। আবার বিক্রি হয় আবার দু-একটা নোট, চৌকো খোপগুলোয় দু-একটা রেজকি অতি করুণভাবে ছিটিয়ে থাকে। দিনের দিন তাদেরও সংখ্যা কমে আসে। কি করে যে এমন ঘটে তা নিতাই ভেবে পায় না। সেই ত দোকান রয়েছে, এই ভারতী এষ্টোর। আজ নয়

গত শতাব্দী ধরে খোলা হয়েছে রোজ। সেই যখন ঘোড়ায় ট্রামগাড়ী টেনে নিয়ে চলত আর চোরবাগানের পুকুরে লোকে মাছ ধরতে যেত রবিবারে। তবে কেন এমন হয়? তার কি যোগ্যতা নেই? সে ত ঠন্‌ঠনের কালী-বাড়ীতে মেঝেয় ঠুকে ঠুকে কপাল ফাটিয়ে ফেলতেও রাজি, যদি বিনিময়ে তার কপাল, তা যত ছোটই হ'ক, ফিরে যায়। কিন্তু তা হবার নয়। কি এক অমোঘ নিয়ম খাটছে। দিনের দিন তাকে ছাগমারা বলদের মত হুড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কে জানে, কোথায়। নিতাই কোনদিন ভাববার চেষ্টা করেনি। এই দোকানের বাইরে অন্য কোথাও তার ঠাঁই আছে কি নেই। এই দোকানটুকুর মধ্যে যেটুকু প্রত্যক্ষ তাই নিয়ে তার প্রকাণ্ড এক বিশ্ব। তার বাইরে উঁকি দেবার ইচ্ছা কোনদিন তার মনে আসে না। ওই চিনেমাটির ওপরে ফুলতোলা রেকাবীগুলো। সে জানে না কোথায় ওগুলো কে গড়েছে। কোন ইতিবৃত্ত লুকোনো ও গুলোর। তবু সে তার প্রত্যেকটা পাপড়িকে আলাদা আলাদা করে চিনতে পারে। ঝাড়ন দিয়ে ঘসে। বছরের পর বছর ঘসা খেয়ে আয়নার মত চকচক করে সেগুলো। কখনও খদ্দের টেনেটুনে যদি বলে পুরোনো, নিতাই ক্ষেপে যায়। পুরোনো কি। এ জিনিষ কখন পুরোনো হয়! সাবেক কারিগরদের তৈরী মাল; ঠুনকো জাপানী চিজ্ নয়! ক্রেতা কেনে না, তার দুঃখ হয় না। থাকুক দোকান আলো করে। দুঃখ কেবল তার ক্যাশ বাক্সের তলায়। ওই তার দোকানের প্রাণ ভোমরা ওখানে ধুকধুক করে। কত ফিকির করে খদ্দেরের মন পাবার চেষ্টা করে সে। হালফ্যাসানের চিনেমাটির বাসন এনে সাজিয়ে রাখে সামনে; কিন্তু কোন ফল হয় না। বিক্রিতে ভাঁটা যেন চিরকালই বইবে। শেষ অবধি তাকে শুকনো ডাঙ্গায় ধড়ফড় করতে রেখে এ স্রোত বিদায় হবে। ভাবতে গলার মধ্যে শক্ত দলার মত কি যেন উঠে আসতে চায়। তার দুচোখ ছলছল করে ওঠে। কোণে একটা মাকড়সা কদিন ধরে একটা জাল বুনছে—কত আপনার তার মনে হয়। এ ঘরখানায় জালটা ছড়িয়ে চুপ করে মুখ বুজে বসে থাকবে কেবল সে এ কদিন।

তবু কোন গতিকে জোড়া তালি দিয়ে দোকান ভাড়াটা শান্তর মাইনে থেকে দিয়ে দিতে পারে সে। মোটা খরচ বলতে বাকি রইল হেবোর মাইনে দশ টাকা, ইলেট্রিক খরচ আর টেস্ক—তা কোন গতিকে এ পর্যন্ত সে মিটিয়ে দিয়েছে মাসে মাসে। আর হেবো শালা মাল খরিদ করতে

গিয়ে কমিশন্‌-বসায়, ছোঁচকা স্বভাব ব্যাটার। নিতাইও তাই মাইনে দেবার বেলা দেয় সুযোগ মত। এসব ত হল রোজকের বকেয়া, কিন্তু চাটুজ্জের যে কথাটার নির্মমতা তার মনে তপ্ত কাটারির মত দেগে দিয়েছিল, সেটা সে মনেও কখন স্মরণ করলে অমনি না না করে ওঠে। দেনা। দেনায় সর্বস্ব তার বিকোনো। একটা একশো বাতির শেড দেওয়া বাতি জ্বেলেছিল নিতাই, আলো গিয়ে বিচ্ছুরিত হয়ে ফিরে আসছিল আলমারীতে সাজানো গাঢ় আকাশ রংএর প্রজাপতি আঁকা চিনেমাটির সেটগুলোর গা থেকে। কি সুন্দর দেখতে! আহা, চোখ ফেরানো যায় না। যেন ফুলশয্যের রাতের মোলায়েম আলো বেরিয়ে আসে গা থেকে। দেনায় বিকোনো সব—সব বন্ধক তার শেঠ ঝগ্‌ড়ুরামের কাছে। কি কুক্ষণে যে নিতাই ওই সেটগুলোর দিকে চোখ মেলে তাকিয়েছিল। একদিন রাধাবাজারের এক পাইকারের গুদামে সদ্য প্যাকিং খুলে বের করছিল দোকানী। তেমন জিনিষ কখন দেখেনি, ভেবেছিল, লোকে চোখ ফেরাতে পারেনা যা থেকে—চমকে দেবে খদ্দেরদের। নিয়ে গিয়ে সাজিয়ে রাখবে থরে থরে, অন্য দোকানীরা টের পাবার আগেই—সদর সড়কে তার দোকানের সেরা মাল—হুহু করে লোক ছুটে আসবে দোকানে। আর আমদানীর বাজার যেমন চড়া দামেই বিকতো। তাই সে ঝগ্‌ড়ুরামের একান্ত সহানুভূতিশীল সাহায্যটুকু নিয়ে কৃতার্থ হয়েছিল। টাকায় আনা সুদ, কিন্তু লাভ টাকায় ছ-ছ আনা; আর এ মাল কখনো পড়ে থাকে না। কিন্তু নিতাইয়ের বুক দমে যায় ভাবতে, সেই থেকে ওগুলো পড়ে রয়েছে। আরও কতকি পড়ে আছে আবর্জনা হয়ে। কেবল ঝগ্‌ড়ুরামের সুদ পড়ে থাকতে পায় না। ক্রমে সুদের টাকা দিতে আবার ধার করে নিতাই। সুদ বেড়ে ওঠে। মাল থেকে গোটা দোকানই বন্ধক নেয় ঝগ্‌ড়ুরাম। কোন পথ সে খুঁজে পায় না, না বেরোবার না টিঁকে থাকার। সুদ দিতে হবেই, হয়ত মামলা টাঙিয়ে রয়েছে নিতাইয়ের ঘাড়ের ওপর। আদালতের হুকুম এনে দোকান শীল করে দেবে। তারপর? নিতাই কিছুতে ভাবতে চায় না। ভাবতে পারে না। দোকানের এই চিনেমাটির পাত্রঘেরা ছবি। এ যে তার চিরকালের। এর বাইরে আর সব কিছুই ঠুনকো জাপানী পেয়ালার মত, ঠেকা লাগলেই ভেঙ্গে যায়। পড়ে থাকে কুচিগুলো। কিছুতেই নিতাই ছেড়ে যেতে পারবে না আশ্রয়টুকু। বাপ পিতেমোর হাতে গড়া। বরং গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে থাকবে ও বরগা থেকে। নে শালা

সুদখোর কসাই, আমাকেও নে ওর সাথে। কিন্তু না, তা সম্ভব নয়। কেন নিতাই হাল ছাড়বে? টাকা জোগাড় করতে হবে। সেদিন চাটুজ্জে বিদায় নেবার অনেকক্ষণ পরেও নিতাইয়ের মনে কথাটা ঘুরতে লাগল। মূলধন চাই। মূলধন থাকলে লাভ হবে, দেনা শোধ হয়ে যাবে। আঃ! প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিতে পারবে সে। আগমনীর বাঁশি যেন বেজে ওঠে অমনি মনের কোথাও।

শরতের রোদ ধোয়া দিন। ঝগড়ুরাম একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র। কিন্তু কোথায় মূলধন? হিসেবের খাতার ওপর ঝুঁকে পড়ে নিতাই দাগ টানে। সওয়া পাঁচ টাকা মোট বিক্রি। তার হাত বন্ধ। ভয় হয় পাছে ভুল করে বসে। ছোট পিসীর গয়না সত্যিই কি আছে বুড়ির হাতে? দুরন্ত স্রোতে সে যেন তলাতে তলাতেও দেখে স্বর্ণময় অলঙ্কারের গড়নগুলো। বাক্সের ডালার নীচে ঝকমক করছে। ভাবতে ভাবতে নিতাই ভেসে যায়। এ দুস্তর বাস্তব আর জেগে থাকে না। সে নতুন ব্যবসা খুলেছে, আলোয় চোখ ধাঁধানো রকমারি জিনিস ঝলমল করছে। আর খরিদ্দারে মুখর হয়ে হয়ে গেছে নিঝুম দোকানটা। চাটুজ্জ্যে যেখানটা বসে ছিল সেই শূন্য জায়গাটার দিকে চেয়ে নিতাই ভেংচায়। তার সঙ্গে কোন দিনই সে কথায় এঁটে উঠতে পারেনি। অনামুখো মিন্সে তার পয়সায় রোজ চা তামাক খেয়ে টিপ্পুনী কেটে তবে বাড়ী ফেরে। বলে এটুকু রোজ না বেড়ালে তার অম্বলের ঢেঁকুর সারে না। যাক একমাঘে শীত যায় না, তারও দিন আসবে। সেদিন দোকান বন্ধ করতে করতে অকারণে হেবোর কানে একটা চিমটি কেটে বাড়ী ফিরে গেল নিতাই।

দশ

কয়েকটা টাইপ করা কাগজ গুছিয়ে নিয়ে কুঞ্জবাবু চেয়ারটা পিছনে ঠেলে দিয়ে উঠে এলেন। রায়বাবু সই করলে পর পাঠাবেন ডেস্‌প্যাচে, শান্তনুর টেবিলে। কতকগুলো চিঠি খুঁটিয়ে পড়েন আজকাল, তার বেশীর ভাগই তাঁর ডিক্টেশানেই লেখা হয়। কতকগুলো কুঞ্জবাবু নিজেই তৈরী করে দেন। তবে রায়বাবু মাঝে মাঝে ঠিক যে জায়গাটায় একটা শব্দের ভুল, সেখানটাতেই পেন্সিল দিয়ে একটা লাল আঁচড় করে দেন। আর কিছু নয়। কখনও দেখা যায় লাল আঁচড়ের ওপর একটা সংখ্যা ভুল ছাপা। কেন এমন হয়। আজকাল কাজ করতে করতে প্রায়ই ভুল হয়; কিন্তু জানতে পারেন না। উঠে পড়ে কুঞ্জবাবুর মনে হল—কাগজগুলো সব ঠিক লিখেছেন ত'। কেমন একটা অনিশ্চয়তা ফুটে ওঠে নিজের কাজে—হয়ত রেফারেন্স টুকতে ভুল হয়ে গেছে। কোথাও বা সঠিক লেখা হয়নি বা তেমনি আরও কিছু। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে হাত কাঁপে, সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পান না। সব আর তেমন আগেকার মত চট্ করে ধরতে পারেন না। মন থাকে কোথায়? কোথায় তা তিনি ঠিক নিজেও জানেন না, যেন ঘুমিয়ে পড়ছে দিনে দিনে আর বছরগুলো এক অবিশ্রান্ত বিকেলের আলোয় ধীরে ধীরে মুছে যেতে চায়। অথচ তিনিই ছিলেন অফিসের সবচেয়ে হুঁসিয়ার কর্মচারী, কাজের নাড়ীনক্ষত্র তাঁর জানা থাকত। আজকাল কি যেন কেবলই চলে যেতে চায় তাঁর কাজের আঙ্গুলগুলোর ফাঁক দিয়ে। রায়বাবুর চোখ তা এড়ায় না। ঠিক কোথায় ভুলটা তা কাগজ হাতে না করেও টের পান তিনি।—কুঞ্জবাবু ওদের সেই নোটটা লিখে পাঠিয়েছেন ত? আচমকা জিজ্ঞাসা করে বসেন। কুঞ্জবাবু থতমত খেয়ে ভাবেন হয়ত লিখেছিলেন, আবার সন্দেহ হয় হয়ত ঠিক লেখা হয়নি বা লিখতে ভুলে গেছেন। মাথায় চুল যে জায়গাটায় পাতলা হয়ে আছে সেখানে চুলকোতে চুলকোতে ভাবতে থাকেন। রায়বাবু অপেক্ষা করে চেয়ে থাকেন। তিনি বুঝতে পারেন কাজটায় কোথায় ভুল হয়েছে, নইলে রায়বাবু জিজ্ঞাসা করবেন

কেন। এমনি প্রায়ই হয়। রায়বাবু অল্প কথা বলেন। বেশীর ভাগই চেয়ে থাকেন। কুঞ্জবাবুর ভয় করে সে চাউনিকে। তাঁকে যেন মনে করিয়ে দেয় কাজের বয়স তাঁর চলে গেছে, এবার তাঁকে গুটিয়ে ফিরে যেতে হবে। যেমন বিকেলবেলা গঙ্গার পুল পেরোতে পেরোতে তাঁর মনে হয় হয়ত কাল আর ফিরে আসবেন না, এমনি অহেতুক কোন কোন দিন একটা ভাব মনে আসে। কিন্তু যদি ফিরে নাও আসেন এই টেবিলে, যেখানে ত্রিশ বছরেরও বেশী প্রত্যহ এসে বসেছেন—এখানেই ত রেখে যাবেন নিজেকে। আজকাল টেবিল ছেড়ে প্রত্যহ অফিসের দরজা পেরিয়ে যাওয়ার সময়ে একটা খোলোস তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে আসে। একটা অংশ মাত্র। একটা পুতুলের আধখানা সরিয়ে নেওয়ার মত। আবার টেবিলে পরদিন ফিরে গেলে পুতুলটা জুড়ে যায়। যেমন এখন, এই মুহূর্তে—টাইপকরা কয়েকটা কাগজ হাতে ম্লান চোখে তিনি তাকিয়ে সামনে, কিছু না দেখে। পুরোটা—পুতুলের দুটো ভাগ—মাঝখানে সূক্ষ্ম চিড় খাওয়া দাগ। তিনি ভাবতে থাকেন এক এক করে তাঁর ভিতর থেকে কত কি স্খলিত হয়ে কখন কোথায় পড়ে গেছে। মায়া আর কত কি যা জড়িয়ে ছিল জীবনে, কতকাল সরে গেছে। তিনি আফিসের কেরানী, পুরোনো—খুব পুরোনো এত কালের, প্রায় চিরকালের মত অভগ্ন। লোকে বলে তিনি কাজ ভালবাসেন—আফিস ছেড়ে একদণ্ডও থাকতে পারেন না। তাই কি? নাকি তার ভালবাসার কিছু নেই—এমনকি তাঁর আপনাকেও? ভালবাসা মরে গেছে কবে—সে তাঁর যৌবনের আর প্রৌঢ়ত্বের সঙ্গে,—এখন তিনি বৃদ্ধ। তাই ওই টেবিলটার সামনে চেয়ারে বসে থাকতে চান—আধখানা পুতুলের সঙ্গে নিজে আধখানা মিশে—একটা সলতে উস্‌কে দেবার মত বার বার দিনে দিনে শিখাটা তুলে রাখবার অসম প্রয়াসে।

কাগজগুলোর দিকে নজর দিতে দিতে হঠাৎ চমকে উঠলেন। আরজেণ্ট ছাপ মারা একটা চিঠি—কাদের ক্রুদ্ধ তারবার্তার ফিরতি লেখা—অনেক আইনের খোঁচায় ভরা একটা বড় টাকার অঙ্ক জড়ানো চিঠিটায়। কি করে সেটা ফিরে এল তিনি ভেবে পান না। তারপর বুঝতে পারেন। আবার ভুল ঠিকানায় গিয়েছিল। চিঠিটা পড়তে পড়তে তিনি মুখ তুলে তাকালেন শান্তনুর টেবিলের দিকে। পিঠ একেবারে ঝুঁকিয়ে সে চিঠিগুলো টেনে টেনে খামে ভরছিল। এত নীচু হয়ে তার মাথা ঝুঁকে পড়েছে যে

মনে হয় কয়েক আঙুল দূর থেকে তবেই সে হাতের কাজ দেখতে পায়। কুঞ্জবাবু একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন—তারপর চিঠিটা কাগজের গোছা থেকে বার করে নামিয়ে রাখতে যান। হঠাৎ রায়বাবুর গলা তাঁর কানে এল—

—কুঞ্জবাবু, করেস্পণ্ডেন্সের ফাইলটা আনুন।

তিনি চমকে ফিরে তাকান। রায়বাবু হাত দুটো টেবিলের উপরে রেখে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। তাঁর সন্দেহ হয় হয়ত আগাগোড়া রায়বাবু তাঁর দিকে তেমনি চেয়ে ছিলেন। কাগজগুলো গুছিয়ে ফাইল হাতে তিনি এসে দাঁড়ালেন টেবিলের সামনে।

রায়বাবু কাগজগুলো পাল্টাতে লাগলেন।

—এই সব?

—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

—কোনটা বাদ পড়ে নি?—হঠাৎ মুখ তুলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন।

কুঞ্জবাবু তাঁর গলার স্বরটা বুঝতে পারেন না। রায়বাবু দেখতে পেয়েছেন তাঁর কাগজটা নামিয়ে রাখা? যদি দেখতে পেয়ে থাকেন তা হলে কি জবাব দেবেন? বলবেন—এইই সব, আর নেই কিছু।…কুঞ্জবাবুর চাইতে ভয় করে। একটা মিথ্যাকে ঢাকবার প্রাণপণ প্রয়াসে তাঁর দম আটকে আছে। কিন্তু কেন তিনি ঢাকা দিচ্ছেন? কি বাঁচাতে এত মর্মান্তিক প্রয়াস তাঁর? হয়ত সব কিছুই রায়বাবুর জানা। কত কি ঘটে গেছে হয়ত এর ভিতর—টেলিফোনে কথা হয়েছে—নয়ত দেখা হয়েছে তাদের সঙ্গে। চিঠিটা এখনও পৌছয় নি সে কথা দিনের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি আমতা আমতা করে বললেন—

—মনে হচ্ছে এই কটাই পাঠাবার জরুরী।

রায়বাবু সামনে ঝুঁকে পড়েন—

—আর যদি কোন চিঠি ফিরে এসে থাকে—?

কুঞ্জবাবু হাতের পাকা রোঁয়াগুলো আস্তে আস্তে দাঁড়িয়ে উঠতে দেখেন। লোকটার একটা অনৈসর্গিক ক্ষমতা রয়েছে জানার—জোর দিয়ে প্রত্যেকটি শব্দ উচ্চারণ করে বলার মধ্যে তা আরও পরিস্ফুট হয়ে উঠছে।

—তা হতে পারে—দাঁড়ান খোঁজ করে দেখি,—জড়িত গলায় বললেন তিনি।

—হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি আসুন—আমি ততক্ষণ এগুলো সারছি।—চোখ নামিয়ে রায়বাবু কাগজগুলো খুঁটিয়ে পড়তে লাগলেন।

কুঞ্জবাবু টেবিলে ফিরে এলেন। যেন চিঠিপত্রগুলোর মধ্যে খোঁজ করছেন এমনিভাবে কতকগুলো অদরকারী কাগজ তুলে নিয়ে দেখে আবার নামিয়ে রেখে দেন। কিন্তু তিনি দেখছিলেন না। যে চিঠিটা তাঁকে আবিষ্কার করতে হবে সেটা সামনেই মেলা ছিল। সেটা সরিয়েও রাখতে পারেন নি তাড়াতাড়িতে। পরিষ্কার হরফগুলোয় কোম্পানীর নাম ছাপা সাদা বণ্ড কাগজে তক তক করছিল। মাত্র একটা কাগজ। তিনি সাদাসিধে মানুষ, নিরিবিলিতে জীবন কেটে গেল, অথচ মনে হচ্ছে যেন সম্পূর্ণ কেটে এখনও যায় নি। এই কাগজখানা তাঁর জীবনে উড়ে এসে পড়েছে কয়েক মিনিট আগে, তাঁর সব স্থিতিশীল নিয়মগুলো ওলটপালট করে দিয়ে। তিনি আড়চোখে পড়বার চেষ্টা করলেন কি লেখা কাগজটায়; সম্পূর্ণ অর্থহীন মনে হয়; যাদুঘরে কাৎ করে রাখা কালো পাথরের চাতালগুলোর মত—গায়ে কি সব লেখা থাকে অদ্ভুত হরফে—বোঝা যায় না কিছু। কি করবেন কাগজখানা? রায়বাবুর টেবিলে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেবেন? তা হলে মিটে যায়। ফিরে এসেছে—ভুল ঠিকানায় পাঠান হয়েছিল বলে। তাঁর কোন দোষ নেই। তিনি কেবল একটু ভুল করেছিলেন, সেটা কোথায় চাপা পড়েছিল, চোখে পড়েনি। এইবার ভাল করে খুঁজতেই বেরিয়ে পড়েছে—কাজেই। রায়বাবুও বলবেন,—কাজেই তাঁর কোন দায়িত্ব নেই। তারপরে কতকগুলো বাঁধাধরা ক্রিয়া—কুঞ্জবাবু সেগুলো জানেন।

তিনি তেমনি বাঁধাধরা একটা ব্যাপার ঘটতে প্রায়ই দেখতেন বাল্যবয়সে। এখন কেন হঠাৎ মনে পড়ে বুঝতে পারেন না। তাঁর বাবা মফঃস্বলে কোন শহরের জেলসুপার ছিলেন। সে অনেককালের কথা—ছবিগুলো অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। খুব উঁচু উঁচু কতকগুলো দেয়াল। সকালবেলা কয়েদীরা মাথায় সাদা টুপি হাফ-পাজামা বেনিয়ান পরে জোড়ায় জোড়ায় সার বেঁধে পার হত। তিনি বাবার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতেন। কয়েদীরা আড়চোখে চাইত—দাঁত বের করে অদ্ভুত হাসত—তাঁর কেমন ভয় করত—মনে হত এই নিয়মবাঁধা নিয়মের নীচে কি যেন আল্‌গা রয়ে গেছে—একটু বেসামাল হয়ে গেলেই কয়েদীগুলো ঝাঁপিয়ে আসবে বুনো কুকুরের মত—আর তাঁকে আর তাঁর বাবাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে। কিন্তু কোনদিন ঘটত না। কখনও বাবার হাত ধরে জেলের কুঠুরী দেখতে যেতেন। মোটা গরাদে দেওয়া খাঁচার মধ্যে দেখা যেত অন্ধকারে এক একটা মানুষ বসে।

কারও কারও হাতে পায়ে লোহার বেড়ী পরানো। একদিকের কুঠুরী কয়েকটা প্রায়ই খালি থাকত। তবে যখনই কেউ আসত সেই কুঠুরীগুলোর কোনটায়, তাঁর বাবা রোজ একবার করে দেখতে যেতেন। তাঁর মনে পড়ে—বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে কেমন অদ্ভুত নিস্তব্ধ মনে হত। তারপর গরাদের ফাঁক দিয়ে আবছায়ায় বসা একটা লোকের দিকে চাইতেন তাঁরা—মনে হত যেন লোকটা জেগে নেই—ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকত কেবল—তাঁরা এসে দাঁড়ালেও তার চোখের মণি সরত না। যেন জেগে থেকেও কিছু দেখতে পেত না সে, দু'হাত মাথার উপর ধরে উবু হয়ে মেঝেয় বসে থাকত। তাঁর বাবা একটিও কথা বলতেন না। কোনদিন ভোর বেলা সূর্য ওঠার আগে উঠে বাবা তাড়াতাড়ি একজন সেপাইয়ের সঙ্গে বেরিয়ে যেতেন। হাতে কি সব কাগজপত্র রইত। তিনি এক রকম আশ্চর্য বোধ থেকে জানতেন—সেদিন কিছু অন্যরকম ঘটবে। একদিন বাবার সঙ্গে যেতে চেয়েছিলেন—কিন্তু বাবার মুখের ভাব দেখে ভয়ে তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এসেছিলেন। মাঝে মাঝে এই সকালগুলোয় বাবা গম্ভীর হতেন। তাঁর মুখের দিকে চাইতে ভয় হত। চোখের সাদায় লাল লাল আঁচড় ফুটে উঠত। বাবাকে যেন চেনা যেত না। ঘড়িটার দিকে চেয়ে বাবা উঠে যেতেন। কুঞ্জবাবু দৌড়ে গিয়ে উঠতেন দোতলার ছাদে। চিলে-কুঠুরীর কোনা থেকে দেখা যেত উঁচু পাঁচীল ঘেরা জেলের ছোট উঠোনটা। একটা গেট খুলে বাবা ঢুকতেন। পিছনে আরও অনেকে। তিনি স্পষ্ট দেখতে পেতেন। হাতে কাগজটা চেপে ধরে পিছনে হাত রেখে বাবা এসে দাঁড়াতেন দুটো থামের মত উঁচু কাঠের পাশে। তারপরে সেই কুঠুরীতে বসে থাকা লোকটাকে কয়েকজন সেপাই নিয়ে এসে ঢুকত গেট দিয়ে। তার হাত দুপাশ থেকে ধরে থাকত দু'জন। তার মাথা ঝুঁকে থাকত সামনে, যেন সেটা আলগা করে বেঁধে রাখা ধড়ের সঙ্গে। সেপাইরা তাকে ঠেলে তুলত থাম দুটোর মধ্যে একটা উঁচু বেদীর মত জায়গায়। একটা কালো টুপী তার চোখ-মুখ ঢেকে বুক অবধি নামিয়ে পরিয়ে দেওয়া হত। তিনি মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে দেখতেন আলসে থেকে ঝুঁকে। তার হাতের কব্জি দড়ি দিয়ে একজন সেপাই পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধত। তারপর পায়ের গোছ বাঁধত। বাবা কাগজটা তুলে পকেট থেকে চশমা বের করে কি যেন পড়তেন—তারপর পাশে ডাক্তারবাবুর দিকে ফিরে কি বলতেন। তিনি শুনতে পেতেন না,

—ঠোঁট দুটো নড়তে দেখতেন খালি। একটা ঝোলান দড়ি লোকটার গলায় পরিয়ে একজন সেপাই আঙুল গলিয়ে দেখত ঠিকমত বসেছে কিনা। বাবা পকেট ঘড়ি বার করে চেয়ে থাকতেন একটা হাত তুলে। তারপর হাতটা নামাতেন। হঠাৎ লোকটা বেদীর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যেত পুতুলের মত। ঝোলান দড়িটা একটু কাঁপতে থাকত। তারপর স্থির হয়ে যেত। সকলে আস্তে আস্তে চলে আসতেন। কুঠুরীটা খালি থাকত যতদিন না অন্য কেউ আসে।

কুঞ্জবাবু অন্যমনস্ক হয়ে চেয়েছিলেন সেই অনেক দূরের বাল্যকালের ধোঁয়াটে অস্পষ্ট ছবিগুলোর দিকে। সামনে কাগজখানা পড়ে থাকে। তিনি আস্তে আস্তে সেটা কুড়িয়ে নিলেন। রায়বাবুর টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। রায়বাবু মুখ তুলে তাকান। তিনি কাগজটা এগিয়ে দিলেন। রায়বাবু সেটা পড়ে দেখেন। তারপর একবার দূরে আবছায়ায় টেবিলটার দিকে তাকাতে থাকেন। কুঞ্জবাবুও তাকান আস্তে আস্তে ঘাড় ফিরিয়ে। মোমবাতির কাঁপা আলোয় একটা মূর্তি ঝুঁকে রয়েছে টেবিলের উপরে। দুটো বাঁশের ফাঁপা নলের মত হাত চিঠিগুলোকে টেনে টেনে খামে ভরছে—ওজন করছে—কলম ঘষে ঘষে ঠিকানা লিখছে।

—মাছে মাঝে ভুল করে বসে,—অস্ফুট গলায় বললেন কুঞ্জবাবু। রায়বাবু মুখ তুলে তাকালেন। কুঞ্জবাবু অন্যদিকে চেয়েছিলেন বলে চোখোচোখি হ'ল না তাঁদের।

—হ্যাঁ। মাঝে মাঝে কোম্পানীর দশ বিশ হাজার টাকাও ভুলে লোকসান হয়। কিন্তু হওয়াটা উচিত নয়। সে কথা আপনি জানেন।—

একটা ঠাণ্ডা হাওয়া শির শির করে কুঞ্জবাবুর পুরোনো হাড়গুলোয় এসে লাগে, তিনি চমকে ফিরে চান। রায়বাবু কাগজ টেনে নিয়ে কলম তুলে লিখতে থাকেন। তারপর ব্লটিং কাগজে শুকিয়ে সেটা সরিয়ে রাখেন।

কুঞ্জবাবু বুঝতে পারেন। কিসের একটা ওজন চেপে ধরে ছিল এতক্ষণ, সেটা সরে যায় বুকের মধ্যে। মনে হয় তাঁর দাঁড়িয়ে থাকা আর অসংলগ্ন। আবার মনে হয় তিনি কিছু বলবেন, কিন্তু যে কথাগুলো মনে আসে তা এত অর্থহীন ঠেকে যে তিনি কিছু বলবার চেষ্টা করেন না। হঠাৎ তাঁর ইচ্ছা হয় বিদায় নিতে। তিনি বুড়ো হয়েছেন, মনে হয় বয়সটা শতাব্দীর দেয়ালে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এসে শেষে পৌছল। এবারে এই দেয়ালের বাইরে তিনি বসে পড়বেন। তারপর চোখ বুঁজে থাকবেন। কানে অর্থহীন শব্দগুলো দোলা

খেতে থাকে।—মাঝে মাঝে—মাঝে মাঝে—বড় এক একটা ভুল হতে থাকে—ভুল থেকে ভুলে খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙ্গে পড়ে স্বর্ণাভ জীবন। স্মৃতিগুলো মুছে যায়, মোহগুলোও, এক নিরাকার অর্থহীনতায় পৌঁছে শেষে থেমে থাকেন তিনি।

কুঞ্জবাবু টেবিলে ফিরে এলেন। দূরে মোমবাতির শিখায় একটা গালার টুকরো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শান্তনু গলাচ্ছিল। সে দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তার মুখটা দেখতে পান কুঞ্জবাবু। কি জানি—সন্দেহ হয় তাঁর—মুখটায় কেমন একটা উজ্জ্বলতা ফুটে উঠেছে। আলো পড়ে অমন দেখায়, না অন্য কোন কারণ যা সে নিজেও জানে না? তিনি অন্যমনস্ক হয়ে ফাইল টেনে কাজ করতে থাকেন।

এগার

—না বাপু, তোমাদের ঘর সংসারে আর আমি খেই ধরে থাকতে পারব না। এবারে বুঝে নিয়ে আমায় মুক্তি দাও। কত ঠাকুর দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করি, ঠাকুর এবার ত অনেক হয়েছে, অনেক খেলা দেখালে তোমার ত্রিসংসারে, আর কেন? এবার ছাড়া পেলে বাঁচি।—মনে মনে আবৃত্তি করছিলেন একটা কথাই বারে বারে করুণাদেবী।

নিতাই অল্পক্ষণ আগে বেরিয়ে গেছে। শান্তনু আফিস চলে গেছে। সৈরীর মা এসেছিল, তাকে বাজারে পাঠিয়েছেন কয়েকটা জিনিস আনতে। আজ ষষ্ঠী—তাঁর কয়েকটা উদ্যোগ আছে ছেলেদের কল্যাণে। হঠাৎ ঠোঁটের কোণে একটা বক্রিল রেখা ফুটে ওঠে তাঁর। বাজারের সময় বলে দিলেন—ভাল দেখে দুটো মর্তমান কলা, একটু বাতাসা আর দই আনতে। ফিরে এসে বলল—বাজারে ওসব উঠে গেছে!

পিঁড়ি পেতে বসে হাতের মুঠোয় থুত্‌নী রেখে করুণাদেবী চেয়ে ছিলেন বাইরে। আকাশে সাদা মেঘ ভেসে আসছিল মাঝে মাঝে, নরম ছায়া গড়িয়ে এসে পড়ছিল উঠোনে। তাঁর মনটা যেন বাইরের গলি দিয়ে হেঁটে চলে যায়। গলির মুখে সদর রাস্তা। তিনি থমকে ভাবেন কোথায় যাবেন; রাশি রাশি মানুষ হেঁটে চলেছে। পথঘাট চেনেন না। কতকাল বাড়ীটার বার হন নি। এমনকি মহাষ্টমীর আরতি দেখতেও। কানে আসে ঢাক ঢোলের আওয়াজ। গলি দিয়ে পায়ের শব্দ এগিয়ে যায়। নিতাই দোকানে বসে থাকে। পূজোর সময় বিক্রি বেশী। কতদিন সৈরীর মা বলে—বৌদি চল মায়ের আরতি দেখে আসি। তাঁর মন ওঠে না। বলেন তোরা যা—আমার এখান থেকেই ঠাকুর পেন্নাম সারা হবে, বা বলেন—ওপরে মা দুগ্‌গা জগদ্ধাত্রীর ছবি, ওখানে বারমাস আমি মাথা ঠেকাই।—আসল কথাটা তা নয়। তাঁর ভয় করে যেতে। বাইরের কোলাহলময় জগতটার কথা কতদিন হল ভুলেই গেছেন। সেখানে ঢুকে আবার ফিরে এলে কি দেখবেন—হয়ত কেমন অন্যমত মনে হবে। তার

চেয়ে এই ভাল। কিন্তু এও যে আর সয় না। দিনে দিনে মনটা কেমন অস্থির হয়ে ওঠে। একঠাঁই ধরে রাখতে পারেন না। কোথায় বুড়ো হয়েছেন—জপ তপ করে গুটিয়ে নেবেন ভেতরে—তা না—কেবলই যেন বালিকার অবাধ্য চাউনির মত চোখ ছুটে যেতে চায় পথের দিকে—পথের অগাধ চিরবিরামহীন স্রোতের দিকে। ইচ্ছে করে নিজেও মিশতে গিয়ে সেখানে। আর দেয়ালগুলো যেন আরও চেপে ধরে। মাঝে মাঝে ছাদে গিয়ে চেয়ে দেখেন চারদিকে। ওই দূরে হলদে বাড়ীটায় একটা নতুন বউ এসেছে ক' মাস আগে। নতুন বিয়ে হয়েছে, সাধ আহ্লাদে আটখানা। জানালার কাছে এসে মাঝে মাঝে দাঁড়ায়। তিনি দেখেন চেয়ে চেয়ে—অনেকটা দূর বলে চোখাচোখি হলেও ওর ভাবটা বুঝতে পারেন না। যেন অষ্টপহর বাইনাচ নেচে বেড়াচ্ছে—আহা বেহায়াপানার একটা সীম থাকা উচিত!

ভারী সুন্দর দেখতে কিন্তু বউটা। পানের মত মুখখানি, ঢলঢলে চোখ, রং কালোর ওপর মাজা পরিষ্কার, চুল এলিয়ে পড়ে পাছা অবধি যখন নেয়ে এসে জানলায় রোদে মেলে ধরে। তাঁর যদি অমন একটা বউ ঘরে থাকত, তা হলে হাতে করে মুখটিতে মিষ্টি তুলে খাওয়াতেন। পূজোয় যেতেন সঙ্গে নিয়ে কালীবাড়ী। মনটা উদাস হয়ে আসে। হঠাৎ আরেকটা ছবি মনে আসতে শিউরে ওঠেন তিনি। সেদিন সকালের ঘটনাটা মনে পড়ল। বেহায়া সৈরী হারামজাদী দুদিন পর পর এসে তাঁকে যেন পাগল করে তুলেছিল। গলার খনখনে আওয়াজটা এখনো যেন কানে এসে স্যাকরার হাতুড়ির মত ঠুকতে থাকে। ওই গতর আর বেলেল্লা চাউনি, তাঁর তীর্থের জুড়ী হয়ে যাবেন বৃন্দাবনে। ধিক্ ছুঁড়ীর নরজন্মে! ছিঃ! কিন্তু তার থেকে তিক্ত ছবিটা ফুটে ওঠে দুদিন নিতাইয়ের হাবভাব মনে পড়তে। এতটুকু সরম নেই—তার চাউনিটা ভাবলে এখনও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ইচ্ছে করে জন্মের মত চলে যেতে। কেন তিনি মুখ গুঁজে রয়েছেন? কথাটা মনে মনে ওজন করতে থাকেন। সব পাওনা থোওনা মিটে গেছে তাঁর। কিন্তু গিয়েছে কি? আর কোন পথ খোলা নেই? দেবতা ভুলে গেছেন তাঁকে?

বউ হয়ে যখন এসেছিলেন এবাড়ী—এক বিধবা পিস্‌শাশুড়ী মাঝে মাঝে গাঁটরি মোটরি নিয়ে আসত। থাকত কাশীতে। কত গল্পইশুনতেন।

কত বিধবা একা একা থাকে, দৈনিক বিশ্বেশ্বরের মাথায় গঙ্গা থেকে জল তুলে এনে ঢালে। পাড়ায় পাড়ায় বিন্তি খেলে বেড়ায়। ভাগবত-গীতা পাঠ হয়। যাত্রা হয় কখনো। দিনগুলো গড়িয়ে যায় লঘু পায়ে। হঠাৎ করুণাদেবীর মনে হয় ছুটে চলে যেতে। এইতো এখন কেউ নেই—তোরঙ্গটা একটা রিস্‌কা ডেকে তুলে চলে যান। খান কতক নোট স্যাক্‌রার কাছ থেকে নিয়ে এসেছেন। আরও ঢের আছে সোনায়। তাঁর হেসে খেলে চলে যাবে। কেউ জানতে পারবে না। চুপি চুপি চলে যান। কিন্তু করুণাদেবী কিছুই করেন না। পাথরের মূর্তিমত মগ্ন হয়ে তাকিয়ে থাকেন চেয়ে। সৈরীর মা ফিরে আসে। ঝোলাটা নামিয়ে রাখে মেঝেয়।

—মা গো!—বাবা কি রোদ্দুর! সেই থেকে বসে রয়েছ বৌদি? ওপরে যাও টাও নি?

করুণাদেবী কথা বলতে গিয়ে অনুভব করেন চোয়ালটা আড়ষ্ট হয়ে ধরে গেছে। হঠাৎ কোন জবাব মুখ দিয়ে বেরোয় না। শেষে বলেন—না, আর গেলাম কই। ভাবছিলাম তুই এসে পড়বি।

—তা আমি তাড়াতাড়িই আসতুম। পথে গোকুলের বউয়ের সাথে দেখা—দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলতে বেলা বেড়ে গেল—বলে সৈরীর মা ধপ করে বসে পড়ল মেঝেয়।

—গোকুলের বউ গাঙ্গুলী-বাড়ী হাঁড়ি মাজে। একটা ঠাঁই পেয়ে বেঁচে গেছে ছুঁড়িটা। নইলে সোয়ামী মরে যাওয়ার পর কোলের ছেলেটারে নিয়ে বড় হায়রান পেয়েছিল কদিন। পেটে খেতে না পেলে মানুষের মতিগতি ত বোঝা যায় না বৌদি—কদিন ধরে পাড়ার এক কুটনি মাগী ওরে ফুসলোচ্ছিল। বলছিল—চ' তোকে নিয়ে যাই কোন এক বাবুর কাছে। বাবু খুব বড়লোক—কাঠের আড়তের মালিক। গোকলোর বউটার বয়স অল্প—দেহটার গড়ন গাড়নও মন্দ নয়—যদিও খেতে না পেয়ে পেয়ে ছুঁড়ি মাসজিয়োনো সিঙ্গি মাছের মত দেখতে হয়েছিল। সে সময় গাঙ্গুলীদের গিন্নী একদিন আমায় বললে কথাটা। সেই থেকে ছুঁড়ি ওখানে বহাল হয়েছে— বুঝলে বৌদি—

—গাঙ্গুলীগিন্নী ফিরেছে তা হলে?—উৎকর্ণ হয়ে উঠে বললেন করুণাদেবী।

—ফিরেছে সেকি আজকে! সেই মাঘে ফিরে এসেছে। তবে জানো কি বৌদি—বলে হঠাৎ গলা নামিয়ে সৈরির মা ঝুঁকে পড়ে আবার বলতে থাকে,—নাকি আর বেশীদিন থাকতে পারবে না। বড় বউটা এমনিতেই

খাণ্ডার তার ওপর বিএ পাস। শাশুড়ীকে আড়াল থেকে কেবল গালি পাড়ে। তাই আবার চলে যাবে। তা গিন্নী যেতে পারে। কর্তা মরার সময় সুবন্দোবস্তই করে রেখে গেছলেন—

—বউ নিয়ে ঘর করতে পারল না?

—পারলে আর যাবে কেন বল। বলে কিনা মনে ভক্তি থাকিলে যেখানেই বাস করো সেখানেই কাশীবাস। সাক্ষাৎ বিশ্বনাথের ঠাঁই আর কজনা পৌঁছতে পারে।

করুণাদেবী মনে মনে ভাবেন কথাটা—সৈরীর মার যুক্তিগুলো তাঁর মনে ধরে না।

—গাঙ্গুলীগিন্নীকে বলিস আমার নাম করে যে নিতাইয়ের মা বিশ্বনাথ দর্শনে যেতে চাইছে—গেলে একটু যেন খবর পাঠান।

সৈরীর মা কিছুক্ষণ আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইল। শেষে বলে উঠল—

—তুমি সত্যি সত্যি যাবে?

—যাবো না তো কি তোকে এমনি বলছি! বুড়ো হয়েছি, কবে চোখ বুজি তা আর জানি কি, জীবন ভোর এ বাড়ীতেই ত কাটালাম—ছেলেবেলা বাপ মা হারিয়েছিলাম। বিয়ে হলে সেই যে এসে ঢুকেছিলাম এই গলি দিয়ে, এতগুলো বছর এই বাড়ীতেই কেটে গেল। এখন বিশ্বনাথ যদি টানছেন—

—একা একা যাবে বৌদি?

—কে আছে আর ত্রিসংসারে যে সঙ্গে যাবে?—বলতে বলতে গলা ভারী হয়ে এল তাঁর।

—তা বলব গাঙ্গুলীগিন্নীকে।—বলে চুপ করে থাকল সৈরীর মা।

—আচ্ছা বৌদি তিথে গিয়ে থাকলে ছেলেরা টাকা কড়ি পাঠাবে?

—ওদের ধম্ম বুদ্ধিতে যা বোঝে তাই করবে—আমি ত কেবল বাবা বিশ্বনাথের চরণটুকু আশ্রয় করে যাচ্ছি।—বলে করুণাদেবী আড়চোখে তাকান ওর দিকে।

সৈরীর মা বুঝতে পারে না। এ বাড়ীর দৈন্যদশা সে জানে। তার মাইনের টাকাও বারোমাস পায় যে তেমনও নয়। তা ছাড়া নিতাইয়ের টাকা সম্পর্কে মনোভাবও তার সুবিদিত। কতদিন গিন্নী পেটের কথা উগরে দেয় তার কাছে—বলে গায়ের ঝাল মেটে। কিন্তু কোনদিন যে রাস্তায় বেরোয়নি সে কোন ভরসায় বিশ্বনাথ দর্শনে চলেছে, কিসের উপর নির্ভর করে কাশীতে থাকবে! তবু বলল—

—ওমা সেকি গো! বুড়ো মাকে কেউ দেবে না! আমি শান্তকে বলব—সে ত মাস গেলে সত্তর আশীটাকা রোজগার করে। আর তোমার একটা মানষের কিই বা খরচ লাগবে।

মনে মনে করুণাদেবী হঠাৎ অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠেন।—তুই থাম দেখি! সব উগ্‌গারটুকুই ওঁরা করেছেন! এখন টাকা খরচা করে মাকে কাশীবাসী করতে বাকি।—বলে হঠাৎ গলা নামিয়ে বলেন—শোন সৈরীর মা—সেই স্যাকরা মিন্‌সেকে একবার খবর দিয়ে আনতে পারিস এখানে? না থাক, আমি তোর সঙ্গে একদিন দুপুর বেলা চুপি চুপি যাব। দেখিস, ঘুন্নাক্ষরেও কেউ না জানে, জানা জানি হলে নিতাই কুরুক্ষেত্তর বাধাবে। তোতে আর আমাতে একদিন বেরোবো। আমার একটা গলার হার আছে—বুঝলি, গিন্নীর হাতের দেওয়া। ভেবেছিলাম নিতাই আবার বে করলে বৌমার গলায় পরিয়ে দেব। তা সে আমার কপালে নেই। সেই হারটা, বুঝলি—স্যাকরাকে বলিস আমার নগদ টাকা চাই। বন্ধক দিতে চাইনে।—শেষের কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলেন করুণাদেবী। তাঁর গলা কেঁপে যায় শেষের দিকে। সৈরীর মা চোখ বড় বড় করে শুনছিল।

—তোমার এক গাছ হার আছে তা জানতাম না, বৌদি! নিতাই জানে?—

ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে ইসারা করলেন করুণাদেবী। দেয়ালগুলোকে তাঁর অবিশ্বাস হয়,—কেউ জানে না। ওটুকুই সম্বল। তোকে এই বললুম। কাউকে বলিস নে, তোর মেয়েটাকেও না। গাঙ্গুলীগিন্নীকে বলিস—কবে যায় আমাকে যেন খবর দেয়।

সৈরীর মায়ের বিস্ময় কাটে না। গিন্নীর গলার স্বরে কি ছিল, তাকিয়ে তাকিয়ে বুঝবার চেষ্টা করে, যেন মরা ছাই উড়ে গিয়ে কয়েক টুকরো জ্বলন্ত অঙ্গার ফুটে ওটে গিন্নীর ভিতরে। তবুও এই অভাবনীয় সম্ভাবনায় সে উদ্বিগ্ন বোধ না করে পারে না।

—বৌদি, তুমি চলে গেলে শান্তকে দেখবে কে?—হঠাৎ সে অনুনয়ের সুরে বলে উঠল। করুণাদেবীর কানে যেন প্রবেশ করে না তার কথা। মুখের রেখাগুলো পাষাণে খোদাইয়ের মত স্থির হয়ে থাকে। জবাব না পেয়ে সৈরীর মা আর কিছু বলতে সাহস পায় না। তার মন ভার হয়ে ওঠে। একটুক্ষণ বসে থেকে সে উঠে গেল।

বার

দোকানের মধ্যে থেকে নিতাই চেয়ে দেখছিল রাস্তা দিয়ে লোকচলাচলের ধারাটা। দুপুরে সব কিছু ঝিমিয়ে পড়ে। মানুষ জন হাঁটে কম। ফলওয়ালা চুপড়ি মাথায় তুলে নিয়ে ছায়ায় গিয়ে বসে। ফুটপাতের গা ঘেঁসে রিক্সা টেনে রেখে রিক্সাওয়ালা পা রাখবার জায়গায় কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে চোখ বোঁজে। রেষ্টুরেণ্টে চেয়ার উল্টো করে তুলে দিয়ে ছোঁড়ারা মেঝেয় গামছা বিছিয়ে নিদ্রা দেয়। কুকুরগুলো ডাষ্টবিন থেকে যা পায় ঘেঁটে ঘুঁটে বেছে খেয়ে চিৎপাত্তির হয়ে শুয়ে থাকে। ভিখিরীগুলোও তাই। এ সময় নিতাই রাস্তার দিকে চেয়ে থেকে মনটাকে একটু আলগা দিয়ে ছেড়ে দেয় ভবিষ্যতের পানে। এইটেই অবসর, নিরিবিলি, নির্ঝঞ্ঝাট—মায় মাছিগুলোও বসে থাকে পাটির ওপর যোগীর মত স্থির হয়ে।

নিতাই দেয়ালে পিঠ হেলান দিয়ে ডেস্কের ওপর বাঁ কনুই ভর করে মাথাটা ধরে থাকে মুঠোয়। শরীরটা আধশোয়া করে এলিয়ে দেয় তক্তপোষে। শুয়ে শুয়ে চেয়ে দেখে শূন্য রাস্তার দিকে। এ সময় তার চোখের মণিদুটো সচরাচর স্থির হয়ে থাকে। চোখের পাতা অর্ধেক পথ নেমে এসে সেখানেই থেমে থাকে তুলি দিয়ে আঁকা রেখার মত, পড়ে না। কিন্তু আধখানা মণির মধ্যে দিয়েও নিতাই দেখতে পায় কড়া রোদে দগ্‌দগে রাস্তা। সদর হলেও কদাচিৎ এক আধজন হেঁটে যায় এ সময়ে সামনে দিয়ে। কখনো একটা ছাতাওয়ালা পিঠে ছাতার পুরোনো উলিধুলি ছেঁড়া কাপড় শিক কলকব্জা ইত্যবিধ নানা কিছু বোঁচকা বেঁধে ক্লান্ত পায়ে হাঁটে।—ছাতা সারাবে—এ—ছাতা—হাঁকটা মিলিয়ে যেতে যেতে মুখ তুলে তাকায় ভরা-দুপুরের মেঘহীন স্থির আকাশের দিকে। তার চোয়ালের উঁচু হাড় ঢেকে থাকা চকচকে চামড়ার নীচে দড়ির মত শির, কোটরে পিছিয়ে যাওয়া নিরাশ চাউনিকে ব্যঙ্গ ক'রে আকাশ হাসে। নিতাই চেয়ে চেয়ে দেখে লোকটার কুঁচকে থাকা মুখের ভাবখানা। আকাশের সঙ্গে সম্পর্ক বেচারীর—মেঘ জড়ো হয়ে এলে দু-বেলা দু-থালা ভাতের পাকা-

পোক্ত বন্দোবস্ত ওর চাউনিতে ফোটে। এখন এই নীলার মত জলজলে আকাশ যেন পেটরোগা কুমীর !

মধ্যাহ্নে এমনি ঘণ্টা তিনেক সময় নিতাই এমনি নানা জিনিষ খুঁটিয়ে দেখে আধবোঁজা চোখের পাতার মধ্যে দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে মনটা তার অতীত আর ভবিষ্যৎ উভয় দিকেই পাি দয়,— কেবল বাঁধা থাকে না বর্তমানে। তার কল্পনা সৃষ্টি করে চলে যা সে ভালবাসে কল্পনা করতে। কিন্তু নিতাই যেহেতু বাজারের ঘুঘু সেই হেতু সে জানে বাস্তব আর কল্পনার ভিন্নতা। সময়টাও তাই সে স্থির করে রেখে দেয়— কল্পনার সময় ভরা দুপুর বেলা। কারণ তখন খদ্দের-পাতি নেই—পথ চলে যত ভবঘুরে বেকার হাভাতের দল। বর্তমানকে এই মধ্যাহ্নের স্তব্ধ প্রহরে সম্পূর্ণ অস্বীকার করারও একটা মনোভাব খুঁজে পায় সে কোথাও থেকে। কেবল শনিবারে কিছু ব্যতিক্রম ঘটে—আফিস ফেরৎ দু-একজন কোত্থেকে ঝপ করে দোকানে এসে ঢোকে—কাচের দু-একটা বাসন নাড়ে চাড়ে—দরটা মন দিয়ে শোনে। তারপর দু-একটা এ্যাঁ উঁ করে চোরের মত এদিক ওদিক চেয়ে আবার সুট্ করে নেমে যায় বাইরে। নিতাই তখন ঠোঁটের কোণে দ্রুত মুছে যাওয়া হাসি আর চোখের কোণে ক্রোধ ফোটাতে ফোটাতে দু-একটা বাক্যের লোষ্ট্রনিক্ষেপ করে,—বা—বাঃ—হয়ে গেল—কেনা খতম -- এবার বাড়ি গিয়ে ঢেঁকুর তুলবে !—এইমত দু-একটা আপ্ত উক্তি।

হাতের কাছে অনাদৃত কাচের পেয়ালা পিরীচগুলো ঝাড়ন দিয়ে পুঁছতে পুঁছতে নিতাই ক্ষুণ্ণ হয়ে তাকায়—যেন আঘাতটা তাদের গায়েই লেগেছে বেশী। সে সস্নেহে একটা ডিসের গা থেকে অণুবীক্ষণে প্রতীয়মান একটা ধুলোর দাগ মুছে ফেলতে ফেলতে ভুরু কুঁচকে বলে—পছন্দ হয় না—বলে বাবার কালে এসব ব্যাভার করেচিস ?—তা নয়—ওধারে গাঁটের ও-কম্ম ফর্সা—যত সব ভিখিরীতে ভরে গেল দেশটা,—ইত্যাদি। এসব সময় হেবো ভুলেও কোন কথা বলে না। মুখটা মুখোশের মত করে ঝনকাঠে ঠেস দিয়ে বসে থাকে চোখে একটা দার্শনিকের নির্লিপ্ততা এঁটে। কারণ সে অতীতের দু-একখণ্ড অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছে, খদ্দের পালালে বাবু ষাঁড়ের মত খেপে যায় মনে মনে—সেখানে বে-ঝোঁকে কিছু বলে ফেললে শিংয়ের গুঁতোয় প্রাণ পরিত্রাহি হয়ে ওঠে। বস্তুত নিতাই তখন হাতের মাথায় যা পায় তাই পর পর নিক্ষেপ করে তার দিকে টিপ করে, যায় একদিন একটা রিজেক্ট চিমনি

ছুড়ে মেরে মাইনে থেকে কেটে নিয়েছিল দামটা। তাই হেবো খুব সাবধানে এ সময় তার ফড়েপুকুর বস্তিতে স্বল্পজীবনব্যাপী জ্ঞানের সঞ্চয় সাবধানে প্রয়োগ করে।

—শালা, বোঁ করে সস্তার শেটখানা ওপর থেকে নামিয়ে আনতে পারলি নে—খদ্দের ভেগে গেল!

—বাবু ও আদতে খদ্দেরই নয়—যেতে যেতে বাহারে জিনিষগুলো নজর করে আর লোভ সামলাতে পারেনি। তাই উঠে এয়েছিল।

—ঠিক বলেছিস! তাই বলি রে হেবো, তোর বুদ্ধিটা চাঁদিরও নয়—এক্কেবারে সোনার গিল্টি করা। যদি ভদ্দরলোকের ঘরে জন্মাতিস্ তা হলে বেবাক একটা জজ ব্যারিষ্টার হয়ে বেরোতিস গায়ে আলপাকার আচকান এঁটে।

হেবো উদাস নেত্রে ছবিটা কল্পনা করার চেষ্টা করে। আপাতত বিড়ি টানতে তার ইচ্ছা করছিল। তাই না চেয়েই বলল—বাবু একটা পয়সা—

মুহূর্তে নিতাইয়ের মুখের ভাব বদলে গেল।—পয়সা?—তীব্র দৃষ্টি হেনে সে বলল।

—আজ্ঞে হ্যান—সাঁঝের বেলা দিয়ে দোব—

—শালা শনিবারের বাজার! খদ্দেরের দেখা নেই আর পয়সা চাইছিস?

হঠাৎ একটা ক্রুর ভাবনা নিতাইয়ের মাথায় আসে—

—সাঁঝের বেলা পয়সা জুটবে কোত্থেকে রে?

—আজ্ঞে সে আমি জোগাড় করে নোব।

গলা সপ্তমে তুলে এবার নিতাই ফেটে পড়ে—বেটা ফের যদি আমার খরিদ মাল থেকে কমিশন বসাবি ত তোকে আস্ত রাখব না—এমন ছিঁচকে স্বভাব কেন তোর—পয়সা দরকার থাকে ত চেয়ে নিবি—

—তাই দেন না একটা,—ঝন্‌কাঠ থেকে ডিঙ্গি মেরে চেয়ে বলে উঠল হেবো।

—মেরে ফেল্ দোব—অধাম্মিক কোথাকার—মনিবের এধারে পেছনের বাঁধন খুলে যাচ্ছে দোকান চালাতে—তোদের একটু দয়া পিরীতও মনে যদি থাকত!—

হেবো বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ে একটা হাঁই তোলে। নিতাইয়ের স্বভাব তার বিলক্ষণ জানা ছিল। তাই সে অন্য পন্থা প্রয়োগ করল। আস্তে আস্তে দোকান থেকে বেরিয়ে নির্বিবাদী মুখ তুলে সে এগোতে থাকে। দু-পা যেতেই নিতাই পিছু থেকে ডাক দেয়—

—এই কোথায় যাচ্ছিস?—এক্ষুণি খদ্দের এসে পড়লে সামলাব কি করে একলা?

—বাবু দু মিনিটের মধ্যে ঘুরে আসব—এই আপনি চেয়ে থাকতে থাকতেই—

—খবরদার! যাস নি—তোর দু মিনিট আমি জানি নে!—নিতাই উঠে পড়ে দরজার কাছে এগিয়ে এসে তারস্বরে ডাকতে লাগল। কিন্তু হেবো জানে যে নিতাই দোকান ফেলে রাস্তায় নামবে না শত হলেও। তাই বিচলিত না হয়ে সে আরও দু'পা এগোয়—

—এই এলেম বাবু—

—জন্মের যাওয়া দেখিয়ে দোব ফিরে এলে শূয়ার। ও মুড়োয় খদ্দের আসছে হন্‌হনিয়ে, আর উনি লাটসায়েবের মত হাওয়া খেতে বেরোলেন!—

—বাবু, ও বিরিঞ্চি—খদ্দের নয়—হেবো সত্যি সত্যি সরে পড়ে দেখে হঠাৎ নিতাই দু-হাত তুলে চেঁচিয়ে বলল—নিয়ে যা তোর পয়সা—শালা, ওই পয়সা নরকে তোর গলায় আটকে থাকে যেন!—

এবারে হেবো নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে হেলতে দুলতে এগিয়ে এসে দোকানে ঢুকে হাত বাড়িয়ে ধরল। একটা পয়সা ছুড়ে দিতেই অমনি সেটা লুফে নিয়ে বোঁ করে ছুটে বেরিয়ে গেল হেবো, নিতাইকে হাঁ হাঁ করে উঠবার সুযোগ না দিয়েই।......

অতীতটা ভাবতে ভাবতে নিতাই ক্রমশ ভেসে যাচ্ছিল ভবিষ্যতের দিকে। ভবিষ্যৎ বলতে অবশ্য তার ভাবনা প্রধানত দোকানটকে কেন্দ্র করেই ঘুরপাক খায় মনের ভিতর। যেমন অতীতেও তাই। কখনো এক-আধটা দুর্লভ সৌভাগ্যের স্মৃতি সেখানে সে সাজিয়ে রেখে দেয় দামী কাচ-পাত্রের মত, হাত দিতে ভয় করে। এতই ভঙ্গুর তা, ভরসা হয় না মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে। কখন বাস্তবের দু'একটা অভাবিত সংশয়ের আঘাত লেগে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। চেয়ে চেয়ে আস্থায় ভরে ওঠে তার হৃদয়। এই সময়, এই দুপুরের নিরিবিলি নিস্তব্ধতায় অনেক কিছুই মনে হয় সম্ভব। এই সামনের সনে নিশ্চয়ই কিছু একটা হবে। হাওয়া ঘুরবেই। লম্বা ব্যামোর পর রুগী যেমন দেখতে দেখতে ফুলে ওঠে, তেমনি দোকান জিনিষপত্রে পুরে উঠবে। কিন্তু নিতাইয়ের মনে এই সংঘটনের জটিল ক্রিয়াকরণ-মূলক কোন প্রশ্ন ঠাঁই পায় না। সে আধবোঁজা চোখের পাতার নীচে থেকে কয়েকটা ছায়াছবির দিকে তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টে। খেলা করে

তাদের নিয়ে। শূন্য রাস্তার গায়ে দ্বিপ্রহর স্থির হয়ে হেলে পড়তে থাকে অত্যন্ত ধীরে। খেলা করে মনের মধ্যে একরাশ ছোট ছোট কল্পনা। কাচের মত স্বচ্ছ, ঝকঝকে।

অশরীরী ক্রেতারা আসে তার দোকানে। সিঁড়ির দু-ধাপ উঠে এসে দাঁড়ায় বাসনগুলোর দিকে চেয়ে। তার কল্পনার রঙীন কারুকার্য করা চিনেমাটির বস্তুগুলোতে ভরা আলমারি ভরে তুলেছিল সে। সেবারে নীলামে পেয়ে গেল সেট কে সেট, কেউ হদিস পায় নি তাই রক্ষে! কে যেন খবরটা খুব ইসারায় বলে গিয়েছিল। এক কুচো কাগজে লেখা ঠিকানা হাতের তেলোয় গুঁজে দিয়ে রাস্তায় নেমে কোথায় হাওয়া হয়ে গেল চক্ষের নিমেষে। নিশ্চয়ই কোন গুণী লোক। কিন্তু নিতাই কখন সেখানে যায় নি। আমড়াতলার গলির মত পাথরে বাঁধাই একটা এঁদো রাস্তা। একটা গুদামঘর জাহাজের খোলের মত সুদীর্ঘ, অন্ধকার। প্যাকিং বাক্স বোঝাই থাক দিয়ে আড়া-ভর্তি মাল জমা করা। সে নিয়ে এসেছিল—যত ইচ্ছে– যত তার একটা মোটে ঠেলাগাড়ীতে কুলিয়েছিল। কিন্তু জিনিষ দেখবার সময়ও ছিল না। সে বেরোতেই ঘড় ঘড় করে দরজা এঁটে দিল।

কিন্তু কি বাহারে জিনিষগুলো! সে কোনদিন দেখেনি তেমন মাল। কোন দেশের আমদানী, কোন সাত-সমুদ্দুর পারে বন্দরে জাহাজ বোঝাই হয়েছিল তাও জানা নেই। আলমারি ছাপিয়ে গিয়েছিল তার। কি সূক্ষ্ম তুলি দিয়ে ফোটানো ফুলগুলো। চিনেমাটির সাদা মুক্তোর মত গায়ে মাকড়সার জালের মত জল-ছবিতে টানা, যেন ফুঁ দিলেই উড়ে যাবে। নিতাই মাল চেনে। সওয়া বিশ বছর ধরে নিত্যি নতুন কাচের জিনিষ ঘেঁটেছে; কিন্তু মনের মত জিনিষ কোনদিন দেখেনি হাতে। সে সেগুলো সাজিয়ে রেখে দেয় থরে থরে, যত্ন করে আদরে। আলমারীর চেহারাও পালটে যায়। এমন বিবর্ণ খস্‌কুটে চটা ওঠা পুরোনো সেকেলে আর সেগুলো নয়, সে বদলে ফেলেছে সব। নতুন ঝকমকে দেখতে, যেমন বড় বড় সিন্ধী পাইকারদের দোকানে সে দেখে আজকাল।

খরিদ্দাররা এসে ঢোকে। সব কিছুই, যা দেয় সে হাত বাড়িয়ে, তাই পছন্দ—যে দাম চায় তাতে তারা হাস্যচ্ছলে কত কি রঙ্গ করে, কিন্তু শেষে নিতাই জিনিষগুলো ঠেলে দেয় হেবোর দিকে—হেবো অমনি প্যাক করে বাবুদের হাতে ঝুলিয়ে দেয়। তিন-তিনখান কর করে দশটাকার নোট

হাতে গুঁজে দিয়ে সেই সব দেবলোকের খরিদ্দাররা হাসিমুখে' মিলিয়ে যায় তাদের অশরীরী মূর্তি নিয়ে।...

—নিতাইবাবু!—

চমকে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল নিতাই। সে ঘুমিয়ে পড়েছিল নাকি? না জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছিল? বেলা দুপুরে আফিস আদালতের টাইমে খদ্দের? তাড়াতাড়ি চোখ রগড়ে সে তাকাল দরজার দিকে। কাউণ্টারের উপর হাত রেখে একটা কালো টুপী পরা কপালে ফোঁটা তেলক কাটা মাথা উঁচু হয়ে। চকচকে প্রশস্ত কপালের ঢালের নীচে ফোলা ফোলা চোখের উপর পাতা অর্ধনমিত। পুরু পুরু ঠোঁট অল্প ফাঁক হয়ে পানের লাল রং ছোবান বড় বড় কয়েকটা ওপর পাটির দাঁত বিনীত ভাবে মেলে ধরা। ফোলা পুরুষ্টু গাল দুটো প্রশান্ত হাসিতে অল্প টোল খেয়ে গেছে থাইমুখের দুপাশে।

—নিতাইবাবু!—

শিউরে উঠল নিতাই। দুপুরের গরমেও তার সমস্ত শরীর বেয়ে একটা ঠাণ্ডা হিমস্রোত নেমে যায় পায়ের দিকে, রোঁয়াগুলো খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে। বিস্ফারিত নেত্র করে তাকিয়ে দেখে সে। গলায় কোন স্বর ফুটতে চায় না সহসা। কাউণ্টারের উপরে জেগে থাকা মুখটা হাসির আড়াল থেকে তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করে তাকে। অতি কষ্টে শেষটায় বিকৃত স্বরে বলল নিতাই—

—আসুন শেঠজী!

—হেঁ হেঁ, দুপুর বেলা একটু নিদ্রা করছিলেন নাকি নিতাইবাবু! তা বেশ, বেশ, খবর সব ভালো? এই বেরিয়েছিলুম, সব মালিক লোকদের সাথে একটু দেখা করতে। তা বেজায় ধুপ-না কি—হেঁ, কি বোলেন, দুকানের মধ্যিখানে বেশ ঠাণ্ডা। আমি ত আর দুকানে বসে কারবার চালাতে পারি না, মালিক লোকেদের দুকান দুকান পায়দল ঘুরে বেড়াই—

নিতাই এতক্ষণে সম্বিৎ ফিরে পেল। তাড়াতাড়ি উঠে এসে হাত জোড় করে সে হাস্যোদ্ভাসিত মুখাবয়ব মেলে ধরে উচ্ছ্বসিত গলায় বলে উঠল, —দাঁড়িয়ে রইলেন কেন শেঠজী! গরীবের দোকানে একটু পায়ের ধুলোটা বাড়িয়ে দিন। আপনার কৃপায়ই ত এই সব—

—হেঁ—হেঁ, তা যা বলেছেন—হাসতে হাসতে কাউণ্টারটা ঘুরে আগন্তুক ধীরে ধীরে চৌকির উপর বসে পড়ল। তারপর তেমনি ধীরভাবেই কোঁচাটা

গুটিয়ে হাঁটুর 'উপর রেখে আস্তে আস্তে মুখ তুলে বলল,—কৃপাই বটে—সবই পরমাত্মার কৃপা—তাই একটু দেখতে এলুম। কেতোদিন খবর ভেজলুম, চিঠি লিখলুম বাবুজীকে, ভেবেছিলুম কি আপনে একবার গরীবের সাথে মোলাকাৎ করবেন। তা নিতাইবাবু, কৃপা করে আমার হিসাবটা যদি আজ একটু লিয়ে বসেন।—

একই তক্তপোষে বাঘ আর গরুকে সহাবস্থানের সুযোগ দিলে গরুর অবস্থা যেমন সকরুণ হয়ে ওঠে, নিতাইয়ের ভাবখানা প্রায় তারই অনুরূপ হয়ে উঠেছিল। হিসাবের শব্দটা উচ্চারিত হওয়া মাত্র তার মুখটা চুপসে পাংশুবর্ণ হয়ে উঠল। তবু কোনমতে মুখে হাসিটাকে বেড়াজাল দিয়ে আটকে ধরে সে চীৎকার করে ওঠে,—ওরে হেবো—শাগ্‌গির পণ্ডিতের দোকান থেকে খিলি কয় পান নিয়ে আয়—ছুটে যা—বলে একটা দু-আনি গাঁট থেকে বার করে তাড়াতাড়ি হেবোর হাতে গুঁজে দিয়ে তাকে প্রায় ধাক্কা মেরে সে দোকান থেকে বার করে দিল।

হেবো অদৃশ্য হওয়া মাত্র নিতাই ঘুরে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে উপবিষ্ট মূর্তির সামনে সকাতরে এসে চেয়ে দাঁড়াল। কিন্তু অন্যজনের স্থির মুখচ্ছবিতে একটি দাগও পাল্টায় না; যেমন হাসিমাখা মুখে সে তাকিয়েছিল তেমনিই হাসিমেখে সে নিতাইয়ের গতিবিধি লক্ষ্য করে চলে। তার সিদ্ধিঘোলা চোখের মধ্যে কালো মণি দুটো সাপের মত চেয়ে থাকে নিতাইয়ের দিকে।

আগন্তুক ঝগড়ুরাম মাড়োয়াড়ী। তার মূর্তি নিতাইয়ের রাতের দুঃস্বপ্ন, দিনের আতঙ্ক। সে ঘুমোতে ঘুমোতে আঁৎকে ওঠে তার টুপীপরা তেলক কাটা মুখচ্ছবি ঘুমের ঘোরে দেখতে পেয়ে, যে মুখের হাসিতে এতটুকু পরিবর্তন সে কোনদিন দেখেনি। তা সদাই প্রফুল্ল, সহৃদয়তায় গদগদ। গলাবন্ধ লম্বা কোটের নীচে ফেঁপে থাকা স্ফীতোদরের ওপর দুহাত ভাঁজ করে রেখে মাড়োয়াড়ী মিনিট দুই তিন নিতাইয়ের জোড়হস্ত বিপন্ন ভঙ্গীটা সাগ্রহে চেয়ে দেখে বলল—

—অনেকদিন আসা যাওয়া হয়নি নিতাইবাবু, ভেবেছিলুম কি আপনেই যাবেন একরোজ কৃপা করে। তা দিনকে দিন কেতো মাহিনা পার হয়ে গেল—না জানি কেত্তো রুপেয়া মুনাফা হয়ে গেল আপনের দু-কানে! হে—হেহে হেহে,—মোটা গলায় সহৃদয় হাসি হাসতে লাগল ঝগড়ুরাম, চোখের পাতা দুটো তার আরও নেমে এল নীচে। তারপর এক পা ঘেঁষটে জুতো থেকে

পাটা মুক্ত করে নিয়ে হাঁটুর উপর তুলে বাঁ হাত দিয়ে পায়ের তেলোতে বুলোতে বুলোতে হঠাৎ সামনে ঝুঁকে পড়ে চেয়ে বলল—

—হিসাবটা আজ ঠিক কোরে ফেলেন নিতাইবাবু। এত্তা রোজ হিসাব নিকাশ কুছ হোল না—বড় আফশোস্—

নিতাইয়ের বুক ধড়াস্ করে ওঠে। মাড়োয়াড়ীর পান জর্দার পিচে লাল হাসিভরা মুখটার দিকে চেয়ে গায়ের মাংস যেন কুঁকড়ে ওঠে চামড়ার নীচে।—

—শেঠজি, কি হিসেব কোরবো? দিনকের দিন ব্যবসা সঙ্গীন অবস্থায় এসে ঠেকেছে। সবই ত জানেন বাবু, আমি একটু সামলে নিয়ে নিজেই—

—আমার গদ্দিতে লোটের বাণ্ডিল লিয়ে আসবেন? হাহাহা, আপনাকে এত্তো কষ্টো কেন দিব, এথান থেকেই আমার মিট করে দিন—

নিতাই হঠাৎ শেঠের পাশে বসে পড়ে দু'হাত বাড়িয়ে তার হাতটা ধরার চেষ্টা করল। কিন্তু ঝগড়ুরাম সেই মুহূর্তেই একটা লাল খেরো বাঁধান খাতা বার করে জিভে আঙ্গুল ঠেকিয়ে পাতা ওল্টাতে থাকে—একটা পাতায় এসে সে আঙ্গুল রেখে চেয়ে বলল—

—ফরবরী মাহিনায় বে-উশুল সুদের টাকা ছিল সাড়ে চারশো রূপেয়া। তারপর এই সিতম্বর তক্ এক আধেলাও মিলে নি—কুল মিলাকে আপনি দেবেন সাড়ে চার ইগার পচ্‌পন—এই ষোলশো টাকা মোট। ই টাকাটা—

—ষোলশো পয়সাও যে নেই শেঠজী। কালীর দিব্যি, আজ দু-মাস দোকান ভাড়া মেটাতে পারি নি—বিশ্বাস করুন—

—হাঁ!—বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে তাকায় ঝগড়ুরাম,—এতনা খারাপ হালৎ! চ্‌-চ্‌!—তা আমি তো রূপেয়া না লিয়ে আজই দোকান থেকে উঠবোই না।—

—কি দেব শেঠজী? এই দেখুন ক্যাশবাক্স—ক'টা তামার পয়সা পড়ে মাত্তর। বিশ্বাস করুন!—

—অবিশ্বাস কেনে করব? রূপেয়া কখন অবিশ্বাস করিনে আমি। আপনি ব্যেবসা করলেন, আমি রূপেয়া দিলাম। এখন আপনি বললেন কি রূপেয়া নেই, কুছু দেব না। তা হয় না নিতাইবাবু, তা কভ্‌ভি হয় না,—বলে মাথাটাকে ধীরে ধীরে দোলাতে লাগল শেঠ।

চাইতে চাইতে নিতাইও যেন সম্বিৎ হারিয়ে ফেলছিল। সেও হাসতে আরম্ভ করল মাড়োয়াড়ীর মুখে অবজ্ঞার হাসির দিকে চেয়ে। এ এক মস্ত পরিহাস, কিন্তু

হঠাৎ ঝগড়ুরাম সোজা হয়ে বসে নিতাইয়ের দিকে ইস্পাতের মত কঠিন চেয়ে বলল—

—রূপেয়া কুছ নিয়ে আস্থন!

—শেঠজী!—হাত দুটো কলের মত আবার জুড়ে নিতাই কম্পিত-গলায় বলে।

—ষোলোশো রূপেয়া পুরা উশুল চাই স্থদের! এক পয়সা কম নেহি।—

—কোত্থেকে পাব!—

—জাহান্নামসে! নেহি তো হুঁয়েই যানা পড়েগা আপকো! সিধিবাৎ!

নিতাই বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় শেঠের ফোলা ফোলা ক্রুর মুখটার দিকে।

—জাহান্নামে?—সে নির্বোধের মত কথাটা না বুঝে আবৃত্তি করল।

—হাঁ! এইটে পড়ে দেখুন।—বলে ফস করে পকেট থেকে একটা শীলমোহর ছাপা কাগজ টেনে এগিয়ে দিল শেঠ তার দিকে।

নিতাইয়ের চোখের পর্দায় একটা ঝাপসা আস্তরণ ঢেকে থাকে। অস্পষ্ট জাবড়া জাবড়া কালো অক্ষরগুলোর দিকে ঝুঁকে সে চেয়ে দেখে। তার ভুরু কুঁচকে ওঠে। সে বুঝতে পারে না তাদের মর্ম। শেষে দু-একটা শব্দ তার মাথায় ঢোকে। আদালতে একটা পিটিশানের নকল। বাদী ঝগড়ুরাম নিতাইয়ের বিরুদ্ধে অত হাজার টাকার দাবী করে সালিশী প্রার্থনা করছে। দোকানে সে তার ন্যায্য অংশে আগাগোড়া প্রতারিত হয়েছে, তাই মামলা চলাকালীন দোকান আদালতের হুকুম মাফিক—

একটা বিকৃত অস্ফুট স্বর তার গলা থেকে বেরিয়ে এল হঠাৎ। মনে হয় চিনেমাটি সাজানো আলমারীগুলো বোঁ করে একপাক ঘুরে যায় চোখের সামনে। কোন রকমে চৌকি চেপে ধরে ফেলে পতন রোধ করে সে।

—এ কি করছেন শেঠজি, আমায় পথে বসাতে চাইছেন! দোহাই শেঠজি, বাপ পিতেমোর হাতে তৈরী দোকান, কোথায় দাঁড়াব। ভিখিরী হয়ে আপনার দুয়োরে গেছলুম, কৃপা করুন—

শেঠ ঝগড়ুরাম মৃদু মৃদু হাসতে থাকে। কাগজখানা গুটিয়ে দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বলল,—আমি কি কৃপা করব নিতাইবাবু—পরমাত্মাই কেবল কৃপার মালিক। আমি গোবিন্দজীর সেবা করি শুধু। রূপেয়া না দিতে পারেন ত' দুকান লিখে দিন, খরিদ্দার মিলে যাবে। নয় ত—হঠাৎ

ঝগড়ুরামের মুখ সরল হাসিতে উপছে ওঠে,—নয় ত আদালতমে ফয়সলা হবে!

—বাবু পান হ্যান!—হেবো পানের খিলি হাতে ঢুকে সামনে এসে দাঁড়াল। একসঙ্গে দু-খিলি পান মুখে ভরতে ভরতে শেঠ নিতাইয়ের অস্বাভাবিক পাণ্ডুর মুখটার দিকে চেয়ে বলল,—কাল আমার গদ্দিতে রূপেয়া লিয়ে আসবেন। না হলে, আদালত থেকে জানবেন যা কিছু।—

পান চিবোতে চিবোতে শেঠ এগিয়ে গেল দরজার দিকে। নিতাইয়ের ইচ্ছা করছিল ছুটে গিয়ে শেঠের পায়ে আছড়ে পড়তে, কেঁদে তার জুতোয় মাথা ঠুকতে। কিন্তু সে কিছুই করে না, পাথরের মূর্তির মত মুখ করে চেয়ে থাকে রাস্তার দিকে।

—বাবু!—

টনক নড়ল হেবোর গলার স্বর শুনে। বাকি দু-খিলি পান এগিয়ে ধরে সে দাঁড়িয়েছিল।

—হেবো!—হঠাৎ আর্তকণ্ঠে নিতাই চেঁচিয়ে উঠল। হেবো বিস্মিত সপ্রশ্ন চোখ তুলে ধরে নিতাইয়ের মুখের দিকে চাইল।

—হেবোরে! মাড়োয়াড়ী শালা সর্বনাশ করল আমার। আমার সর্বস্ব থাবা দিয়ে হাঁকড়ে নিল!—আর গলা দিয়ে কথা বেরোয় না নিতাইয়ের। সে একটা অসহনীয় দেহজ যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে তাকায়, কাচের মত চোখের মণি দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসে।

—বাবু! কি হয়েছে—কি?—হেবো এবারে সত্যিই শঙ্কিত গলায় জিজ্ঞাসা করল।

—আদালত!—একটা পান তুলে মুখে গুঁজে দিয়ে নিতাই চিবোতে ভুলে হাঁ করে চেয়ে রইল তার দিকে।

তের

আকাশের রোদ স্থির হয়ে এসে পড়েছিল ছাদে। করুণাদেবী চেয়ে দেখছিলেন। কেমন একটা অদ্ভুত নীরবতা বিরাজ করে। আলো যেন হাসছে বাড়ীগুলোর দিকে চেয়ে। তবু বিশ্বাস হয় না; এ হাসির মধ্যে কোথায় যেন ফাঁক ছিল, কখন আবার মিলিয়ে যায় ভাদ্রের অশ্রুসজল মেঘছায়া টেনে। তবুও রোদের প্রখর উজ্জ্বলতায় বাড়ীর দেয়ালগুলো যেন তাঁরই দিকে তাকিয়ে। অর্ধশতাব্দীর পর একটা বিচ্ছেদ এবারে তাঁর সঙ্গে দেয়ালগুলোর। তিনি চলে যাচ্ছেন। ভাবতে মনের মধ্যে একটা পুরোনো বেদনার মত কি খচ্ খচ্ করতে থাকে। নারকেল গাছটার পাতার গায়ে রোদ পড়ে সোনালী সাদায় আভা চুঁইয়ে পড়ছিল। মৃদু বাতাস কখন এসে লাগে পাতাগুলোর সরু সরু ছড়ে, সামান্য এলোমেলো হয়ে গিয়ে আবার স্থির হয়ে থাকে।

করুণাদেবী ঘর থেকে বেরিয়ে থমকে দাঁড়ান। চারিদিক এত স্তব্ধ সকালবেলা, মনে হয় হঠাৎ সজাগ হয়ে থেমে দাঁড়িয়ে থেকে সব কিছু চেয়ে রয়েছে, দেয়াল, ছাদের পাঁচীল। পিছনে হাট করে খোলা দরজাটার দিকে ফিরে চেয়ে মনে হয় ঘরটাও তাকিয়ে দেখছে তাঁকে। সবাই তাকিয়ে আছে, দেখছে তাঁর আয়োজন। তিনি মনের মধ্যে পিছিয়ে লুকোতে চান। যেদিকে ফেরেন মনে হয় মূক জড়-আকৃতির সজাগ সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলে ধরেছে তারা, উঁকি দিচ্ছে তাঁর গহনতম কন্দরে। এত প্রচ্ছন্ন শুভ্র সদীপ্ত আলো, বিশ্বাস হয় না। তার সঙ্গে জড়িয়ে কোন গন্ধ, কান দেহহীন বস্তু থেকে উৎসারিত হয়ে আসে স্মৃতির মত। তিনি হঠাৎ টের পান—অনেকগুলো বছর পেরিয়েও তিনি কোন কিছুকে পুরোনো হতে দেখেন নি। এমনি সকাল দেখেছেন বরাবর, বছরের পর বছর পিছিয়ে অনেক দূরে—একটা মলিন দাগও এতকালে ফুটলো না।

কেবল পুরোনো হয়ে গেছেন তিনি। তাঁর শরীর, মন, মনের কোমল আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলো। দীর্ঘদিন এই চিরনবীনতার মধ্যে অলক্ষ্যে তিনি জীর্ণ হয়ে এসেছেন, এক ছায়ামগ্ন তরুর পুরোনো পাতার মত। তবু একটা

বাঁধন কখন জড়িয়ে ধরেছে তাঁকে অচেতন ইঁটের দেয়ালগুলোর সাথে। তাদের ছায়া যেন নিভৃতে চুপ করে আছে। রাতে ঘুমিয়ে পড়ে, দিনে আবার জেগে ওঠে। কিন্তু সরে যায় না। বহুদিনের ছায়া ছায়া সোঁদা গন্ধ, সিঁড়ি দিয়ে নামতে নাকে এসে লাগে—মনে হয় তাদের অদৃশ্য আঙ্গুল বুলিয়ে তাঁকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছে।

ঘরে আলমারীর কাচের মধ্যে দিয়ে কড়ি গাঁথা লক্ষ্মীর ঝাঁপির দিকে চেয়ে মনে হয় সেটা অনেকদিন হাত দেন নি, ভিতরে একটা পদ্মবীজের মালা ছিল। ভাবেন আলমারী খুলে দেখেন সেটা। একটা মোষের শিং কুঁদে তৈরী হরিণের দিকে চেয়ে থাকেন একদৃষ্টে, মনে হয় পালিশটা ধূলো পড়ে ম্লান হয়ে গেছে। পাট করা একটা কাঁথার গায়ে ফুলগুলো মনে হয় ভারী সুন্দর, একবার আলমারী থেকে নামিয়ে খুলে ধরতে ইচ্ছে করে। ছিঁড়ে যাচ্ছিল তাই তুলে রেখেছিলেন, নিতাই তখন ইস্কুলে পড়ে । কেন রেখে দিয়েছিলেন ভেবে পান না। এমনি পুরানো অনেক জিনিষ কোনদিন যা আর কাজে লাগবে না। তবু কি কারণে বছরের পর বছর একটি একটি করে জমা হয়েছে আলমারীতে, তোরঙ্গেতে, বালিসের নীচে।

চৌকির তলায় একটা বড় কাঠের সিন্দুক, তার ভিতরে পাথরের বাসন কোনদিন ব্যবহার করা হয় নি, পাথরের থালা বাটি রেকাবী শ্বেতপাথরের গেলাস, কত কি! কেবল গেলাসটায় কর্তামশায়ের মাথার কাছে জল রেখে দিতেন। তারপর থেকে তোলা আছে। হঠাৎ অত্যন্ত আশ্চর্য ঠেকে। কোনদিন মনে এ প্রশ্ন জাগেনি ত, কেন এত জিনিষ চিরকাল সঞ্চয় করে রেখেছেন চারিপাশে! এক এক করে মনে পড়ে খুঁটিনাটি সব জিনিষগুলোর কথা, চোখে কত কি পড়ে। প্রত্যেকটি তাঁর সঙ্গে এক একটা সুতো দিয়ে বাঁধা। চলে যাবার কথা যতবার মনে আসে, প্রত্যেকটা সুতো ধরে কে-টান মারে। মন ফিরে আসে তাড়াতাড়ি, দুহাত বাড়িয়ে সব কিছুকে আলিঙ্গন করতে চায়। বুকের কাছটা মনে হয় বড় ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি এইগুলোতে মুখ গুঁজে চোখ বন্ধ করে একটু উষ্ণতাপ তুলে নিতে ইচ্ছা যায়।

কিন্তু একি ভ্রম! করুণাদেবী মনে মনে অন্ধের মত হাতড়ান। এই উজ্জ্বল আলোছায়ায় গড়া আকারের অন্ধ মেঝে হাতড়ে অনেক দূরে চলে যেতে চান। সেই এক চিত্তির কবে যেন একটা পুরোনো মাসিকে না কোথায় দেখেছিলেন—বারাণসীর তীর্থ ঘাটে স্নান করে লোক ফিরছে, হাতে তামার

ঘড়ায় গঙ্গাজল, শিবের মাথায় গিয়ে ঢেলে দেবে। অগণিত লোক, দোকানপাট আলো, রংবেরংয়ের কাপড় ঝলমল করছে সাজানো, কাচের চুড়ির দোকান, বাসনকোসনের হাট বাজার। কত সোরগোলে ভরা জায়গা। তাঁর পয়সা নেই, থাকলে দোকানে বসে বসে কত কি দেখতেন টেনে টেনে। তবু দেখে বেড়াতে ভাল লাগে। দূর অদেখা নগরের গুঞ্জন কানে আসে যেন, যেন শোনা যায়। আরও কত সঙ্গী সাথী জুটবে। তাঁর বয়সা বুড়ি বিধবা আছে গণ্ডায় গণ্ডায়। তিনি অলি গলি চেনেন না—শুনেছেন কাশীতে গলি ভয়ানক, অনেক মন্দির দেউল। তাদের সঙ্গী হয়ে ঘুরে বেড়াবেন চেয়ে চেয়ে। ভাবতে ভাবতে ঘরের দেয়ালগুলো কখন যেন এক অলক্ষিত দ্রাবকে গলে হারিয়ে যায়, বাইরে আলোধৌত প্রচ্ছন্ন সকাল খাঁ খাঁ করে। করুণাদেবী দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে বসে চেয়ে থাকেন অনেক দূরে।

দুপুরবেলা নিতাই ফিরে এসে খাওয়া-দাওয়া করে আবার বেরিয়ে গেল। করুণাদেবী কেমন অন্যমনস্ক হয়েছিলেন। তার কথাগুলোর পুরো জবাব সব সময় দিতে পারছিলেন না। একটু আনমনা ভাব, যদিও প্রতিদিনের মতই সে আর পাঁচটা কথা বলে যায়—তিনি কান দিয়ে শুনছিলেন। কিন্তু চোখের দৃষ্টির নীচে একটা পর্দা অবরুদ্ধ করে রাখে দৃষ্টি। দু একটা হাঁ হুঁ দিয়ে নিতাইয়ের কথার স্রোতকে অবিরল ধারায় বয়ে যেতে দেন।

তারপর বাড়ীটা প্রতিদিনের মত মধ্যাহ্নে নীরব হয়ে আসে। করুণাদেবী কাজ সারা করে বাসন-কোসন সরিয়ে জায়গা মুক্ত করে ভাতের থালাটা টেনে নিয়ে বসলেন। কষের দুটো দাঁত পড়ে যাওয়ায় খেতে হয় ধীরে ধীরে। অনেক্ষণ ধরে চিবিয়ে। চিবোবার সময় চোয়ালে, রগের নীচে, থুতনির দুপাশে শিথিল পেশীগুলো লোল চামড়াকে দলা পাকিয়ে ওঠানামা করে।

খেতে খেতে হঠাৎ মুখের সঞ্চালন বন্ধ করে চেয়ে থাকেন দরজা দিয়ে। পাশের বাড়ীর আলসের ছায়া গড়িয়ে গড়িয়ে এগোয় উঠোনের মেঝে দিয়ে। সূর্যদেব হেলেন। সময় এত স্তব্ধভাবে, এত অলক্ষ্যে এগোয়, কতকটা ওই ছায়ার মত—কানে ঠং করে বাসনওয়ালার কাঁসরেতে ঘা গড়িয়ে আসে—আলসের ছায়াটার কানা যেন কাঁপে থর থর করে। করুণ উদাস করা গলায় ডাক চলে যায় দুপুরের মধ্যে দিয়ে। শুনতে শুনতে বিবশ হয়ে থাকে মন। হাতে দলা করা ভাতের মণ্ড অর্ধেক পথ উঠে থেমে থাকে। কত দূর এখনও যেন মনে পড়ে—সুরের পিছন পিছন একাকী হৃদয় চুপি-

সাড়ে বেরিয়ে যায় ওই গলি দিয়ে। ওই বাঁক ঘুরে। নিরবধিকাল পা ফেলে ফেলে কেবলই এগোয়। তিনি তার পিছন পিছন হাঁটেন। চোখের পাতায় আলোয় একাকার দুপুর ঝরে পড়ে। মণি দুটোর অস্বচ্ছ আবরণ ঠেলে ঢোকে তাঁর অন্তরে। অনেক দূরে শোনা কথাবার্তার মত নিতাইয়ের অজস্র বকবকানি কানে শোনায়। সেখানে শান্তনুর নীরবতাও যেন শোনা যায়, তেমনি ফিস্‌ফিসানির মত, তিনি টের পান না।

হয়ত একটু তন্দ্রা এসেছিল পাটি পেতে মেঝেয় গড়িয়ে নিতে নিতে। কানে কড়া নাড়ার শব্দ এসে তাঁকে জাগিয়ে দিল। করুণাদেবী চমকে চোখ মেলে তাকান। সৈরীর মা এল বোধ হয়। তাঁর ঘুমে জড়ান চেতনায় স্পষ্ট বুঝে না উঠেও তাড়াতাড়ি নেমে আসেন সিঁড়ি দিয়ে। আজ সকালে কিছু বলে যায় নি তো? তবে কোন নতুন খবর আছে নিশ্চয়ই! হঠাৎ তাঁর মন উচ্চকিত হয়ে একটা আগ্রহের অধীরতায় ভরে উঠল। তাড়াতাড়ি রক পেরিয়ে এসে দরজার খিল খুলে তিনি বাইরে তাকালেন।

দরজার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে ছিল নিতাই। তিনি হতভম্ব হয়ে চেয়ে থাকেন। নিতাইয়ের সারা মুখে একটা বিপন্ন ছায়া, কিন্তু তিনি তা বুঝতে পারেন না। এমন অসময়ে তার বাড়ী আসায় মন শঙ্কায় ভরে ওঠে। আপনা থেকেই তাঁর নিজের গূঢ় ভাবনাগুলো এসে দাঁড়ায় সামনে; দুপুরবেলা, নির্জন— নিতাইয়ের মুখের কোণগুলোয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে তিনি খোঁজেন কিছু।

নিতাই একটাও কথা না বলে উঠে আসে, বারান্দার উপরে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকে সামান্য কয়েক মুহূর্ত। তার ছায়া পায়ের ডানদিকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র হয়ে পড়ে। করুণাদেবী তার অল্প ঝুঁকে পড়া স্থূল পিঠের দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়ান। মনের শঙ্কাগুলো কোন কিছু জিজ্ঞাসা করতে তাঁকে বাধা দেয়। গলায় কি যেন আটকে থাকে। কেন এসেছে? কেনই বা অমন করে থমকে দাঁড়াল? তিনি গলা ঝেড়ে পরিষ্কার করে বললেন,—কি রে,—দুপুরবেলা হঠাৎ?

নিতাই তার ঘরে দরজার কবাট খুলতে খুলতে না ফিরেই জবাব দিল— এই একটা জিনিষ ফেলে গেছলুম। হেবোকে দোকানে বসিয়ে এসেছি— এক্ষুণি ফিরে যেতে হবে।

ওঃ!—একটা লম্বা নিঃশ্বাস নেমে এল তাঁর বুক থেকে। সিঁড়ি দিয়ে

উঠে যেতে যেতে করুণাদেবী বললেন,—একটু জিরিয়ে নিয়ে তবে যাস—কি রোদ—বাপরে!

কিন্তু উপরের ঘরে পৌঁছে তাঁর আবার নেমে আসতে ইচ্ছা করল। তিনি ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়ে থাকেন, তারপর আস্তে আস্তে সরে এসে দেয়াল ঘেঁষে খোলা কবাটটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালেন। সন্দেহটা মন থেকে বিদূরিত হয় না। কেন এসেছে দুপুরবেলা? মুখের ভাব অত থম থম করছে কেন? নিতাইয়ের চোখের অমন চাউনি কি তিনি আর কখন দেখেছেন? পিছন ফিরে অমনতর দাঁড়িয়ে রইল কেন? কয়েকটা চোখের পলক ফেলবার ক্ষণটুকু অবশ্য, তবু তাঁর মনে হয়েছিল সময়টা অনন্তকাল দীর্ঘায়িত হয়ে ছিল। কেমন একটা অদ্ভুত ভাব জেগেছিল মনে ওর পিঠের দিকে তাকিয়ে থেকে; কে নিতাই, তাঁর ছেলে? তার অর্থ কি? কেন তাঁর বুক এমন অসহনীয়ভাবে ধড়াস্ ধড়াস্ করছে? দরজার আড়ালে একরাশ অসংলগ্ন ভাবনার ঘূর্ণিতে থেমে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন করুণাদেবী।

হঠাৎ কার ছায়া এগিয়ে আসতে থাকে নিঃশব্দে। মেঝেয় অস্পষ্ট একটু আঁধার জমে ওঠে। তিনি শিউরে ওঠেন। গলা বেয়ে দুনিবার একটা কি ঢেউয়ের মত উঠে আসছে। এ কি কান্না, না চিৎকার করে ওঠার পূর্বলক্ষণ? তিনি উপর নীচে দাঁতের পাটি শক্ত করে চেপে রইলেন। দরজার বাইরে থেকে নিতাই ডাকল—

—মা!

আস্তে আস্তে দেয়ালে পিঠ রেখে পালঙ্কটার দিকে এগিয়ে যান করুণাদেবী।

—মা গো!—নিতাই আবার ডাক দেয়। সাড়া দেবেন কি?

—আয় বাবা। এখেনটায় এসে বোস!—অননুভূত কোন আবেগে করুণাদেবীর মুখ দিয়ে স্নেহসিক্ত কথাগুলো বেরিয়ে এল। কলের বাজনার মত গলার স্বরটা কোমল, আর্দ্র, মাতৃসুলভ শোনায় তা। দীর্ঘকালের অভ্যাস, চল্লিশ বছর কথা বলতে গিয়ে এমনিভাবে গলা থেকে আওয়াজ বেরিয়ে এসেছে। তাঁর চোখ পাথরের মত বিস্ফারিত হয়ে তাকায়, মণির ছিদ্র দুটো বড় বড় হয়ে থাকে, কাঠ হয়ে চেয়ে থাকেন দরজার দিকে।

নিতাই দরজা দিয়ে ঢুকে বসে পড়ল দেয়ালে পিঠ রেখে। তার চোখ দুটো তাকিয়ে থাকে সামনে। বিশেষ কিছু দেখে বলে মনে হয় না। যেন চোখের স্বচ্ছ কাচ দুটোর নীচে কি একটা আত্মবিস্মৃত হয়ে ডুবে থাকে।

তার দু-ঠোঁটের কোণ কোন একটা চিন্তার রেখায় ঝুঁকে থাকে দুপাশে। করুণাদেবী পিছন ফিরে বিছানার উপর চাদরটা হাত দিয়ে সমান করতে করতে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। তাঁর ইচ্ছা করে একবার ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখতে, মনে হয় নিতাই স্থির দৃষ্টিতে কিছু দেখছে। তিনি আস্তে আস্তে ফিরে দাঁড়ালেন। নিতাইয়ের দৃষ্টি অনুসরণ করে এসে তাঁর চোখ পড়ে কাল তোরঙ্গটায়। তাঁর কপালে ঘামের বিন্দু জড় হয়ে ফুটে উঠতে থাকে একের পর এক।

—দোকানে গেলি নে?—কথাটা বলে ফেলে চমকে উঠলেন। এমন করে জিজ্ঞাসা করা! কি এক অসঙ্গতি নিজের কানেও বেজে উঠল তার-স্বরে। নিতাই মুখ তুলে তাকাল। তার চোখের রং লাল। যেমন বিকারগ্রস্ত লোকের হয়। তাঁর চেয়ে থাকতে ভয় করে সেদিকে। না জিজ্ঞাসা করলেই ভাল হত। সকল কথা রুদ্ধ হয়ে থাকার মধ্যে কেমন একটা নির্ভরতার মত আছে, কিন্তু সেটা তিনি নাশ করে ফেলে দিয়েছেন। এখন নিতাই কি বলবে হয়ত। তার চোখে কোন দুর্নিরীক্ষ্য দৈব অনাবৃত হয়ে যেন থাকে। তাঁরা উভয় উভয়কে টেনে একটা কানার দিকে নিয়ে যান, পিছন দিকে ফিরে।

—এই যাই আর কি! এখনও রোদের ঝাঁঝ রয়েছে, খদ্দের পাত্তি নেই, ভাবলাম একটু ঘুরে আসি!—থেমে থেমে নিতাই বলল।

—এই যে বললি কি ফেলে গিয়েছিলি?—করুণাদেবী ভুরু কুঁচকে ভাবতে ভাবতে বললেন।

—হ্যাঁ, তাও বটে! এমন কিছু জরুরী নয়, খান কয়েক রসিদ বই। টেস্কর জন্যে করপোরেশন থেকে আসবে কিনা তাই। তা কাল নিয়ে গেলেও চলত—

—ও! তা, তাই নিয়ে যা! দোকান বুঝি খোলা?—একটা উৎকণ্ঠা ফুটে ওঠে তাঁর গলায় কিন্তু কিসের তা বুঝতে পারেন না।

—হ্যাঁ, হেবো বসে রয়েছে,—ক্লান্ত গলায় নিতাই জবাব দিল। তার সারা দেহে ক্লান্তি ভেঙে আসছিল। হঠাৎ অবসন্ন হয়ে আসে সারা শরীর, মনে হয় এই ঠাণ্ডা মেঝেয় গড়িয়ে নেয় একটু। কিন্তু মায়ের মনে মনে তাগিদের ভাবটা তাকে তাড়াতাড়ি উঠে পড়তে বলে। বড় তোরঙ্গটার দিকে একদৃষ্টে সে চেয়ে চেয়ে দেখে। একটা কথা কেবলই পাক খেয়ে

খেয়ে ঘুরে বেড়ায় মনে। কথাটা বলবে? বললে সে রেহাই পায়। মনের মধ্যে আটকা থেকে কেবলই ছোব্‌লাচ্ছে। জরজর করে দিচ্ছে বিষে। তার পরাজয় ঘটেছে। পরাজয়ের পাত্রটা প্রায় কাণায় কাণায় ভরে উঠেছে। সে সত্যটার দিকে মুখ ফেরাতে সাহস হয় না। ষোলশো টাকা! সে ত ঘুণাক্ষরেও কোনদিন বলেনি একটা কথাও। তার দোকান একটা মস্ত ফাঁকি, সে নিজেও তাই। তবু এতদিন প্রাণপণে সে বিশ্বাস করেছিল নিজে, বিশ্বাস করিয়েছিল করুণাদেবীকে যে তার কথায় হাসিতে ভঙ্গিতে বাকচাতুর্যে তাড়াহুড়োয় যে আস্থা ফোটে—তা একটা মস্ত কাজের দরুণ। তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দ্বিধা করবারও অবকাশ নেই। তার ভাগ্য কেবল কয়েকটা অকিঞ্চিৎকর বাধায় ঠেকে রয়েছে। সেই সযত্নে গড়া বিশ্বাসটা ফাঁপা বেলুনের মত চুপসে গেছে। তবু তা বলতে তার দ্বিধা হয় অপার।

করুণাদেবী বুঝতে পারেন না নিতাইয়ের ছাড়া ছাড়া কথার ভঙ্গি। কেন বলতে গিয়ে থেমে যাচ্ছে? সকালবেলা চেঁচামেচি করে যে পাড়া মাথায় করেছিল তার এই স্তব্ধভাব যেন আরও উচ্চরবে ধ্বনিত হয়। কি আছে এই চুপ করে থাকার আড়ালে?

—মাগো—এক গেলাস জল গড়িয়ে দাও, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে উঠেছে!

চমকে উঠে দরজার দিকে এগোতে এগোতে থমকে চাইলেন করুণাদেবী, —আহা, তা বলিস নি কেন এতক্ষণ—বস্ একটু, আমি—শব্দ ক'টা বেরিয়ে আসতে গিয়ে অকস্মাৎ মরে যায় মাঝপথে। ফিরে এসে যদি দেখেন তোরঙ্গের ডালাটা খোলা? তাই তবু তিনি ফিরে তাকান। জল চেয়েছে নিতাই, ক্রমাগত ঠেলতে থাকে তাঁকে দরজার দিকে—দরজা দিয়ে বাইরে। তার মুখের দিকে পলক ফেলেন, রোদে পোড়া, রাস্তার ধূলো ময়লায় ঝলসে গেছে মুখখানা, গলার স্বরে তৃষ্ণা ভেঙ্গে পড়েছিল—মুখের রেখাগুলো করুণ ক্লিষ্টতায় ফুটে উঠেছিল। তাঁর চোখ যেন সহ্য করতে পারে না। বুকের মধ্যে বেদনার্ত পরিত্রাহি ডাক পড়ে, ছুটে গিয়ে জল নিয়ে আসতে—মুহূর্তেক দেরী করতে পা কাঁপে। তাঁর জীর্ণ প্রাচীন দেহ ছুটে যেতে চায়, পা দুটো মনে হয় পাষাণের মত ভারী। গভীর সন্দেহ হয়, কেন জল আনতে বলছে তাঁকে! নিতাইয়ের চোখে একি উদ্‌ভ্রান্ত চাউনি, তার অন্তরের সব কালো যেন তিনি দেখতে পাচ্ছেন! নৃশংস রেখা ফুটে উঠেছে ওর কপালের ফুলে ওঠা শিরগুলোয়!

দুরু দুরু বুকে তিনি এগিয়ে যান দরজার দিকে। ছাদে রোদ কি স্থির, কি উজ্জ্বল। নারকেলের পাতগুলোর গা ধুয়ে স্নিগ্ধ ছায়া ঝরে পড়ছে। এক ঝলক হাওয়া যদি বইত, যদি এসে লাগত তাঁর দেহে!

হঠাৎ সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। সিঁড়ি দিয়ে সৈরীর মা উঠে আসছিল, কাঁখে একটা চুপড়িতে কয়েকটা ছেঁড়া আধময়লা কাপড়।

—বৌদিদি! বেলা করে ফেললুম আসতে, কাপড়গুলো নিয়ে গেছলুম সেলাই করতে—পরামাণিকদের ওখানে এই বসে ছিলাম—

হঠাৎ কানে রাশি রাশি শব্দ ভরে উঠতে লাগল। তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন কি? দ্রুতপায়ে এগিয়ে এসে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললেন —বস্ তুই গে ঘরে, আমি নিতাইয়ের জল নিয়ে আসি।—

—বড়ছেলে এই দুপুরে বাড়ী ফিরল!—আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল সৈরীর মা। করুণাদেবী জবাব না দিয়ে নেমে গেলেন। রান্নাঘরে ঢুকে গেলাসে জল গড়িয়ে নিয়ে আবার তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন। হাঁটুতে হাঁটুতে ঠুকে যাচ্ছিল। কিসের উত্তেজনা যেন আলভাঙা জলের তোড়ের মত বেরিয়ে আসে তাঁর স্নায়ুগুলোকে কাঁপিয়ে। বুকে যেন আর দম নিতে পারেন না।

নিতাই জলের গেলাসটা ঠোঁটে তুলে চোঁ চোঁ করে খেতে লাগল। চোখ দুটো বড় বড় হয়ে মেলে থাকে, তৃষ্ণার্ত প্রাণীর মত। তারপর একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে গেলাসটা নামিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসল। চোখের পাতা দুটো অমনি তার নেমে আসে, মুখের ক্লিষ্ট দাগগুলো মিলিয়ে যায়। একটু সন্তৃপ্ত হাসির মতও যেন ছড়িয়ে পড়ে। করুণাদেবী তীক্ষ্ণ সন্দেহাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। তার মুখের প্রত্যেকটা পরিবর্তন যেন তিনি নিজের শরীরে অনুভব করবার চেষ্টা করেন। তাঁর ইচ্ছা করে পাখাটা এনে একটু বাতাস করতে।

হঠাৎ সৈরীর মার মুখের দিকে সপ্রশ্ন চোখ তুলে তিনি তাকালেন। আজকে স্যাক্‌রার কাছ থেকে খবর আনার কথা—গাঙ্গুলী গিন্নী কবে রওয়ানা হবেন—উয়্‌যুগ কতদূর গড়িয়েছে। না, কেউ যেন জানতে না পারে! তিনি তীব্র দৃষ্টিতে নিষেধ করে তাকান।

—এই অবেলায় বাড়ী এলে যে?—সৈরীর মা নিতাইয়ের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল।

—কি ফেলে গিয়েছিল, তাই ছুটে নিতে এল বাড়ী।—পাখা দিয়ে হাওয়া

করতে করতে বলছিলেন করুণাদেবী—দোকান ছেড়ে ওকি কোনদিন দুদণ্ড বাড়ীতে থাকে !

নিতাই চোখ তুলে করুণাদেবীর মুখের থেকে সৈরীর মার মুখে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে এসে চেয়ে দেখতে লাগল। সে যেন ঠিক ধরতে পারে না প্রশ্ন আর জবাবের পুরো মর্মটা, ঠোঁট দুটো তার না বোঝার মত অল্প ফাঁক হয়ে থাকে। কিছু হারিয়ে ফেলার মত একটা বিভ্রমের ভাব দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে।

পাখাটা হাতে নড়তে নড়তে আলগা হয়ে থেমে থাকে। করুণাদেবী ভাবতে লাগলেন, কেন নিতাই অমন স্থাণুর মত বসে রইল। ভাবেন, আবার দোকানে যাওয়ার কথাটা স্মরণ করিয়ে দেবেন কি না। মনের ভিতর একটা উদ্বেগ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আবার দানা বেঁধে বড় হয়ে উঠতে থাকে কণায় কণায় জমে। সৈরীর মার সঙ্গে গোপন কথা তাঁর সারতে হবে, জোগাড়-যাতি অনেক বাকি। নিতাইয়ের উপস্থিতিতে সময় যেন আরও ত্বরিতগতিতে বইতে শুরু হয়, আরও খরচ হতে থাকে হু হু করে।

—বেলা পড়ে এল !—সৈরীর মা বলল।

তাঁরা তিনজনেই তাকালেন দরজা দিয়ে ছাদে। ঘরটার ছায়া অনেক দীর্ঘ হয়ে পড়ে এসেছিল। দিনটার আলোয় কিসের খাদ এসে মিশছিল।

—আমায় দোকানে যেতে হবে। মেলা দেরী হয়ে গেল,—ভুরু কুঁচকে রোদের দিকে চাইতে চাইতে বলল নিতাই—একেই ত বিক্রী পাটা নেই—তার ওপর এখেনে বসে থাকলে যেটুকু বিক্রী হত তাও ছিকেয় উঠবে 'খন।—বলতে বলতে সে আবার আনমনা হয়ে ওঠে। মনে তার অনেকগুলো নিরাশা হাত পায়ের বল শুষে নেয়। সে কেন বাড়ী এসেছিল ?—ভাবতে ভাবতে আবার তাকায় করুণাদেবীর মুখের দিকে। কেমন অব্যক্ত একটা বোধ, যা বিশ্লেষণ করা যায় না। তার দিকে একনিবদ্ধ চেয়ে দাঁড়ান মূর্তিটার প্রাচীন রেখায়, একটা গৃহ যেখানে আশ্রয়, আর তার ঠাণ্ডা ছায়ায় চৈতন্যকে অবলুপ্ত হতে সে দিতে পারে—একটা আশ্রয় তার জন্মগত—কিন্তু কেন যেন তার ফিরে যেতে চায় মন।

—তাই যা, আর ওইটুকু ছেলেকে বসিয়ে আসতে নেই। কে জানে, কখন কি হয় !—করুণাদেবী দরজা দিয়ে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন।

নিতাই উঠে দাঁড়িয়ে একটু অনিশ্চিতভাবে চাইতে থাকে সে দিকে। তারপর সেও নেমে আসে সিঁড়ি দিয়ে।

—কেন এসেছিল বড় ছেলে ?—নিতাই বেরিয়ে যেতেই বলে উঠল সৈরীর মা।

—কি জানি কি এঁচে এসেছিল!—করুণাদেবী মুখ ফেরাতে ফেরাতে হঠাৎ তীক্ষ্ণভাবে চাইলেন। একটু চুপ করে থেকে, যেন একটা সন্দেহের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে প্রায় অশব্দ গলায় প্রশ্ন করেন—

—কিছু জেনেছে নাকি ? বল দিব্যি করে, লুকোস নি—

—ওমা সে কি কথা গো বৌদি! তোমার পা ছুঁয়ে দিব্যি করছি, এক ভুবন স্যাকরা ছাড়া কেউ জানে না। তাকেও দিব্যি করিয়ে তবে পেড়েছি কথা!

করুণাদেবীর তবু সন্দেহ ঘোচে না।—আমার মন একটুও থির সইছে না। সত্যি বলছি সৈরীর মা, মনে হল ওর চোখে একটা কু-মতলব যেন ছিল। তুই গাঙ্গুলীগিন্নীর কাছে খবর করেছিস ?—

—তাই ত বলতে এলুম। আগামী বুধবার রওনা হবে। তোমায় বলেছে একেবারে হাবড়ায় তুলে নেবে!—

—আ—তাই বলেছে বুঝি ?—বলেছে গাঙ্গুলীগিন্নী ?—তুই তা'লে শীগ্‌গির স্যাকরাকে বলে আয় যে কাল আমি দুপুরে যাব তোর সঙ্গে।

—তাই বলে আসি!—সৈরীর মা হঠাৎ কি যেন বলতে গিয়ে করুণাদেবীর দিকে মুখ তুলে চাইল—

—বৌ-দিদি!—

—কি ?

—শান্তর কথা ভাবলে না কিছু!

কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন করুণাদেবী। তারপর তীব্র গলায় বলে ওঠেন—

—ছেলেদের নাম মুখে আনিস্ নি। আমার গলায় ছুরি দিতে চাইছে ওরা। তুই যা! চাস্‌নে অমন করে। আমি ওদের মা নই। কে বলেছে ? মিথ্যে ও সব।

সৈরীর মা আর কথা বলার সাহস পায় না। এমন মূর্তি সে কোনদিন দেখে নি গিন্নীর। আস্তে আস্তে উঠোন দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে ভাবতে লাগল সে।

চৌদ্দ

কি কারণে তা সে বুঝে উঠতে পারে নি সেদিন আফিসের দরজায় পৌঁছে শান্তনু চুপ করে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল। অন্য দিনের মত তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে উঠে আপনার টুলে পৌঁছানোর উদ্বেগ যেন সাময়িক ভাবে অন্তর্হিত হয়। একটা অনিশ্চয়তার ভাব তার সিঁড়ি দিয়ে ওঠার পথ আগলে দাঁড়ায়। আজ ক'দিন আফিসে সে একটা অন্য ভাব লক্ষ্য করে—কেউ যেন তার বসে বসে কাজ করা আর লক্ষ্য করে না। এমন কি রায়বাবুর ছায়া তার দিকে ফিরে চেয়ে দেখার আচমকা অস্বস্তি সে অনুভব করেনি ক'দিন। সে তার কারণ অনুধাবন করার চেষ্টা করে না।

সকাল বেলা বাড়ীটা মনে হয়েছিল নিস্তব্ধ। আস্তে আস্তে সে জেগে উঠেছিল। দরজার কানায় বসে দুটো চড়াই পাখী আপনাদের মধ্যে বকাবকি করছিল—সে চেয়ে চেয়ে দেখে। কেউ এসে তাগাদা দেয় না। ছাদের উপরে সকালবেলার পরিস্রুত আলো মনে হয়েছিল একটু নির্জন—আর সেই নারকেল গাছ, মৃদু হাওয়া লেগে যার পাতার ভিতর একটা অদ্ভুত সর্ সর্ আওয়াজ কানে পৌঁছেছিল। যন অস্পষ্ট অজানা ভাষায় কথা বলে যায়। তার হঠাৎ মনে হয় বাড়ীতে সে একা,—বা সবাই দূরে সরে গেছে। কোন কথার আওয়াজ শোনা যায় না কলতলায়,—তার মায়ের গলার আওয়াজ, নিতাইয়ের উচ্চ গলার হাঁকাহাঁকি। কেউ তার দিকে মুখ তুলে তাকায় নি যখন কলতলায় নেমে এসেছিল, এমন কি সৈরীর মাও না। তার হঠাৎ মনে হয়—কোন একটা অজ্ঞাত কারণে, যার নিয়ম সে জানে না,—কতকগুলো অদৃশ্য বাঁধন কি করে খসে গেছে। সে মুক্ত। তার আশ্চর্য বোধ হয় না—বাড়ী থেকে বার হয়ে অন্য দিনের মত মুখ নামিয়ে সে তাড়াতাড়ি চলার চেষ্টা করে না।...সিঁড়িতে পা রেখে তাই অনাবশ্যক কৌতূহলে সে চেয়ে ছিল একটা গোল থামের দিকে। বহু সহস্র দিন অনেক মানুষ সেই জায়গায় হাত রেখেছে—কালো হয়ে গাটা চকচক করে, উপরে নীচে পানের চুন আঙুল থেকে মুছে ফেলার কয়েকটা দাগ—সিঁড়ি পর পর তলাগুলো পেরিয়ে

ছাদে গিয়ে ঠেকেছে। অন্ধকার দেখায় উঁপরে। হঠাৎ তার পা দুটোকে কি একটা অগোচরে পিছনে টানে। মনে হয় সে ভুল করে এসে দাঁড়িয়েছে—বা কোন এক বিস্মৃত সময়ে সে এখান দিয়ে উঠত। সে অবাক হয়ে যায়। তার প্রতিদিনকার টুলটায় মোমবাতি জ্বেলে বসা ছবি হারিয়ে যায়। কোথা থেকে রাশি রাশি পলাতক মুহূর্ত ভীড় করে আসে মনে। আকাশের নগ্নতা বয়ে একখণ্ড মেঘ দ্রুত ছায়া ফেলতে ফেলতে পার হয়ে যাওয়ার মত। সেই ছায়া জড়িয়ে যায় তার দৃষ্টির রেখায়,—শব্দ প্রবাহ জনস্রোত, সব কিছুতে। তাকে ছিনিয়ে নিয়ে সরে যায়—একটা আকার-না-থাকা ছবি ফুটে ওঠে কোথাও, সে দেখতে পায় না আলোর দেয়াল ফুঁড়ে। তার সমস্ত অস্তিত্বকে আকর্ষণ করে তার কেন্দ্রে। সময়—অন্য কোথাকার—তার সিঁড়িতে পা রাখা মুহূর্তগুলোর গায়ে গড়িয়ে এসেছে। রাশি রাশি ঝরা-পাতার মত, কোন অজ্ঞাত ক্ষণরাশির মর্মর বুকে করে। সে দরজা থেকে চেয়ে দেখে দূরে গীর্জার গায়ে ঘড়ির দিকে। আশ্চর্য মনে হয়। লেখাগুলো কালো চাকতির গায়ে আশ্চর্য সঙ্কেতে খোদাই করা, কাঁটা দুটো নড়ে না। কত সময়, পড়তে পারে না সে—কিন্তু সেই অবাধ্য আকর্ষণ কেবলই তাকে ঠেলতে থাকে পিছন থেকে। তার ইচ্ছে করে একটু ফুটপাথ ধরে এগিয়ে গিয়ে ওদিকটায় দাঁড়াতে। একটু বাঁ দিকের রাস্তা ধরে—দূরে ওই রেলিং বাঁধা থামের পাশ দিয়ে অল্প এগিয়ে যেতে। সে সিঁড়ি থেকে পা নামিয়ে নেয়—আবার ফুটপাথে নেমে আসে। দূরে উঁচু একটা দেওয়ালের গায়ে দেবদারুর সারি—ঘন সবুজ পাতার গায়ে হঠাৎ মেঘঢাকা ছায়া এসে পড়েছে—গভীর হয়ে ওঠে রং। চারজন ভিখিরী মুখোমুখী ছায়ায় বসে নিভৃত আলাপ করছিল। একটা কলাইচটা জগে করে চা রাখা তাদের মাঝখানে, চারটে কানা-ভাঙ্গা মাটির খুরি। মুখমণ্ডলে খোঁচা খোঁচা সাদা দাড়ি আর ভুরু ঢাকা এক বুড়ো ভিখিরী গল্প বলছিল, অন্য সকলে শুনছিল। তার গল্পের কথাগুলো সে শুনতে পায় না, কেবল হাতমুখ নাড়া দেখতে পায়। মাঝে মাঝে এবড়ো-খেবড়ো আঙ্গুল দিয়ে ও জট পাকানো চুলের মধ্যে বোলাচ্ছিল। অন্য হাতটা নেড়ে ক্ষয়ে যাওয়া পায়ের আঙ্গুলের ক্ষত-ঘা থেকে মাছি তাড়াচ্ছিল। সে এক পা এক পা করে এগিয়ে যায়। কেবলই অন্য এক গভীর-উজ্জ্বল-স্পন্দিত ঝিকমিকে সময়ের অগাধ জলে ভেসে চলে তার দেহ—তীর থেকে দূরে—সমস্ত পরিচিত নোঙ্গর খসে পড়ে। দু-চোখ কেবলই এগিয়ে চলে খোলা অবাধ পথের রৌদ্র-ছায়ার

দাগ ধরে। বাঁ দিকের রাস্তা ফুরিয়ে অন্য রাস্তায় পড়ে, সেখান থেকে আরেকটা রাস্তা। সে ভুলে যায় কোথায় চলেছে। এক গভীর আস্বাদন—যা আনন্দ কি না বোঝা যায় না, তার প্রতি রোমকূপে ছুঁয়ে শিহরিত হয়। তার সৌন্দর্য-বিহীন মুখের দাগে এক অনির্বচনীয়তা ফুটে ওঠে, কোনও দূরের স্বপ্নাভাসে চেয়ে থাকার মত।

তার পিছনে ফেলে আসা ছবি, অন্ধকার আফিস ঘরটার কথা মন থেকে মুছে যায়। তার নিত্যকার সঙ্গিহীন একাকীত্বের স্মৃতিও। উপরে নীল আকাশ বয়ে বড় বড় মেঘের ডানা উড়ে এসে ছড়িয়ে পড়ে। রৌদ্র মুছে যায়। অনেক আগে দিয়ে একজন ফেরিওয়ালা হাতের ঘণ্টায় ঠুন্ ঠুন্ শব্দ বাজিয়ে হেঁকে চলেছিল। তার কানে সঙ্গীতের মত ঝরে পড়ে। চলতে চলতে মুখ তুলে দেখে সে মেঘগুলোর পাড় সাদা তুষারের আগুনে জ্বলছে। দূরে জাহাজ-ঘাটা, উঁচু উঁচু মাস্তুলের মাথায় রং-বেরংয়ের পতকা ওড়ে ভিজে লোনা হাওয়ায়। অপরিচিত গন্ধ নাকে এসে লাগে। রোদের আলো অত্যুগ্র সাদা হয়ে বিছিয়ে সব কিছুর গায়ে—জলের বুকে জাহাজগুলোর অতিকায় শরীর পরপর ছবির মত স্থির। লোক লস্কর সিঁড়ি বেয়ে ওঠে নামে—মাঝে মাঝে ভোঁ বেজে উঠে মধ্যাহ্নের স্তব্ধতা সচকিত করে যায়। ঘড় ঘড় আওয়াজ করে ক্রেন থেকে বড় বড় মোট জাহাজের খোলের মধ্যে নেমে যায়—একটানা যন্ত্রের আওয়াজ কানে ভেসে আসে। মাঝে মাঝে শোনা যায় মাল্লাদের সুর তোলা হাঁক। দূরে জেলে পানসি পাল তুলে গেরুয়া জলের বুকে নেচে নেচে ভেসে চলে। আরও দূরে ফেরি ষ্টীমার যাত্রী নিয়ে ওপারে ঘাটে লাগে। অচেনা পথের কিনারায় দাঁড়িয়ে সে দুচোখ ভরে পান করে সকল ছবিগুলো।

পা দুটো ক্লান্ত হয়ে এসেছিল। গলায় একটা শুষ্কতা ভরে ওঠে—কিন্তু সে বোধ করে না। সারা দিন মুক্ত বাতায়নের মত খুলে গিয়েছিল তার মনের গভীরে কোন এক অবরুদ্ধতাকে উন্মুক্ত করে। সেই পথ বেয়ে ঢেউয়ে ঢেউয়ে বাইরের আলো হাওয়ায় দোলা চঞ্চল ভুবনের ছবি অপর্যাপ্ত স্রোতে এসে ঢুকছিল। তাকে অবাক করে রেখে প্লাবিত হয়ে যায় তার ছায়া-অদৃশ্যতায় ঘেরা জগৎকে মুছে ফেলে দিয়ে। পথ যেন কোথায় তাকে নিয়ে যেতে চাইছিল। তার অজানা অনির্দিষ্টতা তার তৃষ্ণার্ত অন্তরকে মুঠোয় ধরে থাকে। অনেক দিনের পুরোনো পরিচিত পৃথিবীতে সে আবার নতুন করে

প্রবেশ করেছে। তার বিস্ময়-ভরা চোখ লঘু ডানা মেলে' উড়ে যায় আলোকিত ছবিতে—পা দুটো তার অনুসরণ করে। সবুজ মাঠ ছড়িয়ে থাকে বড় বড় অট্টালিকার কোল ঘেঁষে। একটা গাছের সুকোমল ছায়া তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। কোলাহল থেকে পলাতক নির্জন ছায়া সূর্যের আলো থেকে আপনার সীমানা ঘাসে এঁকে রেখেছিল। সে নীচে এসে বসে পড়ল। দূরে ট্রামগাড়ী মাঠের কোল দিয়ে ছুটে চলেছিল। একটানা আওয়াজ কানে ছুঁয়ে মিলিয়ে যায় আস্তে আস্তে। সেই মুক্তির ভাব—অনেক যুগের প্রাচীন স্মৃতির মত তার মনে ঘিরে থাকে। শরতের লঘু মেঘে-ভরা আকাশ তার জীর্ণ দেহকে মুড়ে রেখেছে। ঘাসের মাথায় মাথায় তখনো পরিস্ফুট বৃষ্টির বিন্দু ঝলমল করছিল। সে ক্লান্ত দেহটাকে মেলে দেয় সেই ঘাসে, ছায়ায়, শুয়ে শুয়ে শোনে তখনো পথের ছন্দ স্নায়ুর তন্ত্রীতে বেজে চলছে। বাতাস লেগে ঘন নিবিড় পাতাগুলো কাঁপছিল ধীরে ধীরে, ফাঁক দিয়ে আকাশ অসংখ্য কুচিতে ভেঙ্গে প'ড়ে ঝিকমিক করে। তার চোখ দুটো সেই প্রথম তন্দ্রায় ভার হয়ে আসে।

যদি থেমে থাকতে পারত, দিনগুলো আলোছায়ার দাগ কেটে পর পর পেরিয়ে যেত এমনি। সে তীর থেকে চেয়ে থাকত স্পর্শ না পেয়েও। জনমুখর পথের আবর্তে ফিরে গিয়েও তার মন সম্পূর্ণ জেগে ওঠে না। চোখে লেগে ছিল বিকেলের আলো—শরতের আকাশে এক নীড়মুখী হৃদয় মেলে ধরে আস্তে আস্তে মুছে আসছিল। সে যেন বহুদিনের পথ ধরে হাঁটছিল, পৃথিবীটা তার মধ্যে বহু বহু পুরাতন হয়ে গেছে। কোন পথ ধরে ফিরছিল তা সে জানবার চেষ্টা করে না। অস্পষ্টভাবে মনে হয় কতকগুলো পথ পেরিয়ে গেলে একটা গলির মুখে এসে দাঁড়াবে, সেখান থেকে একটা বাড়ীর দরজায়। তার প্রতিদিনের দিনাবসানে আবার ফিরে যাবে। কিন্তু কেমন একটা নূতন পরিচয় সে মনের নিভৃতে লুকিয়ে নিয়ে ফিরে আসে, তা কেবল তার একাকীত্বের, তার সংগোপনে চিনবার। তার অসুন্দর খর্ব আপনার নীচে এক প্রান্তর বিছিয়ে আলো হাওয়া খেলা করে, সারাদিন ভৈরবীতে সুর ধরে থাকে এক উদাসী গলা। তার এতদিনকার মর্ম-হত প্রাণ মোমের মত গলে পড়ে আবরণকে মুক্তি দিয়ে—শুকনো ঠোঁটে একটুকরো হাসি ম্লান গোধূলির অপরাজিত সৌন্দর্যের মত ফুটে থাকে।

একটা লাল দেয়াল ঘেরা বাজারের পাশ দিয়ে সে যাচ্ছিল। তার কৌতূহল হয়, ভিতরে সার সার দোকান আলোয় ঝকমক করে, নানা মানুষ ঢোকে, আলোর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে জিনিষ তুলে নিয়ে দেখে। তার মনে হয় ভিতর দিয়ে পার হয়ে গেলে পারে—আবার অন্য পারে পৌঁছে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলবে, একটুক্ষণ এই উজ্জ্বল আলো-ঘেরা জায়গাটার ভিতরে এসে দাঁড়াবে।

অন্যমনস্ক ভাবে সে এগিয়ে চলে। একটা কাচ-ঘেরা দোকান দেখা যায় কয়েকটা দোকান পেরিয়ে। কাচের আড়ালে গোছা গোছা রঙীন ফুল সাজিয়ে রাখা। মনে হয় নিস্তব্ধ বন্যার মত একটা স্রোত বয়ে যায়। তাকে প্রলুব্ধ করে। দু পা এগিয়ে এসে সে ঝুঁকে পড়ে চেয়ে দেখে একটা ফুলের তোড়ার দিকে। বড় বড় পাপড়িতে আবীরের আগুন ঝরে পড়ে যেন। একটা অভূতপূর্ব উত্তেজনা সারা দেহে মৃদু আবেশের মত ছড়িয়ে পড়ে তার। সে চোখ সরাতে পারে না। ফুলগুলোর উৎস থেকে স্রোতের মত এক অনির্দেশ্য স্পর্শ বয়ে আসে তার দেহে—তার চোখের শিরায় শিরায় শিখার মত কেঁপে কেঁপে জ্বলে। মনে হয় চোখ বন্ধ করলেও ফুলগুলো দেখতে পাবে। এত উজ্জ্বল রং তার চোখের জীর্ণ আবরণ ফুঁড়ে ঢুকবে। সে তন্ময় হয়ে চেয়ে ছিল। তার পাশে মানুষ আনাগোনা করে। একটি মেয়ের গলা তার কানে এসে লাগে। কিছুদূরে দাঁড়িয়ে একগোছা ফুল হাতে তুলে মেয়েটি দোকানীর সঙ্গে কথা বলছিল। একটা কোন অব্যক্ত বোধে শান্তনুর মন ফিরে যেতে চায় সেই কথার ধ্বনিগুলো অনুসরণ করে কোনো একটা অস্পষ্ট গুহাহিত ছবিতে। চোখ আচ্ছন্ন হয়ে থাকে ফুল-গুলোর উজ্জ্বলতায়। দেয়াল ফুঁড়ে স্মৃতির কয়েকটা ঢেউ এসে লাগে। মনে হয় অনেক দূর থেকে দাঁড়িয়ে শুনতে পায়। তবু মুখ তুলে তাকায় না। স্মৃতিটা সুতোর মত মনের চারপাশে জড়িয়ে ধরে। তার ভয় হয় চাইতে সেদিকে। একটা বর্ষাভেজা প্রচ্ছন্ন আলোর সকালবেলা; সে মেয়েটির পাশে পাশে হেঁটে চলেছিল। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির ফোটা এসে পড়ছিল তার মুখের বিশুষ্ক চামড়ায়। তারপর অনেককাল পেরিয়ে গেছে, এত সুদীর্ঘকাল যে তার পায়ে পায়ে পিছিয়ে আসা রেখা কোথায় হারিয়ে গেছে সে জানে না।

সে চেয়ে থাকে একদৃষ্টে ফুলগুলোর দিকে। তপ্ত রং বেদনার মত বইতে থাকে তার শিরার পথ বেয়ে। একটা স্মৃতি যা কথার ধ্বনিগুলোর সঙ্গে স্পন্দিত হয়। সে সামান্য চোখ ফিরিয়ে তাকায়।

একটি মেয়ে ঝুঁকে পড়ে একগোছা ফুল হাতে তুলে ধরে দোকানীর সঙ্গে কথা বলছিল। হঠাৎ তার বুকের ভিতরে নিস্তব্ধতায় কি যেন সজোরে আঘাত করে। সে তার মুখ স্পষ্ট দেখতে পায় না। তবু তার ঝুঁকে পড়া আনত মুখের সীমারেখা মনে হয় চেনা। সারাদিন সে কোন এক লুপ্ত জগতে ভেসে চলেছিল। হঠাৎ ফিরে আসে। তার সঙ্গে মনে পড়ে একটা রৌদ্রজ্বলা দ্বিপ্রহর। একটা নিস্তরঙ্গ প্রবাহে পোড়া সময়। অন্যসব বিস্মৃতিতে তলিয়ে থাকে। সে সম্মোহিতের মত চেয়ে দেখে, চোখ ফেরাতে পারে না। একদল স্ত্রী-পুরুষ কলরব করে তার সামনে এসে দাঁড়ায়। মেয়েটির মূর্তি আড়াল হয়ে যায়। কেন তা সে বুঝতে পারে না—তার মধ্যে কিছু তার দেহটাকে ঠেলতে থাকে পিছন থেকে—এগিয়ে নিয়ে চলে মেয়েটির কাছাকাছি এসে দাঁড়াতে, তার উপস্থিতি জানাতে। হঠাৎ তার ভিতরে কি যেন শিউরে ওঠে। কেন সে যাচ্ছে? একটা অপ্রতিহত আকর্ষণ। তার হাত-পা-দেহ-তনু তার করায়ত্ত নয়। সে মেয়েটির নাম জানে না। সে তাকে চেনেও না। মাত্র সামান্য কয়েকক্ষণ পথে দেখা হয়েছিল।

মেয়েটি একগোছা ফুল হাতে তুলে নিয়ে দোকানীকে পয়সা মিটিয়ে দেয়। সে দেখে তার ঠোঁট মৃদু নড়তে। আস্তে আস্তে সে এগোয় সংকুচিত পা ফেলে। একটা অবাধ্য হৃৎস্পন্দন তার জীর্ণ দেহটাকে নাড়াতে থাকে। মনে হয় পৌঁছবার আগেই ভেঙে পড়বে ভাঙা দেওয়ালের মত। তবু তার তীব্রতা তার দেহকে তুলে ধরে থাকে, পড়তে দেয় না। একটা মগ্নতা মনকে পুরোপুরি গ্রাস ক'রে তার চেতনাকে মুগ্ধ করে রেখে দেয়।

মেয়েটি ফিরে আসছিল দেওয়ালের সারের মধ্যে দিয়ে। একটা মুহূর্ত এগিয়ে আসে সময়ের ছোট একটুকরো ঘূর্ণিজলের মত। সামনে এসে শান্তনুর দিকে চোখ পড়তে মেয়েটি চমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। মুখে বিস্ময়ের আভাস লুকোতে লুকোতে সে বলে ওঠে—

—আপনি! কতক্ষণ এসেছেন? কি আশ্চর্য, আমি ভাবিনি আপনার সঙ্গে আজকেই দেখা হবে। ফিরে যাচ্ছিলেন বুঝি?—মেয়েটির মুখে একটা মৃদু হাসি ছড়িয়ে পড়ে।

শান্তনু বিমূঢ়ের মত চেয়ে দেখছিল। তার মুখের রেখাগুলো স্থির হয়ে থাকে। তার নীচে এক অপার বিস্ময় ছড়িয়ে পড়েছিল। অনেক কথা

সেখানে ভীড়, করে আসে—কিন্তু বাইরে পথ করে নিতে পারে না। অনেক দূরত্ব পেরিয়ে সে ফিরে আসছিল এই আকস্মিকতার প্রান্তে, তবুও সম্পূর্ণ এসে পৌঁছতে পারছিল না। সে হাত দুটো তুলে অপটুভাবে নমস্কার করবার চেষ্টা করল।

মেয়েটির মুখে একটা স্মিত হাসি ফুটে ওঠে, বলে—অনেকদিন পরে দেখা হল। একটু থেমে তার দিকে মুখ তুলে চেয়ে বলল—আজ কিন্তু আপনি আমার সঙ্গে আসবেন। আমার ভাইয়ের জন্মদিন। আপনাকে আগে বলতে পারিনি। ভেবেছিলাম এর মধ্যে হয়ত একদিন দেখা হবে, কিন্তু আপনি আসবেন নিশ্চয়ই ?

শান্তনু কথাগুলো ধরতে পারে না। তার মনে হয় মেয়েটি তাকে কোথাও যেতে বলছে। সে অস্পষ্টভাবে একটা সম্মতির শব্দ উচ্চারণ করল যা ঠিক বোঝা যায় না। কিন্তু মেয়েটি আগের কথার রেশ ধরে বলে চলে,—

—আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে সত্যি খুব আনন্দ হচ্ছে। হঠাৎ এমনি আশ্চর্যভাবে মাঝে মাঝে দেখা হয়ে যায়। আমার এই ছোট উৎসবটায় আপনাকেই কেবল নেমন্তন্ন করব ভেবেছিলাম, কিন্তু সেদিন আপনার ঠিকানা চাইতেও মনে ছিল না।—

ফিরে আসার সময়ে আবার ফুলের দোকানটার পাশ দিয়ে তারা যাচ্ছিল। মেয়েটি একটা দোকান থেকে কি যেন কেনে। শান্তনু সাজানো ফুলের স্তবক গুলোর দিকে চেয়ে দেখে। তার মনে একটা অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষার মত কিছু পথ করে নেয়। সন্তর্পণে একটা ছোট সাদা ফুলের গোছা তুলে নিয়ে সে দাম জিজ্ঞাসা করল। দোকানী একটু সন্দিগ্ধ ভাবে চেয়ে থেকে দাম জানাল। পকেটে সকাল থেকে পড়ে থাকা কয়েক আনা পয়সা বের করে শান্তনু হিসেব করে দিয়ে ফুলগুলো তুলে নিল হাতে। তারপর গোছাটা সাবধানে রুমালে জড়িয়ে সে পকেটে রেখে দিল। কেন সে ফুলগুলো কিনল বোঝা যায় না। হয়ত মেয়েটির হাতে ফুলগুলো দেখে তার মনে হয়েছিল বা একটা গভীরতর মুগ্ধতা ফুলগুলোর দিকে চেয়ে তার মনে কোথাও এই সক্রিয়তা ফুটিয়ে তুলেছিল।

বেলা মুছে গিয়ে রাস্তায় গোধুলিমগ্ন আলো ছড়িয়ে পড়েছিল। মেয়েটির মুখ একটা অপ্রাকৃত উজ্জ্বলতায় ধুয়ে যায়। শান্তনু বাইরের চেতনায় যেন উপলব্ধি করতে পারে না—কেমন একটা স্বপ্নে সজাগ থাকার মধ্যে শোনা ধ্বনির

মত এসে পৌঁছয়—একটা গভীর নীরবতায়। চারিদিকে অজস্র পায়ে চলার শব্দ ফোটে না, ছায়ার মত দেহগুলো সরে যায় তাদের দু'পাশে। জন্ম-দিন—তার মানে সে জানে না। জন্ম-মৃত্যু কোনটার গূঢ় অন্তরর্থ সে অনুভব করতে পারে না। সে জেগে থাকে একটা আলোর দেওয়ালের আড়ালে অন্ধকারে, সেখানে প্রবাহমান ছন্দ এসে পড়ে, যার সম নেই, যতি নেই। কিন্তু সে মেয়েটির পাশে এমনি হেঁটে যেতে পারে অনির্দেশে। তার মুখের দিকে চেয়ে কোন গভীরতর সঙ্কেত যেন তার চেতনায় ফুটে ওঠে। তার অস্তিত্বের শিকড়কে টানে তা মাটির মত।

একটা ঘরে শান্তনুকে বসতে বলে মেয়েটি পর্দা সরিয়ে চলে গেল। সে চারিদিকে চেয়ে দেখছিল। ঘরটা শৌখিন আসবাব পত্রে সাজানো। দেয়ালের গায়ে ফ্রেমে ছবি, একপাশে মেহেগনির শেলফে সাজানো বই, কয়েকটা চীনে পুতুল। একটা পিতলের বুদ্ধমূর্তি। স্থির ছবির মত উজ্জ্বল আলোয় ফুটে থাকে, মনে হয় তার দিকে চেয়ে দেখে নির্লিপ্ত স্তব্ধ ঠোঁট বুঁজে। একপাশে একটা নীচু খোদাই-কাজ করা কাঠের তেপায়ার উপরে ফুলগুলো সাজিয়ে রেখে গিয়েছিল মেয়েটি। সাদা চিনেমাটির ফুলদানীর গায়ে কয়েকটা টকটকে লাল কুঁড়ি শিখার মত জ্বল জ্বল করছিল। পিতলের ধূপদানে একগোছা ধূপ জ্বলছিল। সরু সরু ধোঁয়ার কয়েকটা সুতো কিছুদূর উঠে অনিশ্চিত ভাবে কাঁপে, তারপর ভেঙ্গে মিলিয়ে যায় হাওয়ায়। সব কিছু স্থির নিমেষে আঁকা। ধোঁয়ার সুতোগুলো কাঁপে, ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় ফুলগুলোর নিস্তব্ধ রং। তারপর দেহহীন হয়ে সৌরভে ছড়িয়ে যায়। অদৃশ্য গন্ধের অণুগুলো ভেসে বেড়ায় ঘরখানায় —ফুলগুলোর মধ্যে দিয়ে ঘুরে বেড়ায়—তার বিশুষ্ক চামড়ায় লেগে ঢেকে যায়। চামড়ার নীচে একটা আওয়াজ গম্ভীর বারম্বারিতায় ওঠে পড়ে। অসংখ্য অন্ধকার সরু সরু শিরার পথ বেয়ে রক্তকণারা দ্রুত উত্তাল বেগে ছড়িয়ে পড়ে। তার দেহের সীমানার তীরে তীরে ঢেউ ভেঙ্গে পড়ে অবিশ্রান্ত। সে জেগে আছে; প্রতীক্ষারত। তেমনি ঐ গোলাপের কুঁড়িগুলো দেওয়ালের সাদায় উজ্জ্বল প্রতিভাত আলো। কিসের আয়োজন হয়েছে যেন। একটা উৎসবের। সে শব্দটা মনের মধ্যে ঘুরোতে থাকে। জন্মদিন—। সে জন্মেছিল এক দুঃখবহতার কোলে। হাত দুটো সাঁতরে সাঁতরে ক্লান্ত হয়ে

আসে তার। এক তিমিরে সঁপে দেবার জন্য তার উৎসুক চোখ খুঁজছিল নিজেকে। তখন কি যেন ঘটে গেল।…কে যেন তাকে ছিনিয়ে এনে মুখোমুখি এই বাস্তবহীন সময়েতে এইখানে সঁপে রেখে গেছে। সে চমকে ওঠে। সব কিছু অপরিচিত, সুন্দর, ভয়াবহ, নির্জন।

হঠাৎ সব কিছু মনে ফিরে এল তার। সে এখানকার এই অচেতন দেহগুলোর একটা নয়। ফুলগুলো বৃন্ত থেকে ভেঙে এনে সাজিয়ে রেখে দেয়া। তাদের পাপড়িতে কিংশুক রং ঝরে পড়ছে পলে পলে। ধূপের কাঠিগুলো পুড়ে যায়। টুকরো টুকরো ভস্মের মত কণা বিছিয়ে থাকে গোল হয়ে ছায়ার নীচে। সৌরভ জাগ্রত মনের মত মিশে যায় ঘরের হাওয়ায়। এই গন্ধ, আলো, কোন উৎসবের প্রতীক্ষায় নিমগ্ন। সে তা নয়। সে একখণ্ড জীবন, চিরকাল সৌন্দর্যহৃত অন্ধকারে ব্যাপ্ত। তার শরীরের মধ্যে একটা পশু যেন ভয়ে শিউরে ওঠে। সারাদিন সে কিসের ঘোরে ডুবে ছিল? সে আফিসে যায় নি। সেই অন্ধকার গুমোট ঘরের দরজায় এসে চেয়ে শোনে নি একটানা টাইপ করার খটখট—খটখট—আওয়াজ। মোম-বাতির কাঁপা শিখা থেকে চোখ তুলে দূরে একটা ছায়ার দিকে চোখ তুলে দূরে একটা ছায়ার দিকে চেয়ে থাকে নি। তারপর প্রতিদিনকার মত হারিয়ে যাওয়া, হাত দুটোর যন্ত্রের মত ওঠা নামা নির্লিপ্ত ভাবে দেখা। বা বিকেলে মানুষের স্রোতে ভেসে চলা, কেবলই পথে পথে, কোন গন্তব্য না খুঁজে। বা গঙ্গার ঘাটে বসে অন্ধকারে ডুব-দেওয়া প্রেতের মত মনটাকে অনুভব করা, মিশে যেতে ভাবনাহীন নির্বেদ শান্তিতে। একের পরে এক ছবিগুলো ভেসে ওঠে।

কালো জল অন্ধকারে ঢেউ তুলে তার পায়ের মাত্র কয়েক আঙুল দূরে নিঃশব্দে বয়ে চলেছে। দুটো অপলক চোখ তার দিকে চেয়ে রাতের ভিতর দিয়ে। তাকে আকর্ষণ করছিল, টেনে নামিয়ে নিতে চাইছিল এক হিমস্পর্শ তড়িৎ-স্রোতে। তার সমস্ত কিছু মুছে ফেলতে এক দুর্দমনীয় অন্ধ আকর্ষণে! সেদিন সে তেমনি শিউরে উঠেছিল। তাড়াতাড়ি চারি-দিকে সে তাকায়—ফুলগুলোর ধ্যানমগ্ন সৌন্দর্যের দিকে, ঘরের মেঝেয় সাজানো আসবাবগুলোর দিকে; একটা আশ্রয় খোঁজে নিঃস্পন্দ স্থির আকারগুলোয়। সেই অন্ধকার মুখোসটাকে সরিয়ে ফেলে দিতে। তার চোখ এসে থেমে থাকে দরজার ঝোলান পর্দায়। সে কান পেতে থাকে, মনে হয় পায়ের শব্দ

শোনা যায় পর্দার অন্যপাশে ; অনেক দূর থেকে বৃষ্টির ধারাশব্দ। নেমে আসার মত তার কানে কোমল আঘাতে ঝরে পড়ে। সে চেয়ে থাকে ঘরটার শান্ত আলোয়—আলোর আড়ালে অবিশ্রান্ত অন্ধকার ক্ষয়ে ক্ষয়ে ঝরে পড়ে ঘুমের মত। ধূপের কাঠিগুলো পুড়ে যায়। এই মৌনতার সঙ্গে সেও চেয়ে থাকবে, প্রতীক্ষারত। এমনি অহরহ, আর সরু সরু ধোঁওয়া কুণ্ডলের মত দুলবে স্থির নিস্তব্ধ হাওয়ায়। তারপর সেও মুছে যাবে। একটা অনিবচনীয় প্রশান্তিতে ভরে যায় তার মন। সকল পূর্বাপর মুছে যায়। সে গভীর বর্তমানে মিশে যায় প্রতি নিঃশ্বাসে। সে যেন দূরে চলে এসেছে—সব অতীত নিরন্তর এক ভাঁটার টানে কোথায় নেমে গেছে অন্ধকারে।

তার চমক ভাঙ্গে গলার আওয়াজে। কথাবার্তা আর পায়ের শব্দ এগিয়ে আসে। একটি কিশোর গলা বলে ওঠে, দিদি, তুমি যে বলেছিল তাঁরা আসবেন?

শান্তনু শোনে মেয়েটির গলা প্রত্যুত্তরে বলতে—হ্যাঁ ভাই—এসেছেন, তুমি গেলেই দেখতে পাবে।

পর্দা সরিয়ে সে একটি ন' দশ বছরের ছেলের হাত ধরে ভিতরে এসে দাঁড়াল। ছেলেটির মুখ তার দিদির মত, কেবল একটু বেশী বিশীর্ণ। একটা উজ্জ্বলতা ফুটে উঠেছিল সেখানে, যা তার সরু মুখের রেখাগুলোকে আরও তীক্ষ্ণ পরিস্ফুট করে তোলে।

শান্তনু মুখ তুলে তাকাল। তার দৃষ্টি এসে থেমে থাকে ছেলেটির পুরো মেলে ধরা চোখের পাতায়। এত সুন্দর চোখ সে যেন কখন দেখে নি। মনে হয় কোন অনুপম হাত খোদাই করে রেখেছে পাথরের গায়ে সে দুটো। পাথরের মত অপলক চেয়ে থাকে চোখ দুটো তার মুখে নিবদ্ধ দৃষ্টি স্থির রেখে। একটা মুগ্ধতা যেন সব সময় ঘিরে থাকে সেখানে।

তার হাত ধরে একটা কৌচে বসিয়ে দিয়ে মেয়েটি শান্তনুর দিকে ফিরে বলল—

—আমার ভাই। আজ ওর জন্মদিন। —একটু চুপ করে থেকে সে আবার বলল—জানেন, ওকে বলেছিলাম—ওর জন্মদিনের দিন আপনি আসবেন। আপনাকে ও চেনে, তাই না এলে ও কিন্তু খুব রাগ করত। তাই নয়? বলে সে সস্নেহে চাইল ছেলেটির মুখের দিকে।

হঠাৎ ছেলেটি মুখ ফিরিয়ে দরজার দিকে চাইল, তারপর ক্ষুব্ধ অভিমান ভরা কিশোর গলায় বলে ওঠে—যাঃ, কেউ আসেনি। মিছিমিছি আমাকে

ভোলাও। আমি জানি কেউ আসে না। কোনদিনও না! আমি যাই, আমার ভাল লাগছে না—

মেয়েটি তাড়াতাড়ি উঠে এসে তার পাশে বসে তুকাঁধে হাত রেখে অনুযোগের সুরে বলল—ছি, ভাই! তুমি চলে গেলে উনি রাগ করবেন—মনে আঘাত পাবেন। তোমার জন্মদিন—তাই আমি তাঁকে বলেছি আমাদের অতিথি হতে, আর তুমি চলে যেতে চাইছ—তা হলে আমরা জন্মদিন কাকে নিয়ে করব ?—

ছেলেটি কথাগুলো শোনে কান পেতে। কয়েক মুহূর্ত ঘরটা নিস্তব্ধতায় ভরে থাকে। তার চোখ তেমনি অকম্পিত দৃষ্টি মেলে চেয়ে দেখতে থাকে। একটু পরে সে বলে—

—কে ? কই তিনি ? এখানে থাকলে আমি ঠিক জানতে পারতাম। জানো, আমি টের পাই টিকটিকিগুলো দেয়াল বেয়ে যখন নেমে আসে তেলা-পোকাদের খেতে। রাত্তিরে জেগে জেগে আমি জানতে পারি কখন রাত ফুরিয়ে আসে আর পাখিগুলো ডাকতে শুরু করে। কখন সূর্য ওঠে দিন হলে। আমার ঘরে রোদ এসে পড়ে জানালা দিয়ে। রোদ সরে সরে এগিয়ে যায় জানলার কানায়। আর একটা কাক এসে বসে চেয়ে থাকে জানলার কবাট থেকে। বিকেল বেলা সবাই বাড়ী ফেরে, রাস্তা দিয়ে কথা বলতে বলতে যায়। আমি সব জানতে পারি—কেবল তোমরা ভাব আমি টের পাই নে—মিছিমিছি আমায় কষ্ট দাও!—সে মুখ নীচু করে বসে থাকে।

মেয়েটির মুখ এক অনির্বচনীয় বিষণ্ণতায় ভরে ছিল। সে শান্তনুর দিকে ফিরে বলতে লাগল খুব মৃদু গলায়—তুমি সব জানতে পার—আমরা জানি। কত কি আমরা কখনও বুঝতে পারি না—তুমি ঠিক বলে দাও। এমন কি আমরা যা দেখতে পাই না—

—কিন্তু তুমি যে বলেছিলে তিনি আসবেন ?

—এসেছেন বৈকি—তুমি জিজ্ঞাসা করো তাঁকে—

-- তাঁর নাম কি দিদি ?

হঠাৎ শান্তনু বুঝতে পারে। ছেলেটি অন্ধ। তার সুন্দর পাথরে-গড়া চোখ দুটো দিবারাত সে আপনি যে অন্ধকারে চেয়ে থাকে সেইদিকে ফেরানো। তার মুখের ভাঙ্গাচোরা রেখাগুলো একটা কোমলতায় ঢেকে যায়। যেন সে প্রথম চেয়ে দেখতে পায়, তার চোখের অন্ধকার ভরে রয়েছে মেয়েটির হৃদয়ে।

তাই তার আপন শ্রীদগ্ধ রূপের দিকে চেয়ে তার দৃষ্টি প্রত্যাহত হয়ে ফিরে আসে না। মেয়েটির মুখ একটা বিপন্ন সংকোচে ভরে থাকে। শান্তনু যেন হঠাৎ সজাগ হয়ে ওঠে। তার গলা থেকে অত্যন্ত সহজভাবে সে শোনে তার নাম উচ্চারিত হতে—

—আমার নাম শান্তনু। শান্তনু দত্ত—

ছেলেটি চমকে তাকায় তার গলার স্বর লক্ষ্য করে। তার ঠোঁট দুটো বিস্ময়ে কেঁপে ওঠে।

—শান্তনু!—দিদির দিকে ফিরে নামটা তাকে শোনাবার ভঙ্গীতে সে বলে উঠল—দিদি দেখ উনি ওই মাঝখানের কৌচটায় বসে আছেন আমার দিকে ফিরে—

—হ্যাঁ ওঁর নাম শান্তনু।

—দিদি, উনি দেখতে কেমন?

আরেক জন শান্তনুর মুখের দিকে চেয়ে দেখে, বলে—খুব সুন্দর উনি—যেমন নামটা ওঁর সুন্দর ঠিক তেমনি।

শান্তনু চেয়ে থাকে তার নিষ্পলক চোখের গভীর খাদে। তার মনে হয় গোধূলির আলো মিলিয়ে যে রাতের আবির্ভাব নিঃশব্দে হয় তার মত সুন্দর। তার এতদিনের কৃষ্ণতা যেন আবরণ খসে মুছে যায় সে রাতে। তার বাক্য-অবরুদ্ধ হৃদয়ের তল থেকে অনেকদিন পরে কি যেন উৎসারিত হতে চায়। কিন্তু তা অব্যক্ত হয়ে থাকে। তার অসুন্দর আবরণ ঢেকে থাকে কথাগুলো। তার মনে পড়ে একগোছা ফুল সে কিনে এনেছিল। সাদা ফুলের কুঁড়ি। ভোরবেলা আধফুটন্ত থাকতেই হয়ত তুলে আনা। সকালবেলা সেই আলো হাওয়ায় দোলা পথ—পথ থেকে পথে—রৌদ্রছায়ার আলপনা পায়ে মেখে সে চলেছিল বহুদূরে। তার পরে সে ফিরে এসেছে। এখানে যেন এক পরিসমাপ্তি।

সে উঠে গিয়ে ছেলেটির পাশে এসে বসল। ফুলের ছোট গোছাটা বার করে তার হাতে দিয়ে সে বলে—এই ফুলগুলো তোমার জন্যে—তোমার জন্মদিনে এনেছিলাম।—

—তুমি কিন্তু আর আমায় অবিশ্বাস করতে পারবে না!—মেয়েটি মুখ ছেলেটির কানের কাছে নামিয়ে এনে বলল।

—বাঃ—কি সুন্দর—! ফুলগুলো কি সাদা?—

—হ্যাঁ ?

—দিদি দেখ কি সুন্দর দেখতে !

—তুমি বসে গল্প কর। আমি আসছি তোমাদের জন্যে চা নিয়ে—শান্তনুর দিকে একটু হেসে মেয়েটি উঠে গেল।

বাড়ী ফেরার পথে তার মনে হয় রাতটা অসম্ভব স্বচ্ছ। তারা জ্বলে কালো হীরের মত আকাশ ভরে মিট মিট করে। একটা চৌমাথায় গাড়ী থামার লাল নিশানা জ্বলছিল। সে বুক ভরে নিঃশ্বাস নেয়। হেমন্তের ছোঁওয়া লেগে রয়েছে হাওয়ায়। পথের ধারে একটা গাছের সবুজ পাতায় বিজলী বাতির আলো এসে পড়ে। শিশির জমে উঠছিল গাছের পাতায়, ঘাসে, পার্কের গেটে যুঁইয়ের কুঁড়িগুলোর শীর্ষে। চলতে চলতে একটা গলিতে তার ছায়া দীর্ঘ হয়ে পড়ে, অবিকৃত।

পনের

সব ঠিকঠাক করতে আরও দিন কতক লাগবে। তবু দিনগুলো কাটছে হু হু করে যা হোক। তেমন আর মনে হয় না। একদিন আর একটা দিনের পিঠে পুরোনো নামতার ছড়ার মত এসে দাঁড়ায় না। সংক্রান্তি, মাস পয়লা পার করে দোসরা যাত্রা করবে বলেছে গাঙ্গুলীগিন্নী। তারও এদিকে সব সারা হয়েছে। তবুও খুঁটি নাটি কত কি ভাবতে হয়। পাঁজিটা থেকে থেকে পাতা উল্টে দেখেন। হরফগুলো ধাবড়া ধাবড়া চোখে লাগে। সেই যে চশমাখানা ভেঙে গেছে আর মেরামত হল না। কালো কালো লেখা ঝাপসা অস্পষ্টভাবে বোঝা যায়। তিথি নক্ষত্র লিখেছে শুভ, যাত্রার কোনই বাধা নেই। তবু পাতাগুলো উল্টে যান। বিজ্ঞাপনের ছবি দেখতে ভাল লাগে। কত বিচিত্র সব ঠিকানা লেখা, নামগুলো আজগুবী ঠেকে। অচেনা জায়গার নাম, কোথায় কে জানে। চেয়ে থাকতে থাকতে উন্মনা হয়ে থাকেন। কি এক নিঃসঙ্গতর ভুবনে মন চুপি চুপি এসে দাঁড়ায়। সেখান থেকে দূরের দেশগুলোর দিকে চেয়ে দেখেন। কাছে সরে আসতে মন চায় না। পাঁজির পাতায় কয়েকটা শব্দ চোখের সামনে হঠাৎ নিশ্চল হয়ে থেমে যায়। অর্থ হারিয়ে ফেলে। বুড়ি ছুঁয়ে মনটা কোথায় যেন আনমনে চলতে থাক। স্বয়ং বিধাতাও টের পান না খবর।

ক'টা দিন কোথা থেকে আগন্তুকের মত এসেছে তার কাছে। তার হাত ধরে ছুটোছুটি করে তাঁকে কোথায় নিয়ে চলেছে। তিনি ভেবে পান না। তাদের দ্রুতলয়ে পা ওঠে না। ফেলতে ফেলতে জড়িয়ে যায়। পিছু ফিরে ফিরে দেখেন। মনে হয় কি ফেলে গেছেন—কি তা স্পষ্ট বোঝা যায় না, কিন্তু একটা হারানোর ভাব, যদিও তা লঘুতর করে রেখে যায় বুকের কোনো শূন্য অঙ্ক। কি যেন কেবলই থিতিয়ে পড়ে তলায়, মন থেকে কেবলই ঝরে ঝরে পড়ে অবিরত, কণায় কণায়। পোড়া মন কি এত কিছুও লুকিয়ে রেখে দিয়েছিল! ছায়া ছায়া কত ছবিই না জেগে ওঠে।

রোদে পা ছাড়িয়ে বসে ভাবছিলেন। পাঁজিটা হাঁটুর ওপর খোলা পড়ে থাকে। কেমন রোদের আলো পুরোনো সোনার মত টকটকে। চেয়ে থাকতে

থাকতে পরিব্যাপ্ত হয়ে যায় সকল ঠাঁই, স্মৃতিতেও। কবে কোথায় যেন মনে পড়ে, কার্তিকের ধান কেটে নিয়ে মুনিষেরা বাড়ী ফিরছে। কিসের গন্ধ··· নতুন ধান রোদে শুকোতে শুকোতে যেমন বাতাস ছুঁয়ে থাকে। পুতুলের বে দিতে তাই চারটি সেই ধানের চিঁড়ে ঢেঁকিঘর থেকে তুলে এনেছিলেন। তাই দেখে ঠাকুমা বুড়ি শাসিয়ে বলেছিল—আবাগীর বেটি—লক্ষীর ভোগ উচ্ছুগ্গু না হতে হাত দেওয়া! চিরজন্ম ছেড়ে থাকবেন দেবী তোরে!··· আর লাল শালু কেটে সাদা ফুল বুনে বুনে পুতুলের বেনারসী করেছিলেন। কচুর পাতা ভাগ করে করে মোচ্ছবের নানা আয়োজন। সে পুতুল কোথায় হারিয়ে মৃত্তিকার সঙ্গে মিশে আছে। আর সেই রোদের চিক ঝোলানো নারকেল বাগানের তল দিয়ে যেতে যেতে পথিপার্শ্বে একগোছা কুন্দ খুঁটে নিয়ে রুক্ষি চুলে গেঁথে রাখতেন। কেউ দেখত না।···কেবলই পিছিয়ে পিছন পানে—মন-পুরানো এক দেবালয়—কতকালের প্রদীপের শিখা দোয়ালে কালি কাজলের দাগ এঁকে নিভে গেছে। পরপর কত করুণা-দেবী জন্মান্তর পেরিয়ে তাঁর সজাগ চোখের সামনে ছায়া-শরীর নিয়ে ফিরে এসে দাঁড়ায়। মাটীর পুতুল খেলে বাক্সটিতে ঘুম পাড়িয়ে আবার কোথায় চলে যায়। কেউ জানে না। চোখের পাতায় জল জল করতে থাকে রোদ, আড়ালে পদ্মের কুঁড়ির মত একটি একটি লুপ্ত কথা ফোটে। যত ক্ষয় হয় তত নিখাদ হয়ে আসে সোনা। বুকে পরতে টনটন করে মোচড়ায়।

হঠাৎ চমকে উঠলেন করুণাদেবী। ক'দিন থেকে মনে হয় মনটার রশি কেমন আলগা হয়ে আসে মুঠোর ভেতর, কোথায় যেন চলে যায়। তাঁর প্রৌঢ় স্থবির চাউনি মেলে খুঁজে পান না। ভেবে পান না কারণ কি। হঠাৎ একরাশ উদ্বিগ্নতায় মন ভরে ওঠে অকারণে। এদিকে দিন যে ঘনিয়ে এল! উয্যুগ আয়োজন এখন কত বাকি। যাবার গোছগাছ কিছুই সারা হয় নি। একটা উচ্ছ্বসিত খুশির আবেগ তাঁর জীর্ণ দেহটাকে দোলা দিয়ে বয়ে যায়, কিশোরীর মত নেচে ওঠে কে যেন ভিতরে। ইচ্ছা হয় ছুটে উপরের ঘরে যান। কেউ নেই। এই অবসর। এই বেলা নিরিবিলিতে গোছগাছ করে ফেলবেন। কত কি ভাবতে হয়। কত টুকিটাকি—ফেলে গেলে আর ত ফিরে আসবেন না কুড়োতে।

করুণাদেবী উঠে ধীরে ধীরে উপরের ঘরে এসে দরজা থেকে চেয়ে দেখলেন। সবে বেলা দশটা হয়ত। ঘরে গীর্জা ঘড়িটার দিকে চাইতে মন

কেমন একটা দুষ্টুমী-ভরা ভাবে ভরে ওঠে। থাক বন্ধ! যেমন এতকাল হাত ছুটো ঠুঁটো জগন্নাথের মত মেলে চেয়ে আছে! এক কালে বাজত। তিনি শুনেছিলেন—ঢং—ঢং—বাজনার মত একটা আওয়াজ হত। তাঁরা মেয়েরা রান্না-ঘরে গল্প করতে করতে কখন দুপুর গড়িয়ে যেত—আর আওয়াজটা কর্তামশায়ের মোটা গলার মত গড়িয়ে এসে ঢুকত ঘরে। তাঁরা অকারণে হেসে উঠতেন। থাক থেমে!

তোরঙ্গটায় চাবি ঘুরিয়ে তিনি ডালা তুলে উঁচু করে রাখলেন। একটা পুরাতন গন্ধ হাত বাড়িয়ে এসে স্পর্শ করে তাঁর ঘ্রাণে। প্রতিদিনই তোরঙ্গ খুললে টের পান, তবু কেন যেন গন্ধটায় কারও উপস্থিতির মত কি হঠাৎ সজাগ হয়ে ওঠে। তাঁর চোখ ভাবতে ভাবতে চেয়ে দেখে। পাট করা সেকেলে শাল, লম্বা হাতা ফুল তোলা রেশমের কামিজ, ভাঁজ করা জায়গায় জায়গায় ছোপ ধরে যাওয়া পাটের শাড়ী, তাঁর স্বামীর গলাবন্ধ কোট, একটা টিকিনের থলের মধ্যে তাড়া বাঁধা পুরোনো চিঠি। কারা লিখত সেকালে—শ্রীহট্ট থেকে, গবেশপুর থেকে, মথুরা থেকে—ননদেরা—আরও কত কে। কি যেন লিখত, আত্মীয় কুটুমের খবর, লোকজন দেশ-বিদেশের কথা। চারিদিকে বিশাল পৃথিবীর অণু অণু কণা, রাশি রাশি মানুষ যাদের পায়ের শব্দ কতকাল শুনেছেন গলির শান বাঁধা পথে, পার হয়ে গেছে অদেখা জনস্রোত,—আর কত মানুষের আনাগোনা, ইষ্টিশান, হাট বাজার,—বন্যার মত শব্দ তরঙ্গ ছুটে এসে আছড়ে পড়ে কানে। অবারিত আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

তিনি দরকারী কয়েকটা কাপড় বের করে নেন। ছু জোড়া থান—একটা ছেঁড়া শাল, অন্যগুলো সরিয়ে রেখে দেন। সবই সধবা দশার, কোনদিন কাজে লাগবে না। তবু কত কি খুঁটিনাটি মনে পড়তে লাগল। বিদেশ বিভুঁই জায়গা। একটা নামাবলী ভাঁজ করা রয়েছে, সেটা আলাদা করে রাখেন। সংসারে কত কি লাগে। হঠাৎ চমকে ওঠেন। কার সংসার পাতবেন? কার সঙ্গে গাঁটছড়া? ধু-ধু করে একটা শিখা জ্বলে—তার আগে এই অবসরটুকু। এই চরণামৃত পান করে জীবনটাকে নিঃশেষে সমর্পণ করা।

উঠে দাঁড়িয়ে করুণাদেবী দেখতে লাগলেন এদিক ওদিক তাকিয়ে। দেয়ালে সার সার টাঙানো দুর্গা কালী জগদ্ধাত্রীর পট, জগন্নাথ দেবের পুরীর ছবিখান। তাঁর হাতে ত্রিশ বছর ধুনো গঙ্গাজল পেয়েছেন। ভাবেন উঠে গিয়ে সেগুলো পেড়ে আনেন। সঙ্গে নিয়ে যাবেন। আবার ভাবেন, না। শত্তুরেরা অমনি সন্দেহ

করবে! বুড়ি পটগুলো সরিয়ে ফেলল কেন রাতারাতি? মতলব হাসিল করার আগে কানামাছিও টের না পায়! ওখানেই থাকুন ওঁরা। আবার মনে হয় —সাঁঝে প্রদীপ জ্বলবে না! অন্ধকার হয়ে থাকবে ঠাকুরের মুখের গোড়া!··· সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন? দোদুল্যমান হয় মন। শেষটায় খুব নীচু গলায় নিজেকেই বিড় বিড় করে বললেন—থাকুন ওঁরা ওখানে। যেখানে দেবাদি-দেবের পায়ে যাচ্ছি—সবাইকেই ত পাব একঠাঁই!

গহনার বাক্সটা ছোট একটা টিনের পোর্টম্যান্টোয় ভরে রেখে করুণাদেবী কাপড় চোপড়গুলো গোছগাছ করে রেখে উঠে দাঁড়ালেন। আচ্ছা, কাশী কেমনতরো জায়গা? নেমে কি করবেন? কেমন ভয় ভয় করে। একা, বুড়ো মানুষ···! কিন্তু পরক্ষণেই আশ্বস্ত হন। সে ভাবনা গাঙ্গুলীগিন্নীর। একফাঁকে দেখা করে এসেছেন একদিন। বয়স তাঁরই মত। দাঁত একটিও নেই। খুব সতী স্ত্রীলোক মনে হল মাগীকে। বললে কত কথা। তিনি মনে মনে হাঁ করে শুনেছিলেন। মুখে অবশ্য বলেছিলেন—ইহজন্মে বাবা বিশ্বনাথের চরণসেবা করতে পারলাম না দিদি—তুমি যদি বোনের সাধটা পূরণ করে স্তাও! ছেলেরা ত আর মাকে কাশী দেখাল না।

গিন্নি লোকটা মন্দ নয়। তবে একটু ঠ্যাকারে ঠ্যাকারে ভাব। তা হবে না কেন? কোন সাধটা বিধাতা অপূরণ রেখেছেন? ঘর ভর্তি বউ-ঝি-নাতি-পুতির সংসার, যেন চাঁদের হাট বসেছে! তাঁর মত দুঃখিনীর বরাত ত সবার নয়। আদর আপ্যায়িত যথেষ্ট করল। বলল—কোন ভয় নেই দিদি, তেরাত্তির পুয়োলে কাশীর টিকিট কাটব! বলে পঞ্চাশ পেরুলে আর সংসারের ধূলো কাদা গায়ে মাখতে নেই। তুমি থাকলে দুটো কথা বলে বাঁচব।

পোর্টম্যান্টোতে তালা এঁটে তোরঙ্গ বন্ধ করে করুণাদেবী উঠে দাঁড়ালেন। আজ একবার স্যাকরার কাছে যাবেন চুড়ি দু'গাছ নিয়ে। আপনিই যাবেন। কাকেও বিশ্বাস নেই। হারামজাদী সৈরীর মা বিটির মুখে যেন দেবতা কেলে হাঁড়ি ছুঁড়ে মেরেছেন! মুখ তোলো করেই আছে! ক'দিন থেকে ভাল করে দুটো কথাও কয়নি। মরুক গে যাক! কত দেখেছেন।

কিন্তু একা কি করে যাবেন স্যাকরার দোকানে? কবে কত বছর আগে পথে বেরিয়ে দেখেছিলেন একবার। তারপর কত পাল্টে গেছে পথঘাট। শুনেছেন ষষ্টিতলার পাশ দিয়ে ময়রার দোকান বাঁ হাতে রেখে যেতে হয়। কিন্তু রাস্তাটা কল্পনা করতে পারেন না। সবটাই আবছা অস্পষ্ট। কাছের জিনিষ এত

দূরে। তিনি পাবেন না খুঁজে হয়ত। জিগ্যেস করে করে কোথা থেকে কোথায় গিয়ে পড়বেন। থাকগে। সৈরীর মা আসুক। তাকে বলবেন একটু সঙ্গে নিয়ে যেতে। ছুঁড়িটাকেও যেন আনে দুপুর বেলা। বসিয়ে রেখে যাবেন বাড়ী আগলাতে।

অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন করুণাদেবী। সময়টা নির্জন নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে রোদের চেয়ে থাকার মত। ঘরে তাঁকে ঘিরে কতকালের পরিবেশ। সব কিছু। হঠাৎ মনে হল কার যেন ছায়া এসে পড়ে দরজা৷ ভীষণ চমকে ফিরে তাকান করুণাদেবী। সর্বাঙ্গে রোমগুলো খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়ায়। স্পষ্ট মনে হল কে যেন সরে গেল চেয়ে দেখে। নিস্তব্ধ বাড়ী, বাইরে রোদ ঝিম ঝিম করছে। দেয়ালগুলো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। দেয়ালে কালী জগদ্ধাত্রীর পট অকম্প। করুণাদেবী কপালে ঘামের ভিজে ভিজে একটা ভাব টের পান। তার চেতনা একটা স্পষ্ট কিছু দেখেছিল। মনে হয়েছিল একটা মুখ উঁকি দিয়েছিল দরজা দিয়ে। কার মুখ? তিনি পিছন ফিরে চাইলেন। দরজার কবাট আলোয় আঁকা। তবু—তবুও তিনি দেখেছিলেন। কে, শান্ত? নাকি শান্তর বাবা? একটা দগ্ধ ম্লান মুখ। কে চেয়েছিল এমন ধারা? মা গো! এ কি চাউনি, প্রাণের এক অন্ধকারে চেয়ে সরে গেল! ওরা বুড়িকে রেহাই দেবে না! এখনও বুকের তলাটা তোলপাড় করছে ঢেঁকিতে পাড় দেওয়ার মত। করুণাদেবী কান পেতে থাকেন। মনে অনর্গল আর্তনাদ হতে থাকে। আমার পথ ছেড়ে দে—আমি যাই, কতটুকু সম্পর্ক জগতে ওদের সঙ্গে? কার পায়ের শব্দ যেন এগিয়ে এল ছাদ দিয়ে।

—বৌদি!

—এসেছিস? করুণাদেবী উদ্গত অশ্রু গলা থেকে নামিয়ে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে।

সৈরীর মা ভিতরে এসে তাঁর ভয়ে বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—একি বৌদি! অমন করে চাইছ কেন গা! কি হল আবার?

—বড় বুকটা ধড়ফড় করছে রে! তুই এলি তাই—

—তাই বলি, মুখটা তোমার ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। শরীর খারাপ হল নাকি?

—না, বড় ভয় লেগেছিল। তুই এসে পড়লি—বলতে বলতে থেমে গেলেন করুণাদেবী।

সৈরীর মা কবাটে একটা হাত রেখে অবাক হয়ে চেয়ে বলল—কিসের ভয়—দিন দুপুর বেলা!

—এই কিছু নয়—বুঝলি—হঠাৎ কেমন দম বন্ধ হয়ে আসছিল। মনে হয়েছিল কে যেন দরজায়—তিনি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে লাগলেন কথাটা না বলতে পেরে।

সৈরীর মা বুঝতে না পেরে চেয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ যেন সম্বিৎ পেয়ে বলে উঠল—তুমি বস বৌদি। আমি পাখাটা এনে হাওয়া করি—বলে তাড়াতাড়ি পাখা খুঁজতে লাগল আশে পাশে। করুণাদেবী বসে পড়লেন দেয়ালে ঠেস দিয়ে। পাখা এনে সৈরীর মা উদ্বিগ্ন চোখ তুলে দেখতে লাগল তাঁর মুখের দিকে।

—তাইত। কি হল তোমার বৌদি—কখন ত এমনতর হয় না তোমার! তাই বলি একটু বিশ্রাম কর। হাজার হোক বয়স হয়েছে! শরীরটাও ত অবসর চায়—

করুণাদেবী চেয়ে থাকেন শূন্যদৃষ্টিতে। একটু পরে সহজ গলায় বললেন, —আজ একটু বেলা পড়লে আসিস সৈরীকে নিয়ে—স্যাকরার কাছে একবার যাব ভাবছি। ও কিছু নয়। মাঝে মাঝে মাথাটা কেমন ঘুরে ওঠে। বস্ তুই।

একটা পরিবর্ত্তনের ভাব যেন অনুভব করা যাচ্ছিল। ধীরে ধীরে এতদিনের আচরিত অভ্যাসগুলোর কোথাও এক একটা ব্যতিক্রম ফুটে উঠছিল। অথচ কেউ তা লক্ষ্য করে না। নিতাই আজ সকালে উঠেই মুখ হাত ধুয়ে কোথায় হনহনিয়ে বেরিয়ে গেল। করুণাদেবী চা ভিজিয়ে উনুনের দিকে মুখ করে ভাবছিলেন, টের পান নি। আজ একটু বেলা করেই এসেছিল সৈরীর মা। কলতলা থেকে বাসন কোসন তুলে রান্নাঘরে নামিয়ে সে কিছুক্ষণ হল দাঁড়িয়ে দেখছিল কবাটে একটা হাত রেখে। কিন্তু করুণাদেবী মুখ তুলে চাইলেন না একবারও। শেষটায় সে নিজেই কথা বলল—

—বড় ছেলে হনহনিয়ে বেরিয়ে গেল কোথা বৌদি?

করুণাদেবী চমকে বিস্মিত মুখ তুলে তাকালেন। কথাগুলো তিনি পুরো শুনতে পাননি। তাই আরেকবার শোনার অপেক্ষায় থেকে বললেন—

—কার কথা বলছিস ?

—ওমা, এই নাও—নিতাই বেরিয়ে গেল সামনে দিয়ে, চা না খেয়ে, দেখতে পেলে না ?

—নিতাই ! কোথায় গেল ?—তাড়াতাড়ি তিনি মুখ নামিয়ে তাকালেন পেতলের পাত্রটায় ভিজিয়ে রাখা চায়ের দিকে। অনেকক্ষণ ভিজে গাঢ় হয়ে গেছে। একটু আশ্চর্য হয়ে বললেন—তাইত, বললি নে ? এধারে চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে যে। কোথায় গেল আবার ?

—তা কি জানি ! দেখলাম কেবল কথা না বলে জুতো জোড়া পায়ে ঢুকোতে ঢুকোতে বেরিয়ে গেলেন।—সৈরীর মার মনে আশ্চর্য ভাবটা আরও গভীর হয়ে ওঠে। কোনদিন চা না খেয়ে যে এক পা নড়ে না—হঠাৎ কি এমন জরুরী কাজ পড়ল—যে একবার ফিরে বলেও গেল না।

কিন্তু করুণাদেবীর উদাসীন অন্যমনস্ক দৃষ্টিটা তার কাছে আরও অবাক ঠেকে। চায়ের বাটিগুলো সামনে সাজানো অবস্থায় পড়ে থাকে। তিনি যেন টের পান না কিছু।

—উনুন বয়ে যাচ্ছে। কিছু একটা চাপাও বৌদি, এধারে বেলাও ত আজ ঢের হয়েছে দেখি।

হঠাৎ তিনি চমকে সজাগ হয়ে উঠেন। তাইত, বেলা হয়েছে। রোদ চড়চড়িয়ে উঠেছে, যেন একখান আনকোরা পাটভাঙ্গা চাদর বিছিয়ে দিয়েছে উঠোনে।

—তা বাপু কোথায় সকালবেলা বেরিয়েছেন—অতশত বুঝতে পারি নে! নে তোর চাটুকু, আর শান্তকে এই বাটিটা দিয়ে আয়। করুণাদেবী পর পর পাত্রগুলোতে চা ঢেলে একটা ঠেলে দিলেন সৈরীর মার দিকে। নিজের পেতলের গেলাসটা আঁচলের আগা দিয়ে জড়িয়ে তুলে ধরে ফুঁ দিতে দিতে তিনি তাকান দরজার বাইরে। কেমন অন্যমত ভাব জড়িয়ে আছে সত্যি সকালবেলা। তাঁর মনের চারপাশে নতুন গুটি সুতো দিয়ে বুনে তুলছে কি এক বিচিত্র কতগুলো রেখা—তাঁকে আনমনা করে রাখছে। চায়ে চুমুক দিয়ে গেলাসটা নামিয়ে রেখে তিনি মন দেন সংসারের কাজে।

ষোল

রোজকার নিয়মগুলোর মধ্যে এই বোধহয় একটা প্রথম ব্যতিক্রমের মত সেদিন সকালবেলা নিতাই হন্ হন্ করে বেরিয়ে এল বাড়ী থেকে। তখনও গলি দিয়ে বেশী লোক যাতায়াত করতে শুরু করেনি। দু একজন অফিসরুজী কেরাণী থলে হাতে চলেছে বাজারে। সদর রাস্তায় দোকান-পাটের কবাট বন্ধ। ল ময়রাদের দোকানের সামনে ছোট বড় ভীড় করে লোকে কচুরি ফুলুরি কিনছে। বড় রাস্তায় পৌঁছে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে নিতাই তাকাতে লাগল। ভোরবেলা তার কাছে কেমন অপরিচিত ঠেকে। রোদ আস্তে আস্তে পূবদিক থেকে বাড়ীগুলোর মাথা ডিঙিয়ে উঠছিল। কাছে দূরে উনুনের ধোঁয়া জায়গায় জায়গায় কুয়াশার মত জমে বিস্তৃত হয়ে পড়ছিল। কোনদিন এত ভোরে সে রাস্তায় বেরোয় নি। একবার কেবল—যখন তার বাবা শেষ রাত্তিরে মারা গেলেন, তখন শববাহীদের ডাকতে সে বেরিয়ে এসেছিল খুব ভোরে। এমনি গতিহীন অপরিচিত মনে হয়েছিল সেদিন। কিন্তু কেন যে সাত তাড়াতাড়ি আজ বেরিয়ে এল, একটা উদ্দেশ্য সে কোথাও খুঁজে পায় না। তারপর আবার হঠাৎ একটা ব্যথার উৎকণ্ঠার মত তার মনে পড়ে কেন সে বেরিয়ে এসেছে। তার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছিল না, বা বিশ্বাসের যতগুলো পূর্ব কারণ থাকলে সে কোন কিছুকে এতদিন বাস্তব বলে অনুভব করতে পারত, তার বাইরেও কয়েকটা নিয়ম এই ঘটনাকে সম্ভব করেছিল। নিতাই একমনে হেঁটে চলেছিল। কিন্তু সত্যিই কি সম্ভব? হনহনিয়ে চলতে চলতে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাড়ী থেকে বেরিয়ে এবার নিয়ে এই সে পাঁচবার থমকে দাঁড়াল। কেন এত সকাল সকাল বেরিয়েছে? দোকান ত আটটার আগে খোলা হয় না। এখন সবে —সে আবার চোখ তুলে রোদের উগ্র আলোর দিকে চেয়ে দেখল। কি জানি কিছুতেই বাড়ীর ভিতর টিঁকতে পারছিল না। কেবল থেকে থেকে একটা কিসের প্রবল উৎকণ্ঠা ম্যালেরিয়া জ্বরের কাঁপুনির মত গ্রাস করছিল তার দেহকে, চৈতন্যকে। মনে হচ্ছিল ছুটে বেরিয়ে গেলে সে এড়িয়ে যেতে পারবে সেটাকে। থেকে থেকে গলার মধ্যে কি দলা পাকিয়ে উপর দিকে ঠেলে ওঠে। সে হাঁ করে—যদি উগরে ফেলা যায়। কিন্তু কিছু উঠে আসে না, কেবল একটা নিরুপায় আক্ষেপ সেখানে কঠিন হয়ে আটকা পড়ে থাকে।

সারারাত তেমনি ধারা হয়েছিল। সে বিছানায় এপাশ থেকে ওপাশ করেছিল একটা মোটা স্থূল নীরেট জানোয়ারের মত মুক্তি পাবার জন্য ওর হাত থেকে। কিছুতেই না। ঢক্ ঢক্ করে আধ সরাই জল গিলে আবার শুয়েছে। তবুও নয়। কানের চারপাশে শব্দ দুম দাম আওয়াজ করে চলে। মনে হয় সারাদিন গাড়ী ঘোড়া ট্রাম বাস ফেরীঅলা পথচারীদের পায়ের শব্দ, খদ্দেরদের হাসি আর্তনাদের শব্দ আর থামে না। দিন যেন শেষ হয়নি। রাতও ফুরোয় না। কেবল ঘণ্টা বাজছিল দূরে একটা বাড়ীর দেওয়ালে ঢং ঢং করে। কেবলই তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল সময় তবু দ্রুত পেরিয়ে চলেছে। রাত কাটছে। তবু আওয়াজ তার কানে সারারাত বেজে চলে, নির্মম অধ্যবসায়ে, তাকে ক্ষান্তি না দিয়ে। বোধহয় রাত তিনটের সময়ে সে ধড়মড়িয়ে উঠেছিল বিছানা ছেড়ে, তারপর দরজার খিল খুলে বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল।

সে অবাক হয়ে যায়। চারিদিক কি গভীর নিস্তব্ধ। সে কোনদিন জানত না রাত এত নিঃঝুম হয় কখনও। আকাশে কিসের কালো জোয়ার বয়ে যাচ্ছিল। তারায় তারায় ঝিক ঝিক করছিল। নিতাইয়ের কেমন যেন ভয় করে। এসে দাঁড়াতেই তার কান থেকে সব আওয়াজ কি নিঃশেষে মুছে গিয়েছিল? চারি-দিকে সব স্থির। ছায়ার প্রকাণ্ড নীরেট প্রতিকৃতিতে আঁকা দেওয়াল, নারকেল গাছটার নোয়ান পাতা, আলসের কোণ, দূরে একটা জানলায় জ্বলে থাকা আলো, সবকিছু ঢেকে আকাশ জোড়া একটা সুগম্ভীর মৌন। নিতাই কারবারী মানুষ —দিনের সঙ্গেই তার জানাজানি ছিল এতদিন। রাতের অন্ধকারেও সে সেই দিনমানের অনুভব-সীমাতেই ঘুমিয়ে থাকে। সে বেরিয়ে এসেছিল, নিতান্ত দিনমানের অসহনীয়তা তাকে ঠেলে দিয়েছিল বলেই, তার অসহ্য আওয়াজ তাকে রেহাই দেয়নি তাই। কিন্তু বাইরে তার মত মানুষের দিন-বাঁধা চিরজীবনের আড়ালে বয়ে যাওয়া বিরাট রাত সে কোনদিন দেখেনি। তার গভীর অশব্দতার সামনে তাই সে ভয় পায়। তার মনে হয় দেয়ালগুলো কান পেতে ছিল তার পা ফেলার সাথে সাথে। তার পায়ে ঠোকা গেলে শান বাঁধান মেঝেয় যে অদ্ভুত আওয়াজ ফোটে তা যেন অজানা অর্থে কথা বলে। তার দেহ এদের সঙ্গে কোনো ভাবে একগ্রথিত—যার খবর তার জানা ছিল না।

সে ভয় পেয়ে তাকায়। তারপর যেন আস্তে আস্তে বুঝতে পারে। রাতের এই শেষপ্রহরে দাঁড়িয়ে থেকে একটা উপলব্ধির মত কি অব্যক্ত ভাবে পথ করে তার মনে। তার দিন আর রাত ভরে একটা সুদীর্ঘ স্বপ্ন এতদিন টানা

ছিল। কি করে তা যেন কোথায় মরে গেছে। তার চিড় খাওয়া ফাঁকের মধ্যে দিয়ে তার স্বপ্নভাঙা চোখ রাতের অনন্ত দূর-ছোঁওয়া শূন্যতে চেয়ে আছে। আর সেই চেয়ে-দেখা-প্রাণী তিল থেকে তিলাতীত ক্ষুদ্র হয়ে গড়িয়ে মিশে যাচ্ছে এই বিপুল স্রোতমগ্ন অন্ধকারে। সে সহ্য করতে পারে নি। ভয় পাওয়া পশুর মত দেহটাকে আগলে নিয়ে ছুটে এসে খিল বন্ধ করে দিয়েছিল দরজায়। বাকি রাতটুকু বারে বারে তার গলায় ঠেলে ওঠে সেই এক উদ্গত ভাব। একটা দেহাতিরিক্ত যন্ত্রণায় তার সারা দেহটাকে দুমড়ে ফেলতে চায়। সে হাঁপাতে থাকে, চেয়ে থাকে দরজার কবাটে সরু চেরা দাগগুলোয়। কখন ভোর হয়ে আসে। দিন যত দুঃসহ হোক সে তার মধ্যে ফিরে যেতে চেয়েছিল।

সকালে সে মুখ ধুয়েই বেরিয়ে পড়েছিল। চা খাওয়ার কথা মনেই পড়েনি—। কিন্তু কোথায় যাবে। আবার তার মনে ফিরে এল গতকাল দুপুরে আদালতের ছবিটা। মাড়োয়াড়ি হুমকি মিছে দেয়নি। সমনটা হাতে পেয়ে সে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখেছিল অনেকক্ষণ। তার বিরুদ্ধে মামলা সোপরদ্দ হয়েছে। মাড়োয়াড়ি কোর্টে তার সই করা দলিল পেশ করেছে। দোকানের সত্ব তার। নিতাই তাকে আগাগোড়া ফাঁকি দিয়েছে—যথাসর্বস্বে বঞ্চিত করেছে। ষোলা হাজার টাকা তার নামে দাবী…। তার পরের ঘটনা-গুলো নিতাইয়ের স্পষ্ট মনে পড়ে না। দোকানে যে কটা টাকা আধুলি সিকি দোআনি ছিল ঝেড়েঝুড়ে তাই নিয়ে গিয়েছিল সে। ধনুকের মত বাঁকা-পিঠ একটা শকুনের মত উকিল তার কাগজপত্র বুঝে নেয়; সঙ্গে পয়সাগুলো। আর তার কানের দু'ইঞ্চির মধ্যে তার পুরু কোকেন ঘষা নীচের ঠোঁটখানা নিয়ে এসে সে ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস করে অনর্গল কি বলছিল। সে সামান্যও তার বোঝেনি। তার মন পড়েছিল দোকানে যদিও হেবোকে বিক্রী-পাটার ভার আর কালীর দিব্যি করে পয়সা না সরাবার হুকুম দিয়ে সে কাঁপতে কাঁপতে এসে ঢুকেছিল আদালতের চত্বরে, কিন্তু সে আইনের মতলব বুঝত না। মাড়োয়াড়ির দাখিল করা দলিলটায় তার সই চোখের সামনে নাচতে থাকতে। সত্যি মনে হয় তার—অবিশ্বাস করার মত ঠেকে না। তবু সে বুঝতে পারে না তা একবর্ণ।

উকিল বিড় বিড় করে কি শিখিয়ে দেয়। জবানবন্দীতে 'হাঁ'এর জায়গায় 'না' বলে বসে, আবার ফিরে হুঁহুঁ করতে থাকে। তার নিজেরও কি করে

মনে হয়, প্রকৃত অপরাধী সেই। তার বিস্ফারিত চোখ আগাগোড়া চেয়ে দেখছিল আদালতে হাকিমের গম্ভীর মুখ, বাদী পক্ষের উকিলদের। শেঠ ঝগড়ুরামের মুখটা মনে হচ্ছিল লোহার ফ্রেমে বসানো। সবাই তার দিকে ডেলা ডেলা সীসের চোখ মেলে চেয়ে থাকে। তারপর সে শুনতে পেল— কোর্ট থেকে মামলা চলাকালীন তার দোকান সীল করা থাকবে। প্রথমটা বুঝতে পারে নি। উকীল খুলে বলল ব্যাপারটা। নিতাইয়ের চোখে সামনে ঘুরে ওঠে পৃথিবী–পাথরের দেওয়াল, বেঞ্চি, এজলাস, কালো কোট গায়ে মানুষগুলো। মনে হয় সে কোনো এক কিম্বদন্তীর দেশে এসে দাঁড়িয়ে আছে, তার দৃষ্টির সামনে অলীক অসম্ভব অভিনয়গুলোর পর্দা কেবলই উঠছে আর পড়েছে। সে দর্শক কিন্তু মূল পালা তাকেই কেন্দ্র করে।…কোন রকমে সে বেরিয়ে আসে রাস্তায়। কাঁধে হাত রেখে উকিল পুরু ঠোঁটটা কানে প্রায় ঠেকিয়ে বলে—অত ঘাবড়ে গেলে চলবে কেন মশয়—বুকে বল ধরুন—শালা মাড়োয়াড়িকে ঘায়েল করতে হলে টাকা দরকার—টাকা জোগাড় করুন। দলিলখানা স্পষ্ট জালিয়াতি—এখন কত আপীল কত কোর্ট বাকি। এইত সবে হ'ল শুরু।—আপনি ভয়ে মূচ্ছো গেলে চলবে কেন! —কিন্তু সে কিছু বুঝতে পারছিল না। একবার খালি জিজ্ঞাসা করেছিল —উকিলবাবু—সাল করলে আর দোকান খোলা যাবে না?

—কদিন সীল করে রাখবে মশয়? সে কটা দিন আপনি এদিক ওদিক ঘুরে টাকার ব্যবস্থা করুন গে। মামলা লড়তে হলে কোমরে জোর থাকা চাই।—ইত্যাদি।

ভয়াবহ শব্দটা সে মনের মধ্যে ওল্টায় পাল্টায়। সীল করে দেবে। কি সে এখনও বুঝতে পারে না। তিন পুরুষের দোকান। তার কর্তাদাদা গড়ে ছিলেন—তার বাবা রাধাবাজার থেকে সরিয়ে এনে ওই তেমাথায় বসিয়ে ছিলেন নতুন ব্যবসা। আর সে—ভাবতেই আবার গলায় বিষম ব্যথার মত কি টন টন করে। চোখ জ্বালা করতে থাকে। উঃ কি রোদ! কোথাও একরত্তি আশ্রয় নেই। যে তাকায় খ্যাপা কুকুরের মত তেড়ে আসে যেন। কানের মধ্যে হাতুড়ির ঘায়ে শব্দটা ওঠে পড়ে, সীল করে দেবে সীল করে দেবে তার দোকান। তার বাপপিতেমো তিনপুরুষের হাতে গড়া দোকান। কেন সে মরতে এক হাজার টাকা ধার নিতে গেছিল মাড়োয়াড়ি বাঞ্চোতের কাছে। তাকে জেরবার করে পথে বসাল বেটা। কেবলই

শব্দটা ভন ভন করে ঘুরপাক খায় মাথার দেয়ালে দেয়ালে, কাচপোকার কত রন্ধ্র খুঁজে বেড়ায়।

উঃ কি সর্বনাশা দুঃস্বপ্ন! ভাঙতে চাইছে না। সারারাত কানে বেজেছে, দিনে বেজে চলেছে অহরহ! থেকে থেকে পা দুটো টলে যায়—মনে হয় বসে পড়বে রাস্তার ফুটপাথে। আবার হনহনিয়ে চলতে শুরু করে সে। সকালের আলোর উদাস প্রচ্ছন্নতায় ভরে যায় পথঘাট। তবু—তবু সে দোকানে যাবেই। দেখবে—তার চোখের উপর নিষ্ঠুর ঘটনাটা। তার সাধের থরে থরে সাজানো কাচগুলোর দিকে চেয়ে থাকবে যতক্ষণ পারে। আজ এই ভোরবেলা সে তাই তাড়াতাড়ি এসেছে—যত আগে পারে খুলে বসবে। তারপর পল গুনবে চেয়ে।

দোকানের সামনে এসে থেমে দাঁড়াল নিতাই। সে আশ্চর্য হবে তাকায় চারিদিকে। হঠাৎ মনে হয় সব কিছু আগাগোড়া মিথ্যে। দোকানের সামনে এসে মনে হয় সব আগাগোড়া যেমন প্রত্যহ ছিল তেমনিই আছে। কেবল একটু সকাল সকাল ভাব। দূরে দেয়ালে ঝোলান তেলকুলুরী চায়ের দোকানটার সামনে ছোঁড়াগুলো তেমনি জটলা করছে। ওধারে বিশ্বনাথদের কাপড়ের দোকানের কবাট সরিয়ে ধূনো গঙ্গাজল ছিটোচ্ছে। রাস্তা দিয়ে ইস্কুলের মেয়েগুলো বইখাতা বগলে চলেছে ঠিক তেমনি। কেমন একটা একান্ত অভ্যস্ত স্বাভাবিক বিশ্বাসও তার মনটায় এসে ঢোকে। সে হাজার হলেও এই মহল্লারই দোকানদার—পাড়ার একজন। তাকে দেখতে পেয়ে হেবো তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল।—

—বাবু। আজ এত ভোরে দোকান খুলতে এয়েচেন!

নিতাই তালার গায়ে একটা হাত রেখে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। হেবোর গলার স্বর কানে মিষ্টি গুড়ের মত মনে হ'ল। হঠাৎ একগাল হেসে ফেলে বলল সে—খুব অবাক হচ্চিস্ যে হেবো?—নে কবাটগুলো চট করে খুলে ফেল। ধুনো গঙ্গাজল দে। দেখিস একছিটেও না ময়লা লেগে থাকে। তার পর গরম জিলিপী আর চা নিয়ে আয় ত চট্ করে। ঘাবড়াস্‌নি—আজ তোকেও ভাগ দেব রে ব্যাটা—

পিছন ফিরে দাঁড়াল নিতাই। কথাগুলো যেন গলা টিপে কে আটকে ধরে। হেবো কি জানে কিছু—? কি করে বলবে? কি বলবে?—

হেবো দরজা খুলে ঝাঁট দিতে লেগে গেল। নিতাই পকেটে হাত ঢুকিয়ে

দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ মনে পড়ল, আনা কয়েক পয়সা দরকার। সকালে চা না খেয়েই বেরিয়ে পড়েছে—হেবোকে আনতে দেবে। চা আর জিলিপী, সঙ্গে গরম কচুরি হলে ভাল—। এই ভোরের ঝোঁকে টাটকা গরম গরম কিনে আনবে হেবো। বেড়ে ভাজে। পকেটে কালকের পড়ে থাকা সব কটা পয়সা বের করে সে এক এক করে গুনতে লাগল। মোট সওয়া ন আনা। হঠাৎ একটা আকস্মিক অবশ করা ভাব যেন নিতাইয়ের হাঁটু দুটোর বল হরণ করতে চায়। ব্যস্? এইটুকুই সম্বল? পৃথিবীতে আর কানা কড়িও নেই? আর আসবে না কোনদিনও? কি করে তা হয়? সওয়া ন আনা—মাত্র? পা দুটো থর থরিয়ে কাঁপতে থাকে, বুকের মধ্যে একটা আতঙ্ক গুর গুর করে উঠতে থাকে। তাড়াতাড়ি ভিতরে এসে সে উদ্‌ভ্রান্তের মত চাইতে লাগল আলমারীগুলোর দিকে। থরে থরে কাপ ডিস, কাচের ফুলদানি, প্লেট, চিমনি, আতরদান, বিয়ের সেটগুলো, ফুলকাটা রঙীন ছবির দাগ ঝাপসা কাচের শার্সির গা ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে—চোখের আলো ঝাপসা কিসে যেন ঢেকে যায়। বাঁ হাতের কব্জির পিঠ দিয়ে রগড়ে আবার তাকায় নিতাই। চেয়ে চেয়ে মনে হয় একাকার একটা ধূলোট পর্দায় ঢেকে যায় সব কিছু।—

—হেবো রে! কাল কিছু বিক্রীপাটা করেছিলি বাবা? —কম্পিত গলায় জিজ্ঞাসা করল নিতাই।

—হ্যাঁ বাবু। ওই ক্যাস বাক্স খুলে দেখেন, আমি সরাই নি বাবু এক আধলাও—আপনার পা ছুঁয়ে—হঠাৎ হেবো কথা থামিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখতে লাগল নিতাইয়ের মুখের দিকে। লাল জবাফুলের মত চোখ দুটো পরিপূর্ণ খুলে ধরে চেয়ে ছিল নিতাই। মুখের চামড়া মড়ার মত ফ্যাকাসে। চৌকিতে একটা হাত ভর করে ধপ করে বসে পড়ল নিতাই। তারপর শুয়ে হাত বাড়িয়ে ক্যাশ বাক্সটা টেনে আনল কোলের কাছে। ক্যাশ বাক্সে কয়েকখানা নোট ইতস্তত ছড়ানো ছিল। একটা তুলে নিয়ে সে হেবোর হাতে দিয়ে বলল—যা, চা আর জিলিপী নিয়ে যায়।

হেবো ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে নোটটা কুড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল। পিছু ডেকে বলল নিতাই—আগে ধুনো গঙ্গাজলটা দিয়ে গেলি না রে! তার গলার স্বরে কি যেন ফুটে ওঠে। হেবোর ভয় করে। অপরাধীর মত আবার ফিরে এসে সে ধুনোর পাত্রটা পেড়ে নিয়ে টিকে ধরাতে বসল।

তারপর গঙ্গাজল ছিটিয়ে ধুনুচিটা তুবার গণেশের মুখের গোড়ায় ঘুরিয়ে এক পাশে নামিয়ে রেখে বেরিয়ে গেল চা আনতে। কিছুক্ষণ পরে ধোঁয়ায় ঘরটা ভরে উঠল। চৌকির উপরে নিতাই অনড় হয়ে বসে বসে দেখতে লাগল ধোঁয়ার দিকে।

হেবো বসে ছিল দরজার গোড়ায় তার বাঁধা জায়গাটায় চুপ করে। তার অনেক বাস্তবদর্শী প্রবীণ কিশোর মনের অন্তরালে কি ফুঠে উঠেছিল তা কে জানে, কিন্তু সে মুখ তুলে তাকাচ্ছিল না। ঝনকাঠে ঠেস দিয়ে তু হাঁটুর ফাঁকের মধ্যে তার মাথাটা ঝুঁকে পড়েছিল, চোখে একটা অভিব্যক্তিহীন চাউনি ভরে ছিল। নিতাই সেই যে মুখ বন্ধ করেছিল আর একবারও ফিরে চায় নি তার দিকে। একটা শব্দও মুখ থেকে উচ্চারণ করে নি। হেবোও মুখে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ভাব এঁটে কখন চেয়ে দেখছিল রাস্তায়। গোটা কয়েক কাক ঝপ ঝপ করে উড়ে এসে বসে খুঁটে খুঁটে কি যেন তোলে ঠোঁটে করে। আকাশটা অসম্ভব উজ্জ্বল, মাজা নীল কাচের শার্সির মত ঝকমক করছিল রাস্তার ওপারে উঁচু বাড়ীটার মাথায়। থেকে থেকে একটা ঘুড়ি উড়ে আসে নেত্রপথে, তার কুতূহলী মন সায় দেয় ভিতরে। চমকে ফিরে চাইল সে। —হেবোরে! —নিতাই চৌকির উপর উঁচু হয়ে বসে তার দিকে চেয়ে দেখছিল একদৃষ্টে।

—আজ্ঞে বাবু?

—তুই বাড়ী যা।

—কেন বাবু?

নিতাই থুত্‌নি তু' হাতের মুঠোয় ভর করে রেখে চেয়ে রইল শূন্য দৃষ্টিতে। একটু পরে মুখ না ফিরিয়ে বলল—

—ওরা দোকান সীল করে দেবে।

হেবো চমকে উঠে দাঁড়াল।

—সীল বাবু?

—হুঁ।

—কারা করবে?

—কি জানি। আমার টাকা নেই রে হেবো। তোর বাবু দেউলে হয়ে গেছে একদম, তাই।—নিতাই কি যেন একটা শক্ত ঢোক গিলে থামাবার চেষ্টা করছিল।—তুই থাকিস্ নি বাছা। তুই দেখতে পারবি নে—চোখ ফেটে

যাবে। ছোট ছেলে বাড়ী যা, আর এই টাকাগুলো নে—বলে, ভাঁজ করা পাঁচখানি এক টাকার নোট সে বাড়িয়ে ধরে হেবোর দিকে। তার চাইতে ভয় করে। চোখের কোণে জমে ওঠে একটা উষ্ণ তরল বড় ফোঁটা। তার ভয় করে পাছে হেবোর সামনে সেটা গড়িয়ে পড়ে।

হেবো হাঁ করে চেয়ে রইল। সে বুঝতে পারছিল না সব কিছুর মর্ম। এতগুলো কথা তার মাথায় যেন ঠাঁই অকুলান হয়ে উঠেছিল। তবু তার একটা হাত কলের মত এগিয়ে এসে টাকাগুলো হাত পেতে নিল। মনিবের চোখে তার চোখ পড়ে না। দুজনেই অধোমুখে নীরব হয়ে থাকে। সে ফড়েপুকুর বস্তির নাম-না-জানা পনেরোটা বছর পার করা কিশোর, আর তার ভারিক্কি মনিব—দুজনার অন্তর একটা বিষম লজ্জায় মুখ তুলে চাইতে সাহসী হয় না। হেবো তবু দাঁড়িয়ে রইল যতক্ষণ না নিতাই ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে চেয়ে বলল—দাঁড়িয়ে রইলি কেন যা এখান থেকে।

—তবে পেন্নাম হই বাবু—বলে হেবো ধীর পায়ে নেমে চলে গেল।

কোথায় কতক্ষণ ঘুরছিল সে তা খেয়াল ছিল না। টাকা তাকে পেতেই হবে। আজ সারাদিন নাওয়া খাওয়া হয়নি। রোদে মুখ জ্বলে গিয়েছে। তবু নিতাই হেঁটে চলেছিল। ক্রমশ হতাশাটার চারিপাশে ঘিরে একটা বেপরোয়া মনোভাব তাকে অধিকার করছিল। টাকা চাই-ই। যেখান থেকে যে করে হোক। নইলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে পলকে। যেমন পতঙ্গ শিখার কাছে এসে পলকে টুপ করে ঝরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। যতটা নিদারুণ মনে হয়েছিল ততটা কিন্তু সে অনুভব করেনি। মনটা আগেই অসাড় হয়ে গিয়েছিল। পরেরগুলো এক দীর্ঘ কুহেলিকায় ঢাকা।

তারা এল। সে পড়ে দেখল আদালতের হুকুমজারী। আরও কারা ভীড় করে এসেছিল চারিপাশে। কারা মূক নিস্তব্ধতায় চেয়ে দেখেছিল। কত মুখ চেনা চেনা—ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে দেখা—সবার ঠোঁটগুলো বন্ধ হয়ে ছিল। কেবল তাদের ঠোঁট নড়ে নড়ে কি বলছিল তাকে। সে অবশ্য জবাব দেয়নি। সে আলমারীগুলোর দিকে তাকিয়ে জুতোটা ঝেড়ে পায়ে দেয়। সার্ট মাথায় গলিয়ে পরে বোতাম আঁটতে আঁটতে চাবির গোছাটা ওদের হাতে তুলে দিয়েছিল। ক্যাশ বাক্সের টাকা রেজকি, হিসেবের খাতা, আর পুরোনো ক্যাশমেমোর বাণ্ডিলগুলো—একত্র করে রেখেছিল আগেই। সেগুলো বগলে তুলে নিয়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়। ওরা কবাট বন্ধ করে তালাগুলো ভাল

করে আঁটল। দুপুর রোদে রাস্তায় পা রাখা যাচ্ছিল না। কিন্তু নিতাই কিছু অনুভব করেনি। সে কেবল চেয়ে চেয়ে দেখছিল। তার একটা সর্বগ্রাসী কৌতুহল মনকে যেন লোপাট করে রেখেছিল। একবার বলেছিল —ও তালাটা টেনে দেখবেন—সব সময়ে আটকায় না। তারা টেনে দেখে প্রত্যেকটি তালা কাগজে মুড়ে সুতো দিয়ে বেঁধে গালা সীলমোহর ছেপে দিল এক এক করে। নিতাই শেষ পর্যন্ত চেয়ে দেখেছিল। তারপর ভীড় কমতে লাগল—সবাই চলে গেল। কে তার হাত ধরে টেনেছিল। কিন্তু সে সাড়া দেয়নি কারণ তার চেতনা অসাড় হয়ে ছিল। সবাই চলে গেলে সেও আস্তে আস্তে জায়গাটা ছেড়ে হেঁটে গিয়েছিল। কোথায় তা খেয়াল করেনি। সেই থেকে ক্রমাগত পা দুটো পর পর পড়ছিল দুপুর রোদে। ছায়া পায়ের তলায় ছোট্ট একটু হয়ে পড়ছিল।—

আর ভাবছিল সে। টাকা যে করেই হোক জোগাড় করতে হবে। মাত্র সেই ভাবনাটুকু, আর সব কিছু স্তিমিত হয়ে মুছে গিয়েছিল তার ভিতর। সেই শব্দটা, তার মনে স্বস্তির মত ঘুরে আসে, মেঘছায়া অমাবস্যার রাতে একটা ছোট বাতি কোথাও জ্বলে ওঠার মত। তার মন তন্ময় হয়ে লক্ষ্য করে। টাকা পেলে সে বেঁচে যাবে। হঠাৎ, বেঁচে থাকা কি সে যেন টের পায়। এখন সে যা রয়েছে তা বেঁচে না থাকা—একটা দুঃস্বপ্ন। কুটিল, সমাপ্তিহীন, কেবলই আকণ্ঠ বেদনায় তাকে ছুটিয়ে নিয়ে ফিরছে। এই দুঃস্বপ্নের থেকে রেহাই পেতেই হবে। তাই কিছু টাকা দরকার। পৃথিবীতে ঢের ঢের টাকা আছে। সে দেখেছে মাড়োয়ারীর গদিতে বস্তা বাঁধা বাঁধা নোটের বাণ্ডিল। চারিদিকে উড়ে যাচ্ছে শুকনো কাগজ। কিন্তু তার হাতে একমুঠো শুকনো কাগজ থাকলে সে জানে— নিষ্কৃতি। সে জানে ছাড়া পাবে এই বিষম মার থেকে, যাতে জ্বলে যাচ্ছে তার পিঠের চামড়া। তার শিরাপথের মধ্যে দিয়ে জ্বলন্ত ক্ষার ঠেলে দিচ্ছে, মস্তিষ্কের পর্দায় পর্দায় তরল ধাতু ফোঁটায় ফোঁটায় ফেলছে। টাকা তার চাই।

নিতাই ভাবতে ভাবতে কখন অজান্তে তাদের গলির মধ্যে ঢুকে হাঁটছিল। খেয়াল ছিল না। অসংখ্য রাজপথ গলি পিছনে ফেলে সে হেঁটে গেছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এখন রোদ হেলে পড়েছে। একটা বৈকালী ভাব ছেয়ে রয়েছে গলির ঘেঁষাঘেঁষি দেয়ালগুলোয়। ছোট ছোট আবর্জনা স্তূপে মাছিগুলো কালো কালো

কৌটায় স্থির হয়ে রয়েছে। তার পা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভন ভন করে উড়তে থাকে। হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত সে দাঁড়িয়ে পড়ল। এইত তাদের বাড়ী। তার মনে ঝলসে ওঠে কথাটা। ছোট পিসীর গয়নাগুলো বাড়ীতে রয়েছে। বহুদিন ধরে রয়েছে সে জানে। তার মাথার ওপরে ওপরকার ঘরখানায়। উত্তেজনায় তার মনেই পড়ে না—সেগুলো এতকাল থেকেও কোনদিন সে দেখেনি। মনে হয় সে দেখতে পায়, চন্দ্রহার, বালা, নুপুর, কুণ্ডল, আরও কত কি। সোনায় সোনায় ছড়ানো। তার জীবন—আর নিস্কৃতি। কোন সম্ভাব্য অসুবিধার কথা তার মনে আসে না। ও টাকা, ও গয়না তারই। তার বংশের, তার বংশের সব কিছু রসাতলে যাচ্ছে। সে চায় গয়নাগুলো, তাকে নিতেই হবে…। হনহনিয়ে সে এগিয়ে গেল বাড়ীর সদর দরজার দিকে। একটা উন্মাদনায় ভরে ওঠে সর্বশরীর। শেষ পথটুকু প্রায় দৌড়ে এসে সে জোরে কড়া নাড়ল। ইচ্ছে করে চীৎকার করে ডাক দিতে। ভিতর থেকে দরজা খুলে দিয়ে কে চলে গেল। নিতাই চমকে উঠে, দরজার কবাট ঠেলে উঠোনে এসে দাঁড়াল। হঠাৎ তার মনে হয় বাড়ীটা পরিত্যক্ত। কেমন অসম্ভব স্তব্ধ। কেউ নেই? তবে কে খুলে দিল দরজা? সে কি পায়ের শব্দ শুনেছিল? সব দরজা বন্ধ। সে আবার দুঃস্বপ্নটার কবলে এসে পড়েনি ত? বিস্ফারিত চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল সে। সিঁড়ির কাছে সৈরী তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। রান্নাঘরের দেওয়ালে অর্ধেক রোদের ছায়া নেমেছিল। নিতাই হঠাৎ বুঝতে পারে না। সৈরীর দিকে চেয়ে চেয়ে তার আশ্চর্য ঝলসানো চোখ দুটোর পাতা পড়তে পায় না সে হারিয়ে ফেলে, ভুলে যায় সব কিছু—সকাল, রাত, তার আগের সকাল, সারাদিন রৌদ্রবহ প্রহর কটা। মনটা এসে থেমে দাঁড়ায় এক বিন্দুতে।

সৈরীর গালের উপর চুলগুলো নুয়ে পড়েছিল। গলার ধীর বঙ্কিমরেখা নেমে এসেছিল বুকের উত্তালে। বুকটা ধীরে ধীরে উঠছিল নামছিল পালের মত। চেয়ে চেয়ে নিতাইয়ের বুকের মধ্যে কিসের একটা গুরু আওয়াজ যেন বারে বারে ঘা দেয়। রুদ্ধ দরজায় ঘা দেওয়ার মত। সে তার সর্বাঙ্গে চেয়ে দেখে। হাত দুটো পিছনে করে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সৈরী। একটা পা সামনে, হাঁটু ভাঁজ করে দেয়ালে তুলে রাখা। অন্য পায়ের কাপড় একটু উঠে, গোড়ালির উপরে মসৃণ মাংসের আঁট-সাঁট বাঁধন তার চোখে পড়ে।

নিতাইয়ের চোখের সামনে দেয়ালগুলো যেন একবার হেলে পড়ে। কিছু জিজ্ঞাসা করার জন্য সে হাঁ করে তাকায় ওর মুখের দিকে।

সৈরী !—কিন্তু আড়ষ্ট গলায় স্বর ভাল করে ফোটে না।

সৈরী কোন জবাব না দিয়ে কেবল চেয়ে থাকে। তার ঠোঁটের কোণে একটা দুর্জ্ঞেয় হাসি খেলা করে। নিতাই গলাটা ঝেড়ে আবার বলবার চেষ্টা করল। কিন্তু তার স্বর তেমনি ভাঙা-ভাঙা অস্বাভাবিক শোনায়।

—সৈরী, মা কোথায় ?

ঘাড় মৃদু নেড়ে সামান্য ইঙ্গিতে সৈরী জানায় করুণাদেবী বাড়ী নেই। কিন্তু তার অপলক চোখ নিতাইয়ের দৃষ্টি থেকে সরে না। নিতাইয়ের মাথার মধ্যে ধীরে ধীরে যেন একটা আঁধার এসে ঢেকে যায়। সে হঠাৎ দু-পা ফেলে উঠে আসে কাছে। একটা হাতে সৈরীর কোমর বেষ্টন করে তাকে টেনে নেয় নিজের দিকে। তার মাংস যেন হুহু করে হোম কাষ্ঠের মত জলে ওঠে। সে এগিয়ে যায় ঘরের দিকে। আরেকটা হাত দিয়ে দরজার শিকল খুলে ফেলে সৈরীকে প্রায় অর্দ্ধোত্থিত করে টেনে নেয় ভিতরে। তারপর দরজাটা ঠেলে বন্ধ করে দেয়।

গলির মোড়ে পৌঁছলে পর সৈরীর মা বলল—তা হ'লে তুমি যাও বৌদি। আমি একটু বাজারটে ঘুরে আবার ফিরব'খন। বেলাও পড়ে এল—তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে তো দু-বাড়ীর।

একটা ভার যেন নেমে গিয়ে হাল্কা হয়ে গিয়েছিল করুণাদেবীর মনটা।

—যাবি ? তা আয় গে। একটু পারিস তো ঘুরে আসিস। তোর মেয়ে রয়েছে, সেই কাজ করবে যদিও।—

শেষ পথটুকু ধীরে ধীরে অতিক্রম করতে থাকেন তিনি। মনটা আলগা হয়ে ছিল। কোনদিন বেরোন হয় না। একটু রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলেই মনে হয় যেন কত দেশ ঘোরা হয়ে গেল। শূন্য মনের পর্দায় রাশি রাশি পথের ছবি খেলা করে। কত ওঠা-নামা করেন দিনান্তে সিঁড়ি দিয়ে আপনার বাড়ীতে। কিন্তু একটুতেই মনে হয় পা দুটো ধরে গেছে। তাই আস্তে আস্তে হেঁটে যান। দরজায় এসে শিকলটা নাড়বার জন্য হাত রাখতেই কবাট একটু ফাঁক হয়ে সরে গেল। হঠাৎ বুকের মধ্যে ধড়াস্ করে উঠল

তাঁর। দরজা আলগা রয়েছে কেন? তবে কি সৈরী বাড়ীতে নেই? না কি—একটা সুপ্তোত্থিত আশঙ্কা সহসা যেন শ্বাসনলি টিপে ধরে।...আজ সকালে নিতাই সেই বেরিয়েছে কখন, দুপুরে ফেরেনি ত? খাওয়া স্নান হয় নি। একটা কথাও না বলে কোন ভোরে চলে গেছে। তার মুখটাও ভোরবেলা নজর করে দেখেন নি। তাঁর অনুপস্থিতিতে—ভাবতে ভাবতে তাঁর সারা শরীরে একটা হিমস্রোত বয়ে নামে কোথা থেকে। বছরের পর বছর যে সন্দেহ মনের গভীর তলে একটা নীরেট ছায়ার মত এতকাল তাঁর জেগে থাকা ঘুমের মধ্যে কেবলই দুঃস্বপ্নের মত বিরাজ করেছে তার কিম্ভূত রূপ যেন মূর্তি ধরে প্রত্যক্ষ হয়ে বেরিয়ে আসে। বুকের মধ্যে তোলপাড় করে ওঠে একটা সার্বিক ক্ষতির আতঙ্ক—যেন পিছল পাথরে পা হড়কে হঠাৎ গভীর জলে তলিয়ে যাচ্ছেন তিনি। চোখের থেকে এতক্ষণের মুগ্ধ করে রাখা ছবিগুলো ছেঁড়া টুকরোর মত খসে খসে পড়ে একটা ঘোলাটে পর্দা অনাবৃত করে দিচ্ছে। গলা দিয়ে অস্ফুট আর্তনাদে একটা গোঙানীর মত আওয়াজ বেরিয়ে এল। দরজা ধাক্কা মেরে খুলে তিনি ছুটে এসে দাঁড়ালেন উঠোনে। চারিদিকে চেয়ে হাঁপাতে থাকেন তিনি। সমস্ত শরীর থরথরিয়ে কাঁপে। চারিদিকে দরজা বন্ধ। নৈঃশব্দটা কানে সুতীক্ষ্ণ চীৎকারের মত এসে লাগে। ভাবেন সৈরীর নাম ধরে ডাকবেন। কিন্তু থেমে তাকিয়ে দেখতে থাকেন চারিদিকে। হঠাৎ নিতাইয়ের ঘরের দিকে চোখ পড়ল তাঁর, শিকল নামানো। তিনি ধাপ দুটো উঠে এসে দাঁড়ালেন সামনে। ভিতর থেকে একটা অস্পষ্ট অপরিচিত আওয়াজ কানে এসে লাগল তাঁর। তাঁর প্রথমটা আশ্চর্য লাগে। তিনি কান খাড়া করে শুনবার চেষ্টা করেন। অস্পষ্ট, মিশ্রিত, বাক্য-বর্জিত শব্দগুলো—মেয়েলী গলার আওয়াজ কিন্তু স্বাভাবিক নয়, কেমন একটা বিকৃত বিসদৃশ ব্যভিচারে ভরে কানে আসে। তিনি যেন আপন নারীত্বের কোন গূঢ় অনুভূতিতে তা বুঝতে পারেন। মনে হয় হাসির মত, কানে লেগে তাঁর সর্বশরীর শিউরে ওঠে। একটা মোটা পুরুষ গলায় কাসির আওয়াজ হয়, একগোছা চাবি আঁচল খসে মেঝেয় পড়ে বেজে ওঠে যেন। তাঁর পা কাঁপতে থাকে। দেয়ালে হাত রেখে কোনরকমে সামলে নেন নিজেকে। তারপর এক পা এক পা করে এগোতে থাকেন সিঁড়ির দিকে। মনে হয় সারা পৃথিবী তাঁর পা-দুটোকে আকর্ষণ করে নামিয়ে নিতে চাইছে। হাঁটু ভেঙে আসে, তবুও তাঁকে উঠতে হবে

সিঁড়ি দিয়ে—একের পর এক ধাপ, অনন্তকালের পুরোনো সিঁড়ি—কতদূর। এই পাতাল থেকে টেনে তুলতে হবে জরাভার জীর্ণ শরীরটাকে। নীচে চাইতে ভয় করে, মনে হয় চেয়ে দেখলে তার অতল তলহীনতায় মাথা ঘুরে যাবে। একটা অগ্নিকুণ্ডে জলে পায়ের নীচে সিঁড়ির ধাপগুলো স্বচ্ছ হয়ে যায়। একটা জ্বরের মত শিখাগুলো তাকে ছুঁতে চাইছে, টানছে কুণ্ডের কেন্দ্রে আবার নামিয়ে নিতে। অশ্লীল আওয়াজ, কানে ঢোকে গলন্ত সীসের মত। করুণাদেবী মুখ তুলে কেবলই তাকান সিঁড়ির মাথায় খোলা ছাদের, খোলা আকাশের দিকে। পাখা ছড়িয়ে ধরে কয়েকটা পাখী যেন কোন জন্মের তীরে ভেসে চলে। ডানায় হলুদ অপরাহ্নের আলো। কোন রকমে ঐদিকে তাকিয়ে রুদ্ধ শ্বাসযন্ত্র বারে বারে আঘাত সয়ে ওঠে। পিছনে তাড়া করে আসে বিভীষিকা। অন্ধকার হয়ে আসে আকাশের অস্তাচল—তাঁর সমস্ত মনের চেনা প্রান্তরের আলো। তবু ওঠেন, যেন চিরকাল থেমে থাকে তাঁর ওঠার সময়। ঘরের দরজায় পৌঁছে কম্পিত হাতে শিকল খোলেন। তারপর দেহটা মেঝেয় ধসে পড়ে যেতে যেতে সব কিছু চোখে অন্ধকার হয়ে যায়।

আবার চিন্তাগুলো ভন্ ভন্ করে এক ঝাঁক বিষাক্ত বোলতার মত উড়ে আসে। চারিদিক থেকে হুল্ ফোটায়—রি রি করে ওঠে সারা দেহ। ঘরে আলো জ্বালা হয়নি। নিতাই কতক্ষণ চোখের পাতা ফেলে নি, চেয়ে ছিল জমাট অন্ধকারে। দরজার সুতোর মত সরু ফাঁকগুলোয় দিন মুছে যায়। তবু দিনে রাতে তফাৎ বোঝা যায় না। ঝলসানো পিচগলা রাস্তায় এখনো যেন তার পা পড়ে—উদ্‌ভ্রান্ত দিশাহীন ভাবে পায়ের পর পা। থামলেই একটা প্রবল উৎকণ্ঠা ক্ষ্যাপা কুকুরের মত তেড়ে আসে, থামলেই যেন বিরাট গহ্বরে সে হড়কে পড়ে যাবে। বালিশটা গরম তাওয়ার পিঠের মত ঠেকে কানের চামড়ায়। সস্তার সুগন্ধি তেলের গন্ধ বালিশে লেগে। তার সারা শরীরে এখনও লেগে রয়েছে সৈরীর দেহের স্পর্শ আগুনের মত। ঝলসে গেছে, উৎকট ঝাঁঝে ভরে গেছে সমস্ত ইন্দ্রিয় তার। তার চামড়ার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে একটা স্থায়ী জ্বলুনির মত থেমে রয়েছে তা। তবু ক্ষান্তি নেই। মাথায় একটানা হাতুড়ির ঘায়ের মত ওঠানামা করছে—একটি মাত্র বোধ—টাকা নেই। নিঃস্ব পৃথিবীতে তিল স্থানে তার অধিকার নেই। সে তাড়া খাওয়া জানোয়ারের মত ছুটতে ছুটতে এসে ঢুকেছিল গলির মধ্যে। আর সে যেন প্রায় পরিত্রাণের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল। সে দুহাত প্রসারিত করে অন্ধকারে। সে প্রায় অনুভব করে তার হাত গহনাগুলো আঁকড়ে ধরেছে—কি তা সে জানে না। তবু মুক্তি—এই দিন রাতের অবিচ্ছন্ন দুঃস্বপ্ন শেষে সে তন্দ্রা পাবে। কি করে এতবড় ওলট পালট হ'ল ; —আবার ফিরে যায় সে। সমস্তটা ঠিকানাহীন পথ তার বিস্ফারিত চোখের সামনে একের পর এক তালা বন্ধ করে দিল তারা ভরা দিনমানে। সে আর খুলতে পাবে না। এরপর নিঃস্ব হয়ে ঘুরবে পথে পথে ভিখিরীর মত। নিতাই দত্ত চোরের মত মুখ লুকিয়ে পালিয়ে যাবে চেনা মুখ দেখলে। আবার হাত বাড়ায় সে। প্রায় ছুঁয়েছিল অলঙ্কারগুলো, কিন্তু কি হয়ে গেল। মনে পড়ে সৈরীর দেয়ালে পা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা ছবি। তার দীঘল চোখ দুটো তাকিয়ে দেখছিল সাপের মত। তাকে যেন একটা বিরাট ঢেউয়ে তুলে নিয়ে আছড়ে ফেলল ওর তটে। ওর সূর্যমুখীর মত খোলা অবাধ ডাকে।...

নিতাই ব্যভিচার করেছে। রাশি রাশি সোনার দাগ অন্ধকার পর্দায় প্রহেলিকার মত মিলিয়ে যায়। সে নিঃস্ব। সে কোথাও দাঁড়াতে পারবে না, ছুটে পালাতে হবে অজানা লোকালয়ের মধ্যে দিয়ে অধিকারহীন বলে। হঠাৎ সে চমকে জেগে উঠল। বাড়ীটা কেমন নিঃঝুম। মা ফিরেছে নাকি? হয়ত ফিরেছে। যাক্‌ গে। সে আর উঠবে না। ডাকাডাকি করলে বলবে, জ্বর হয়েছে—তোমরা খেয়ে দেয়ে শোও গে।

কাচের দেয়ালের মধ্যে দিয়ে না দেখতে পেয়ে তার দেহটা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পার হয়ে গেছে। কুঞ্জবাবু টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখছিলেন তার দিকে। একটা হাত শান্তনুর কাঁধে রেখে কি বলছিলেন, সে বুঝতে পারছিল না। টেবিলে মেলা টাইপ করা কাগজটার অবোধ্য হরফগুলোর দিকে সে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছিল।

—তুমি ছুটি পেলে ভাই। কি জানি আমাদের কবে হয়।

কিসের ছুটি—কেন? সে তাকাল তাঁর মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে। কুঞ্জবাবু ঢোক গেলেন। কাজটা তাঁকেই করতে হয়। তিনি জ্যেষ্ঠত্বের অধিকারে আফিসের বড়বাবু। বরখাস্তের কাগজখানায় সই করে রায়বাবু বেরিয়ে গেলেন। বলে গেলেন যাবার সময়ে—ওর পুরো মাইনে দিয়ে দেবেন, ডিসচার্জ সার্টিফিকেটটা টাইপ করে দেবেন।

কিন্তু তবু লোকটা সেই একভাবে চেয়ে রয়েছে। অথচ তিনিও সঠিক শব্দটা পাচ্ছেন না, ঠিকমত যেভাবে বলা দরকার, যাতে ও বুঝতে পারবে।

—বলি হ্যাঁ গো, এ্যাদ্দিন আমাদের সঙ্গে রইলে—কোনদিন তোমার গলা শুনতে পেলুম না। দুচারটে কথা যাবার আগে বল না সঙ্গীদের সঙ্গে?—কুঞ্জবাবু কৃত্রিম উচ্ছ্বাস জড়ো করে হাসলেন, মনটা ছ্যা ছ্যা করে উঠল নিজের কথা কানে বাজতে।

—কোথায় যাব—? সম্পূর্ণ অবোধ্যতার দৃষ্টি তুলে ধরল অন্ত্যজন।

কুঞ্জবাবু আবার চোখ দুটো নামিয়ে নেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মুখ তুলে তাকালেন তিনি। তাঁর মুখের রেখাগুলো যেন শতাব্দীর ক্লান্তি:তে ভেঙ্গে পড়ছিল।

—শোনো।—তিনি শান্ত গলায় বলেন—তুমি যাবে যেখানে তোমার

প্রাণ চায়। মস্ত বড় পৃথিবীটা। আর এখানে ফিরে এসো না। তোমাকে এখানে ফিরে আসতে আর হবে না বলে গেছেন রায়বাবু।—

শান্তনু বিমূঢ়ের মত চেয়ে থাকে। তবু তার ভিতরে কি যেন এক অব্যক্ত প্রশান্তি ভরে থাকে, ভাঙ্গতে চায় না। যেন অজানা পথ বলেই রাস্তার পাশে কাউকে সে পথটা একটু জিজ্ঞাসা করতে থেমে দাঁড়িয়ে থাকে।

—তা হলে এখন যাব?

—হ্যাঁ। দাঁড়াও, তোমার মাইনেটা নিয়ে যাও। পুরো মাসের মাইনে মঞ্জুর করেছেন রায়বাবু। রায়বাবু খুব ভাল লোক, বুঝলে ভায়া! কারও একদিনের অন্নও মারেন না; বরং বেশী করে দেন। এখন বাড়ী ফিরবে ত? সাবধানে পথঘাট দেখে যেও।

শান্তনু ঘাড় নেড়ে জবাব দিল। তার মুখে হঠাৎ একটা সরল হাসি ছড়িয়ে পড়ে। তার শ্রীহীন মুখ একটা করুণ সৌন্দর্যে ভরে ওঠে। খুব মৃদু গলায় অথচ যেন কোন সংগোপন তন্ময়তাকে প্রকাশ করার মত সে বলে—

—এখন বাড়ী ফিরি না। অনেক রাতে—অনেক ঘুরে ফিরি। আমার চেনে একজন—তার বাড়ীতে যেতে বলে দিয়েছিল—ভাবছিলাম—কিন্তু, বলতে বলতে সে থেমে কি ভাবতে থাকে।

কুঞ্জবাবু একটা নিঃশ্বাস ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসতে দেন।

—তাই ভাল। যেও সেখানে। মস্ত বড় দুনিয়া কত লোক ভালবাসবে তোমাকে, কত লোক ডেকে নেবে, কত দিনের পরে রাত—এমনি মস্ত জীবন—তাই ভাল।—

শান্তনু আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকে কথাগুলো শুনতে শুনতে। কুঞ্জবাবুর চোখের মণি দুটো অস্বচ্ছ আস্তরণে ঢাকা। তবু তার মনে হয় কি যেন আড়াল থেকে স্নিগ্ধ স্নেহসিক্ত তারার মত চেয়ে দেখে মমতায়, নির্ভুল ভাবে। তাঁর সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে মাইনের টাকাগুলো নেয় হাতে করে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তায় দাঁড়িয়ে চাইছিল সে। একটা কথা অপরিচিত অভাবিত অর্থ নিয়ে তার মনে ঘুরে বেড়ায়—তার ছুটি হয়ে গেছে। কেন তা সে শোনেনি। কিন্তু তার সঙ্গে শান্ত হয়ে থেমে গেছে যেন অনেকগুলো আওয়াজ। একটানা পাখার ঘড় ঘড় শব্দ। মোমবাতির শিখাটার গায়ে লেগে অন্ধকার ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়া। তার মনে হয় সে ফিরে যাবে

সেখানে। একটা নিস্তব্ধ ঘর। একটা কাল অবিভগ্ন প্রহর। সে বসে থাকবে প্রতীক্ষায়। কোন কিছু আশা না করে। একটা পায়ের শব্দ নিস্তব্ধ কথার মত এগিয়ে আসবে। আচ্ছা, সেও ত অনেক কথা বলতে পারে। কিন্তু না, তার কথাগুলোর মনের মধ্যে আপনাদের ফুল বুনে বুনে যাওয়া সে দেখে। মাঝে মাঝে দু' একটা কথা কানে ঝরে পড়ে।

সে মুখ তুলে তাকায়।

দূর থেকে কে যেন তার দিকে লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছিল। শান্তনু নির্লিপ্ত চোখে চেয়ে দেখছিল। কাছে আসতে সে চিনতে পারে। সে চমকে ওঠে। তার দাদা নিতাই তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে হনহনিয়ে এগিয়ে আসছে। কাছে এসে নিতাই থেমে দাঁড়াল। এক মুহূর্ত তার মুখের দিকে তাকিয়ে নিতাই বলল—শান্ত যে। এখানে দাঁড়িয়ে কেন ?

শান্তনু কোন কথা বলতে পারে না হঠাৎ—তারপর বলে—

—আমার ছুটি হয়ে গেছে।

—ছুটি ?

সে ঘাড় নাড়ল।

হঠাৎ নিতাই একেবারে কাছে এসে তার দিকে তার জবাফুলের মত আরক্ত চোখ তুলে তাকাল—

—শান্ত—টাকা আছে ?

শান্তনু ঘাড় নাড়ল।

—শান্ত টাকাগুলো আমায় দিয়ে দে।—আর আয় আমার সঙ্গে বাড়ীতে। একটু পরেই সন্ধ্যে হবে।—শান্ত—ভাই—তোকে একটা কাজ করতে হবে। ···তোকে মা সন্দেহ করবে না—···মা রান্নাঘরে ঢুকলে···আমি দরজা আগলে থাকব—একথা সে কথায় ভুলিয়ে রাখব···বুঝলি·· তুই তোরঙ্গটা খুলে···।

শান্তনু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে শোনে নিতাইয়ের অসংলগ্ন কথাগুলো। তার চোখের উদ্‌ভ্রান্ত চাউনি যেন তার চেনা। সব মিলিয়ে একটা দুঃস্বপ্ন যা এতদিন নির্বাপিত হয়ে ছিল যেন আস্তে আস্তে জেগে ওঠে। একটা অন্ধকার রাত—একটা অচিন্ত্যনীয় হাতের ইসারা···সে চোখ সরাতে পারে না। নিতাইয়ের মুখ থেকে তার বিড় বিড় করে বলা কথাগুলো, চোখের অস্থির হয়ে কেবল ছিটকে বেড়ানো মণি দুটো, মনে হয় ভয়ঙ্কর।

নিতাই এগিয়ে এসে তার হাতের শীর্ণ কব্জিটা মুঠোর মধ্যে ধরে। তারপর চলে রাস্তা বেয়ে। তার দেহটা গড়িয়ে চলে জনস্রোতের মধ্যে দিয়ে। পথের পর পথ অপরিচিত ছবির মত দুপাশ দিয়ে সরে যায়।

একটা প্রতিবাদ অসহায় ভাবে তার মনে উঠে সরে যায়। সে বলতে চায়—তাকে কোথাও যেতে হবে—কোথাও একটা আলোয় নির্জন ঘর প্রতীক্ষিত তার জন্য। সে সেখানে পৌঁছতে চাইছিল একটু আগে। একটু আগে তার চেতনা কান পেতে ছিল কয়েকটা শব্দ শুনতে যা প্রায় অশ্রুত। কিন্তু এখন একটা দুঃস্বপ্ন তাকে পুরোপুরি দখল করেছে, তাকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এক অন্ধকার তরঙ্গের পানে, সব কূল মুছে দিয়ে নিঃশেষে টেনে নিয়ে চলেছে তাকে। সে নিতাইয়ে মুখের দিকে চাইছিল থেকে থেকে। শব্দহীন ঠোঁটে অজ্ঞাত কথা কেঁপে উঠে হারিয়ে যাচ্ছিল; কিন্তু সে কোন প্রতিবাদ করে না। নিতাই চলতে চলতে কেবলই ফিরে তাকায়। সেও যেন কিসের ভয়কে দেখে পিছনে পিছনে শব্দহীন পা ফেলে এগিয়ে আসতে। তার রক্তঘোলা চোখে উদভ্রান্তি ঘিরে থাকে।

সংক্রান্তি পার হয়ে শুক্লপক্ষের রাত বিছিয়ে পড়েছিল সহরে। রাজপথে, উঁচু বাড়ীগুলোর শিখরে, মিনারের চূড়ায়, দেউলের বন্ধ দরজায় চন্দ্রালোক নেমে এসেছিল। পূর্ণ শশী আকাশে হাসছিল। নরম ননীর মত আলো জড়িয়ে ধরেছিল দেয়াল, আলসের কোণা। অশ্বত্থের ঈষদস্বচ্ছ পাতার কম্পিত করাঙ্গুলী, স্তব্ধ বাড়ীর আলো জ্বালা জানালা। দিন ছোট হয়ে এসেছিল।

একবার কালীতলায় মাথা রেখে ফিরে আসছিলেন করুণাদেবী। একাই গিয়েছিলেন। পথে আসতে আসতে কাঁসর ঘণ্টা হঠাৎ বেজে ওঠে কোথায় কোন একটা বাড়ীর ছাদে। মন মনের ভিতর চমকে ওঠে। কার্তিকের হিম-লাগা হাওয়ায় ভর করেছিল ক্ষীণ ধুনো আর অগুরুর গন্ধ। তিনি গলায় আঁচলটা টেনে দেন ভাল করে। এদিক ওদিক চেয়ে আবার হাঁটতে থাকেন। জ্যোৎস্নায় ঢেকে রয়েছে চারিদিক। আকাশের গা মনে হয় আরও দূরে সরে গেছে—দিনের চেয়ে দেখা আকাশ কোন এক মায়াময় গভীরতায় ডুব দিয়ে হারিয়ে যায় গভীর নীলাভে। চিক চিক করে তারা। কেমন অপ্রাকৃত মনে হয়। পথঘাট ছায়া-আলোর কাটা কাটা দাগে ভাগ করা, ইঁটের দেয়ালগুলো ঘনত্ব হারিয়ে রং তুলির ছোপ দেওয়া দেওয়া ফুটে থাকে।

গলির মুখে এসে করুণাদেবী একটু থেমে পিছনের দিকে চেয়ে দেখলেন। অন্য কোন এক জায়গার পথ যেন পড়ে থাকে পিছন দিকে, অন্য কোন সময়ে হাঁটা, যা মনে ছেঁড়া গ্রন্থির মত লুটিয়ে থাকে। মনে হয় না বাড়ীর পথে পা রেখে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। কোন এক প্রব্রজ্যার মাঝখানে থেমে দাঁড়ান গুটি কয় পল, পাখীর স্পন্দিত ডানার মত উড়ু উড়ু হয়ে মুঠোয় বাঁধা থাকে। তাঁর বুক থেকে একটা নিঃশ্বাস ধীরে বেরিয়ে এল। গাঙ্গুলী গিন্নী যাত্রা করবেন আটটায়। তাঁকে পৌছতে হবে তার কিছু আগে। রাত দশটায় গাড়ী ছাড়বে কাশীর। কেউ বিদায় জানাবে না তাঁকে। একাকিনী চোরের মত চুপি চুপি সরে যাবেন অর্ধ শতাব্দীর আবাসিত দেয়ালগুলো পিছনে ফেলে রেখে। চন্দ্রালোক ঘুমন্ত থাকবে গলিটায়। তাঁর স্মৃতির রাশ, তাও ফেলে যাবেন নিস্তব্ধ বাড়ীর ঘরগুলোয়। তাঁর কত অগণন দিনের সিঁড়িতে হাত রাখা দাগ ফুটে থাকবে স্থির হয়ে। তিনি রেখে যাবেন সব—একতিলও ভরে নেবেন না ঝুলিতে। এমনিই নিরাভরণ বৈরাগিনী মনে চলে যাবেন কখনও ফিরে না চাইবার জন্য। ভোর হতে না জানি কোন এক প্রান্তর দেখবেন হু হু করে ছুটে যেতে পিছনে। তারপর এক অজানা অধ্যায়ের শুরু। তিনি আর ভাবতে পারেন না। মনে হয় সব ভাবনাই নিঃশেষ হয়ে গেছে। কেবল আছে এই দূরযাত্রীর স্পন্দিত পদধ্বনিটুকু কানে গাঁথা, চিরকাল যা টানে, কেবল সামনে থেকে সামনে, কোথায় তা জানা যায় না। তিনি কেবল জানেন এরপর তাঁর নিরালা মন্দিরে তিনিই একাকিনী থাকবেন। এক উদাস দেবতা তাঁর জপের বীজমন্ত্রগুলি একটি একটি করে তুলে রাখবেন অনন্তকুঁড়ির মালায় গেঁথে। তাঁর নির্জন ধ্যানের শুরু হবে, চেয়ে থাকা আলোয় যা দিনাবসানে অপার রক্তরাগসমুচ্ছ্বাসিত হয়ে ওঠে। তাঁর পা আরও ধীরে পড়ে। কেমন এই শেষের কটা মুহূর্ত মনে ভরে দেয় এক গভীর নির্বেদ। তাঁর ইতিহাস মুছে গেছে কোন এক বিস্মৃতির প্লাবনে। পরিস্ফুট জ্যোৎস্নার উদ্ভাস যেন তাঁর চারিপাশে গুঁড়ি গুঁড়ি আলোর ধুলিতে ঝরতে থাকে।

দরজার কাছে এসে থেমে দাঁড়ান করুণাদেবী। তারপর অন্যমনস্কভাবে দরজার তালা খুলতে যান। কিন্তু তালা খোলা ছিল, তাঁর আশ্চর্য মনে হয় না তবু। দাঁড়িয়ে থেকে একটু ভাবেন। তিনি যাবার আগে তালা লাগিয়ে গিয়েছিলেন—এখন দেখছেন খোলা। কিন্তু মন যেন সব উদ্বেগ বিস্ময় সন্দেহ

উৎকণ্ঠার তীর ছেড়ে অনেক দূরে কোথায় সরে গেছে। তাঁর কেবল মনে হয়—উপরে গিয়ে পোর্টম্যাণ্টোটা নামিয়ে আনবেন, আর একটা ছোট বোঁচকা। এটুকু নিজেই বয়ে নিয়ে যাবেন। মোড়ে গিয়ে একটা রিক্সা ডেকে উঠে বসবেন। তারপর সৈরীর মা ফিরে আসবে—তার কাছে চাবির গোছাটা দেওয়া আছে। পাছে চোখের জল ফেলে যাত্রাকালে তাই তাকে বলেন নি বেরোবার ঠিক সময়টুকু। আগেই বেরিয়ে যাবেন তাই। ভিতরে ঢুকে দরজাটা আবজে দিয়ে তিনি সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়ালেন। সিঁড়িটা অন্ধকার হয়ে রয়েছে। কিন্তু ওপরে মনে হয় আলো জ্বলছে। একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন তিনি। কেন? কে এসেছে? এই সময় যেন অনেক পুরোনো এক কালের মত মনে পড়ে। এক ধাপ এক ধাপ করে সিঁড়ি দিয়ে তিনি ওঠেন। কতকাল বাদে যেন তিনি আবার ফিরে আসছেন। বড় ক্লান্ত মনে হয়, পথশ্রমে যেমন হয়। মনে হয় অপরিচিত কাদের মুখ অন্ধকার থেকে চেয়ে দেখে নীচে। সিঁড়ির মাথায় এসে তিনি তাকালেন ছাদ পেরিয়ে। তাঁর ঘরের দরজায় আলো জ্বলছিল। দরজা খোলা। ঝনকাঠে একটা হাত রেখে নিতাই পিছন ফিরে উঁকি দিয়ে কি দেখছে ভিতরে। কেন নিতাই ওখানে দাঁড়িয়ে অমন? মনটা তাঁর যেন সব বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। তিনি কথা বলেন না। ধীরে ধীরে একটু এগিয়ে এসে থেমে দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর ডাকেন —নিতাই!

তড়িৎস্পৃষ্টের মত পিছন ফিরে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকে নিতাই। তার চুল উস্কোখুস্কো, মুখ বিবর্ণ। তিনি চেয়ে চেয়ে চোখ নামিয়ে এগিয়ে যান দরজার গোড়ায়। নিতাই সরে যায় তাড়াতাড়ি।

করুণাদেবী ঝনকাঠ পেরিয়ে ভিতরে তাকালেন। উঁচু তক্তপোষটার পায়ের দিকে হাঁটু গেড়ে বসে শান্তনু। তাঁর কালো তোরঙ্গের ডালাটা খোলা। সে দৃষ্টিহীন চোখ তুলে ধরে তাঁর দিকে ফিরে তাকিয়ে আছে। করুণাদেবী আবার চাইলেন নিতাইয়ের দিকে। তাঁর ভুরু কুঁচকে ওঠে কোন কিছু না বোঝার ভাবে। একবার থুত্‌নিটা কেঁপে ওঠে কি একটা বলবার প্রয়াসে। কিন্তু কিছু বলেন না। কারও মুখে কোন ভাষা আসে না। একটা আদি-অন্ত ভাঁটার টানে যেন পিছিয়ে যায় মানুষের সব ভাষার উৎস, সব অক্ষর মুছে যায়। শান্তনুর মেঝের উপর ঝুঁকে থাকা মূর্তি একটা ভাঙা দেয়ালের ইঁটের রাশির মত অর্থহীন হয়ে থাকে।

হঠাৎ করুণাদেবী শান্ত গলায় নিস্তব্ধতা ভেঙে বলে ওঠেন—

—নিতাই, নীচে গিয়ে হাত-মুখ ধোওগে··· ।

হতভম্বের মত তবু চেয়ে থাকে নিতাই। তার পরিপূর্ণ বিস্তৃত চোখের সাদার চারপাশে পাতা গোল হয়ে ছড়িয়ে থাকে। করুণাদেবী আবার বলেন, যেন একটা কথা পুনর্বার মনে করিয়ে দিতে—

—কেন এসেছিস এখানে? নীচে যা তোরা। শান্ত, উঠে আয়। ডালাটা নামিয়ে রাখ। যা বাছা—একটু আলোটা কমিয়ে দে। আমি অন্ধকারে বসে জপ করি। তোদের খাবার নীচে আছে। যা—আমি নেমে বেড়ে দেবো'খন। এখন আমায় একটু একল্লা থাকতে দে তোরা।—

নিতাই ক্লান্ত ভাবে ঘুরে দাঁড়াল। তারপর আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। শান্তনু তারপরে। করুণাদেবী আসনটা টেনে নিয়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে জপ করতে বসলেন। কয়েকটা পায়ের শব্দ সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। বাড়ীটা নিস্তব্ধ হয়ে রইল।